বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

ছত্রিশতম খণ্ড	গ্রীষ্ম সংখ্যা	জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/জুন ২০১৮

সম্পাদক
সৈয়দ আজিজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
জালাল আহমেদ

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক মেসবাহ-উস-সালেহীন
সম্পাদক	:	অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক
সহযোগী সম্পাদক	:	ড. জালাল আহমেদ
সদস্য	:	অধ্যাপক নাজমা খান মজলিস
		অধ্যাপক দুলাল ভৌমিক
		অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
Price	:	Tk. 200.00
		US$ 10.00

প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক
		এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal of the Asiatic Society of Bangladesh) edited by Professor Syed Azizul Huq, published by Dr. Sabbir Ahmed, General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretariat Road, Nimtali, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone : 02-9576391, E-mail : asiaticsociety.bd@gmail.com

সূচিপত্র

ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে খ্যাতিবাদ সমীক্ষা
এম. মতিউর রহমান ০১

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের গান
শাহনাজ নাসরীন ইলা ৫১

মনোগত তত্ত্ব ও বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুর 'ভ্রান্ত ধারণা' পর্যবেক্ষণ দক্ষতা বিশ্লেষণ
সালমা নাসরিন ৬৫

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প : প্রকৃতির পটে অন্তর্লোকের উন্মোচন
শামীমা সুলতানা ৮১

ওয়ালীউল্লাহ্‌র ইংরেজি উপন্যাসের বিষয়বস্তু
মোস্তাক আহমাদ দীন ১০৯

মুক্তিযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে মার্চ ১৯৭১
সাবিনা নার্গিস লিপি ১২৭

বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের প্রয়োগ : একটি বিশ্লেষণ
মোঃ ওমর ফারুক ১৩৭

গবেষকদের জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা-য় এশিয়ার সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গবষকদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এক কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে সিডিসহ বা পেন ড্রাইভ-এ জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ :

- কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে (ভারসন বিজয় ৪.০ বা বিজয় ২০০৩)। টাইপ/ ফন্ট SutonnyMJ ব্যবহার করতে হবে।
- কাগজের সাইজ হবে A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধে গবেষকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে গবেষকের এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে :

- জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি;
- এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
- প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্যকোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
- এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার একটি কপি ও প্রবন্ধের ১০ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের প্রথম ভুক্তি (entry) অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। গবেষক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস ও উলেøখ স্বতন্ত্রভাবে করতে হবে। টীকার ক্ষেত্রে শব্দের ওপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। প্রবন্ধের শেষে সংখ্যা অনুসারে টীকা উপস্থাপন করতে হবে।

৬. বক্তব্যের উৎস উল্লেখের ক্ষেত্রে সরাসরি গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-লেখকের নাম, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর উলেøখ করতে হবে। এশীয়, বিশেষত বাংলা নাম পূর্ণভাবে লেখা যাবে। কিন্তু অন্য নামের ক্ষেত্রে শেষ নাম প্রথমে পদবী ব্যবহার করা হবে।

৭. মূলপাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৮. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই : *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা : *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)। মূলপাঠে বিদেশি শব্দ থাকলে তা-ও একই নিয়মে লিখতে হবে। অন্যভাষার শব্দ বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম অনুযায়ী লিখিত হবে। কিন্তু ব্যক্তি ও বইয়ের নাম প্রথমবার উল্লেখের সময় তা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজিতে লিখতে হবে।

৯. প্রবন্ধের শেষে টীকা (যদি থাকে) এবং টীকার পরে তথ্যনির্দেশ সংযোজিত হবে। প্রত্যেক ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পৃথকভাবে উপস্থাপিত হবে এবং এ উপস্থাপন রীতি হবে বর্ণানুক্রমিক।

১০. প্রবন্ধের সূচনায় একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে।

১১. যৌথ নামে লিখিত প্রবন্ধ সোসাইটির বাংলা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয় না।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

কাউন্সিল : ২০১৮ ও ২০১৯

সভাপতি	:	অধ্যাপক মাহফুজা খানম
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক মেসবাহ-উস-সালেহীন
		অধ্যাপক আহমেদ আবদুলøাহ জামাল
		অধ্যাপক মো. হারুনর রশীদ খান
কোষাধ্যক্ষ	:	অধ্যাপক সাজাহান মিয়া
সাধারণ সম্পাদক	:	ড. সাব্বীর আহমেদ
সম্পাদক	:	জনাব মো. আবদুর রহিম
সদস্য	:	জনাব আহমদ রফিক (ফেলো)
		অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী (ফেলো)
		অধ্যাপক এম দেলওয়ার হোসেন
		অধ্যাপক নাজমা খান মজলিস
		অধ্যাপক এস এম মাহফুজুর রহমান
		ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
		অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান
		অধ্যাপক দুলাল ভৌমিক
		অধ্যাপক হাফিজা খাতুন
		অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক
		অধ্যাপক আশা ইসলাম নাঈম
		অধ্যাপক মো. আবদুল করিম

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ছত্রিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/জুন ২০১৮

ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে খ্যাতিবাদ সমীক্ষা

এম. মতিউর রহমান*

সারসংক্ষেপ

দ্বাপরযুগের অবসান ও কলিযুগের প্রারম্ভে এবং কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনের প্রাক্কালে মহর্ষি বেদব্যাস বাদরায়ণ পাঁচশো পঞ্চান্নটি সূত্রসমাবেশে ঐতিহাসিক *ব্রহ্মসূত্র* প্রণয়ন করেন। কিন্তু এর সূত্রসমষ্টি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে বিভিন্ন ঋষির মধ্যে সূত্রের অর্থ, তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়ে অচিরেই মতভেদ উপস্থিত হলো। ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক কী– প্রধানত এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই মতভেদের সূত্রপাত। সূত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে ঋষিকুল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। এর ফলে *ব্রহ্মসূত্র-কে* কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঋষি ও ক্রান্তদর্শী দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়নে উদযোগী হলেন। শিবাবতার আচার্য শঙ্কর এ পথেরই একজন নিবেদিত পথিক। *ব্রহ্মসূত্র*-এর ওপর তিনি যে ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন তার নাম *শারীরকভাষ্য*। এই *শারীরকভাষ্য-এর* উপক্রমণিকায় শঙ্করাচার্য একটি ভূমিকা লেখেন, যাকে তিনি নিজে *অধ্যাসভাষ্য* নামে অভিহিত করেছেন। এমন চমৎকার ভূমিকা অন্য কোনো ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকার লিখতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। *অধ্যাসভাষ্য*-এ শঙ্করাচার্যের যে প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছে, তা-ই ভাষ্যের সর্বত্র বিকশিত এবং সেই তুলনারহিত প্রতিভার পূর্ণতায় সমস্ত ভাষ্য জগতের অমূল্য সম্পত্তিতে পরিণতি লাভ করেছে। এখানে তিনি খ্যাতিবাদ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের মূল্যায়ন করে তাঁর ঐতিহাসিক অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান প্রবন্ধে খ্যাতিবাদ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে প্রচলিত মতের সমীক্ষা এবং শঙ্কারাচার্যের অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদের একটি মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বাপরযুগের অবসান ও কলিযুগের প্রারম্ভে এবং কুরুক্ষেত্রের সমরের প্রাক্কালে মহর্ষি বেদব্যাস বাদরায়ণ পাঁচশো পঞ্চান্নটি সূত্রসমাবেশে ঐতিহাসিক *ব্রহ্মসূত্র* প্রণয়ন করেন। উপনিষদের সার সঙ্কলন করে ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস বাদরায়ণ মুমুক্ষু মানব সম্প্রদায়ের পরম এবং চরম মঙ্গলবিধানকল্পে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণের জন্য যে সূত্রসমষ্টি প্রণয়ন করে তা-ই *ব্রহ্মসূত্র*। যে কালজয়ী চিরায়ত গ্রন্থে ব্রহ্মতত্ত্ব স্বল্পাক্ষরে সূচিত, সূত্রিত, গ্রন্থিত ও প্রকাশিত তা-ই *ব্রহ্মসূত্র*[১]। আরও স্পষ্টভাষায় সহজ করে বলা যায়, যে মহাগ্রন্থে তটস্থ ও স্বরূপলক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করা সুসাধ্য হয়েছে তা-ই *ব্রহ্মসূত্র*। বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের সূত্র-স্বরূপ বলে এই বিশ্ববরেণ্য গ্রন্থকে বলা হয় বেদান্তসূত্র। ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস রচিত বলে এর আরেক নাম ব্যাসসূত্র। বেদব্যাস বাদরায়ণ বদরিকাশ্রমে বসে তপস্যামগ্ন হয়ে জগতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে এর অন্য নাম বাদরায়ণসূত্র।[২] ব্রহ্মসূত্রে শ্রুতিসমূহের বিচার

---

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ও মূল্যায়ন করে মীমাংসাসিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হয়েছে বলে এ গ্রন্থ বেদান্তদর্শন নামে জগতে সুপ্রসিদ্ধি লাভে সমর্থ হয়েছে।

কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের সূত্রসমষ্টি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে বিভিন্ন ঋষির মধ্যে সূত্রের অর্থ, তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়ে অচিরেই মতভেদ উপস্থিত হলো। ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক কী, প্রধানত এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই মতভেদের সূত্রপাত। সূত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে ঋষিকুল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। ফলে ব্রহ্মসূত্রকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঋষি ও দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়নে উদযোগী হলেন। শিবাবতার আচার্য শঙ্কর এ পথেরই একজন নিবেদিত পথিক। ব্রহ্মসূত্রের ওপর তিনি যে ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন তার নাম *শারীরকভাষ্য*। কথিত আছে যে, মাত্র বারো বছর বয়সেই তিনি বদরিকাশ্রমে অবস্থান করে এ ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৩] তিনি তাঁর শারীরকভাষ্যে ছান্দোগ্যোপনিষদ ৮০৯ বার, বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৫৬৫ বার, তৈত্তিরীয়োপনিষদ ১৪২ বার, মুণ্ডকোপনিষদ ১২৯ বার, কঠোপনিষদ ১০৩ বার, কৌষিতকী উপনিষদ ৮৮ বার, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৫৬ বার, প্রশ্নোপনিষদ ৩৮ বার, ঐতরেয়োপনিষদ ২২ বার, জাবালোপনিষদ ১৩ বার, মহানারায়ণোপনিষদ ৯ বার, ঈশোপনিষদ ৮ বার, পৈঙ্গালোপনিষদ ৬ বার, কেনোপনিষদ ৫ বার উল্লেখ করে এই চৌদ্দখানা উপনিষদের শ্রুতিপ্রমাণে এবং মাণ্ডূক্যোপনিষদের গৌড়পাদকারিকা থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করে তাঁর বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কেবল আচার্য শঙ্করই নন, তাঁর পূর্বে ও পরে আরও অনেক স্থিতধী *ব্রহ্মসূত্রের* ওপর ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করে গেছেন। এসব ভাষ্যের প্রাচীন ভাষ্যসমূহ কালপ্রভাবে আজ সম্পূর্ণটাই লুপ্ত। এগুলো নামস্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হয়ে পড়েছে। *ব্রহ্মসূত্রের* প্রাচীন ভাষ্যকারদের মধ্যে আচার্য বৌধায়ন, আচার্য উপবর্ষ, আচার্য টঙ্ক, আচার্য দ্রাবিড়, আচার্য গুহদেব, আচার্য কপর্দী, আচার্য ভাবুকী প্রমুখের নাম স্বামী রামানুজ প্রণীত *বেদার্থসংগ্রহে* দেখা যায়। অবশ্য প্রাচীন ভাষ্যকারদের সবাই কেবল *ব্রহ্মসূত্রের* ভাষ্য রচনা করেছিলেন, না-কি প্রস্থানত্রয়েরও ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন, এ ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। স্বামী রামানুজের গুরু আচার্য যাদব প্রকাশও বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য রচনা করেছিলেন বলে আচার্য সুদর্শন তাঁর ভাষ্যটীকায় উল্লেখ করেছেন। স্বামী রামানুজ বৌধায়নসূত্র অবলম্বন করে *ব্রহ্মসূত্রের* ওপর *শ্রীভাষ্য* প্রণয়ন করেন। তাঁর *শ্রীভাষ্যের* অনেক স্থানে বৌধায়নসূত্র উদ্ধৃত আছে। আচার্য শঙ্করও তাঁর *শারীরকভাষ্যের* স্থানে স্থানে উপবর্ষ এবং বৌধায়নসূত্রের উল্লেখ করেছেন এবং শবরস্বামীর মীমাংসা দর্শনের সিদ্ধান্ত নৈয়ায়িক প্রক্রিয়ায় খণ্ডন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

পরবর্তীকালে শিবাবতার আচার্য শঙ্কর, বৈষ্ণবাবতার স্বামী রামানুজ, আচার্য মধব, আচার্য নিম্বার্ক, আচার্য বল্লভ, আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু, আচার্য শ্রীকণ্ঠ, আচার্য ভাস্কর এবং আচার্য বলদেব

বিদ্যাভূষণ *ব্রহ্মসূত্রের* ভাষ্য প্রণয়ন করে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করেছেন। শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের নাম *শারীরকভাষ্য*, স্বামী রামানুজের ভাষ্যের নাম *শ্রীভাষ্য*, মধবাচার্যের ভাষ্যের নাম *মাধবভাষ্য*, আচার্য বল্লভের ভাষ্যের নাম *অনুভাষ্য*, আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্যের নাম *বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য*, আচার্য শ্রীকণ্ঠের ভাষ্যের নাম *শৈবভাষ্য*, আচার্য ভাস্করের ভাষ্যের নাম *ভাস্কর ভাষ্য* এবং আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যের নাম *গোবিন্দ ভাষ্য* হিসেবে বিদ্বৎসমাজে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছে। নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্য, নিজ নিজ সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেননি, এমন ধর্মসম্প্রদায়, এমন ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এমনকি নিরাকার ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজর্ষি রামমোহন রায়ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।[৪] সর্বশাস্ত্র বিশারদ, বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন *ব্রহ্মসূত্রের* দেবীভাষ্য প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অতি সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীসঙ্ঘের সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা বা ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করে ভারতখ্যাতি অর্জন করেছেন।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়নের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জ্ঞান সাধনার তপোবন ভারতবর্ষে, অন্যত্র নয়। এখানকার শ্রুতি-গঙ্গোত্রি-নিঃসৃত জ্ঞানগঙ্গার বিভিন্ন ভাবাদর্শের প্রবাহে ভারতবর্ষ যেমন প্লাবিত হয়েছে, তেমনি পবিত্র হয়েছে বিশ্বভূমিও। এখানে শ্রুতিই ধর্মপ্রাণ ভারতের সকল ধর্মীয় সিদ্ধান্তের উৎসভূমি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায় নিজ নিজ সিদ্ধান্তের আলোকে *ব্রহ্মসূত্রের* ভাষ্য প্রণয়ন করে, বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করে স্বমত প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেছেন। এ কারণেই বেদান্ত দর্শন নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে জ্ঞানরাজ্যে প্লাবন সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর অন্য কোনো দার্শনিক গ্রন্থ বা প্রস্থানকে কেন্দ্র করে এত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা নেই। এই ব্রহ্মসূত্রকে কেন্দ্র করেই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত ভেদাভেদবাদ, বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতবাদ, কর্মবাদ এবং সমন্বয়বাদী সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতবর্ষে এ সকল সিদ্ধান্তের বিতর্কতরঙ্গো ব্রহ্মজ্ঞান উচ্ছ্বসিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে ব্রহ্মসূত্রের ওপর আচার্য শঙ্কর প্রণীত *শারীরকভাষ্য* তথা অধ্যাসভাষ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যাসভাষ্যের প্রাথমিক পরিচয়

শিবাবতার আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদী। অধ্যাত্মমীমাংসাই শঙ্করদর্শনের মূল বিষয়। তাঁর অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তের বিশেষত্ব নিহিত মায়াবাদে। ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে আচার্য গৌড়পাদের কারিকায় এবং উত্তরগীতাভাষ্যে মায়াবাদের যে অঙ্কুর দেখা যায়, তা-ই আচার্য শঙ্করের অধ্যাসভাষ্যে মহামহীরূপে পরিস্ফুটিত ও বিকশিত হয়েছে। শঙ্করের মতে, আমরা সবাই নিজেকে 'আমি' বলে জানি, কিন্তু 'আমি' বা আত্মার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে আমরা কেউই

অবগত নই। প্রায় সময় আমরা বলি : 'আমার দেহ, আমার ইন্দ্রিয়, আমার মন, আমার প্রাণ, আমার বুদ্ধি'; আবার কখনও কখনও বলি : 'আমি লম্বা, আমি সুন্দর, আমি জ্ঞানী, আমি হতদরিদ্র, আমি ধনী, আমি পঙ্গু' ইত্যাদি। এ থেকে বোঝা যায়, আমাদের 'আমি' জ্ঞানের কোনো সুস্থির অবলম্বন নেই। এ জন্যই আমি বা আত্মাই কেবল 'আমি' জ্ঞানের জ্ঞেয়, অন্য কিছু নয়। কিন্তু এ ধরনের সিদ্ধান্ত যেমন বাস্তবানুগ নয় তেমনি তা ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিতও নয়। প্রকৃতকল্পে জীবের বিন্দুমাত্র আত্মবোধ থাকলেও আত্মার প্রকৃত স্বরূপের বোধ আদৌ লক্ষ করা যায় না।

কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সংশয় থাকলেই আসে মীমাংসার প্রয়োজন। সংশয় আছে বলেই আত্মবিচার বা আত্ম-সমীক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়। আমি কে বা আমি কী? এই প্রশ্নের মূল্যায়ন বা বিচার করতে গেলেই আমরা লক্ষ করি, আত্মজ্ঞান কখনও দেহাদিকে অবলম্বন করে উদিত হয়, আবার কখনও বা চেতনাকে অবলম্বন করে প্রপঞ্চিত হয়। দেহাদিতে যখন আত্মবোধ প্রপঞ্চিত হয় তখনই অধ্যাস বা ভ্রমের প্রসঙ্গ ওঠে। কারণ আমি বা আত্মা প্রকাশক, কিন্তু দেহাদি প্রকাশ্য বস্তু। প্রকাশক এবং প্রকাশ্য কিংবা দ্রষ্টা এবং দৃশ্য অবশ্যই স্বরূপগতভাবে ভিন্ন। কাজেই দৈনন্দিন ব্যবহারে যখন আমরা দেহাদিতে আত্মবোধ আরোপ করি তখন তা অধ্যাস ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তাহলে জীবের জ্ঞান কি অধ্যস্ত হয়? এ ধরনের আশঙ্কা উপস্থাপন করেই আচার্য শঙ্কর তাঁর *শারীরকভাষ্যের* উপক্রমণিকায় অধ্যাস প্রসঙ্গ প্রপঞ্চিত করেছেন। উপক্রমণিকা নামে এই প্রথম অংশটিই শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের ভূমিকা। আর এই ভূমিকাই অধ্যাসভাষ্য নামে সমধিক পরিচিত। এমন চমৎকার ভূমিকা আর অন্য কোনো ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকার লিখতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। অধ্যাসভাষ্যে শঙ্করাচার্যের যে প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে, তা-ই ভাষ্যের সর্বত্র বিকশিত এবং সেই তুলনারহিত প্রতিভার পূর্ণতায় সমস্ত ভাষ্য জগতের অমূল্য সম্পত্তিতে পরিণতি লাভ করেছে।

সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল সৎ থেকে সতের জন্ম বা উৎপত্তি হয় বলে মনে করেন।[৫] তাই সাংখ্যমতে, কারণ যেমন সৎ, কার্যও তেমনি সৎ। সৎ থেকেই হয় সতের উৎপত্তি বা জন্ম। অসৎ থেকে কখনও সতের উৎপত্তি হতে পারে না। আচার্য শঙ্করের গুরু আচার্য গৌড়পাদ সাংখ্যমতের বিরোধিতা করে বলেন, সদ্‌বস্তুর উৎপত্তি লাভ হতে পারে না। যা আছে, যা সিদ্ধবস্তু তার আবার উৎপত্তি কী করে সম্ভব? যা আছে তা তো আছেই। নতুন করে তার কোনো উৎপত্তি হতে পারে না। যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যা আছে, যা সৎ তার আদৌ কোনো বিনাশ হতে পারে না। যা অজাত তার জন্ম বা উৎপত্তি একেবারেই অসম্ভব। অজাত বস্তু অমৃত। অমৃতের কোনো বিনাশ নেই, হতেও পারে না। তাত্ত্বিকভাবে বা মায়াবলে কোনোভাবেই সদ্‌বস্তুর উৎপত্তি বা জন্ম স্বীকৃত হতে পার না। মায়িক সৃষ্টিকেও উদ্ভব বা উৎপত্তি বলা যায় না। কারণ মায়ার কোনো সত্তা নেই। তাই গৌড়পাদ মনে করেন, সৎ থেকেও সতের উদ্ভব হতে পারে না। আবার অসৎ থেকেও সতের উৎপত্তি স্বীকার্য নয়।[৬]

আচার্য গৌড়পাদের মতে, সৃষ্টি মায়িক বা মিথ্যা হলেও ব্যবহারিক জগৎকে আমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারি। সব মানুষেরই এই উপলব্ধিবোধ বিদ্যমান। এই উপলব্ধিবোধের মূলে কী আছে? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়েই আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপক্রমণিকায় অধ্যাসভাষ্য প্রপঞ্চিত করেছেন। আর এখানেই তাঁর বিস্তারিত অধ্যাসভাষ্যের সার্থকতা। তিনি তাঁর এই অধ্যাসভাষ্যে যুক্তির যে জাল বুনেছেন তার কোনো তুলনা হয় না। তিনি যদি আর কোনো ভাষ্যগ্রন্থ রচনা না-ও করতেন, তাহলেও এই অধ্যাসভাষ্যের কারণেই তিনি সংশয়াতীতভাবে অমর হয়ে থাকতেন।

অধ্যাসভাষ্যে আচার্য শঙ্কর সৎ ও অসৎ, নিত্য ও অনিত্য, চিৎ ও জড়, সত্য ও মিথ্যা এবং আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেন। এই অধ্যাসভাষ্যেই তিনি উল্লেখ করেন যে, বিষয়ী সর্বাবস্থাতেই সৎ, আর বিষয় সর্বাবস্থাতেই অসৎ। কিন্তু স্বরূপত বিষয় অসৎ হলেও লোকব্যবহারে সে সৎ বলেই প্রতীত হয়। আর সত্য ও মিথ্যা মিলিয়েই চলে সকল লোকব্যবহার। 'অহং' আর 'ইদং' এই চিৎ এবং অচিৎ গ্রন্থিই সকল লোকব্যবহারের অবলম্বন হিসেবে কাজ করে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আত্মা সর্বাবস্থাতেই প্রকাশক, আর অনাত্মা বা জড় সর্বাবস্থাতেই প্রকাশ্য। যা আত্মা তা কখনও অনাত্মা হতে পারে না। আবার যা অনাত্মা তা কখনও আত্মা হতে পারে না। যা আলোক তা কখনও অন্ধকার হতে পারে না। অন্ধকারও তেমনি আলোক হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে না। কাজেই আত্মার ওপর অনাত্মা বা জড়ের ধর্ম আরোপ করা যায় না। আর এই যে সত্য ও মিথ্যা, চিৎ ও অচিৎ এবং আত্মা ও অনাত্মা মিলিয়ে যে লোকব্যবহার প্রতিনিয়ত লক্ষ করা যায় তার মূলে রয়েছে অধ্যাস বা ভ্রান্তি। তাহলে জড় ও চেতন, অনাত্মা ও আত্মা এবং মিথ্যা ও সত্য মিলিয়ে যে লোকব্যবহার তা অবশ্যই অধ্যাসের ফল। পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে কোনো ধরনের সাদৃশ্য বা সাযুজ্য থাকতে পারে না। যা আছে বা বিদ্যমান এবং যা নেই বা অবিদ্যমান তার মধ্যে কোনো ধরনের সাযুজ্য থাকার কথাও নয়।

আচার্য শঙ্কর তাঁর অধ্যাসভাষ্যে অনাত্মবস্তুকে কল্পিত বলে অভিহিত করেছেন। অধ্যাসভাষ্যে আচার্য শঙ্কর যুক্তি দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন যে, যা ত্রিকাল এবং ত্রি-অবস্থায় সৎ কেবল তা-ই সত্য, যা অবাধিত তা-ই কেবল সত্য। যার বাধ হয় তা কখনও সত্য হতে পারে না। তা সর্বত্রই মিথ্যা। আত্মার কখনও বাধ হয় না। আত্মা ত্রিকালে এবং ত্রিঅবস্থায় সত্য। তাই আত্মা সৎ। কিন্তু যা অনাত্মা, যা দৃশ্য তার সর্বত্রই বাধ হয়। জাগরণের দৃশ্য, স্বপ্নদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ঘন বা গভীর সুষুপ্তিতে স্বপ্নদৃশ্য ও জাগ্রত দৃশ্য, উভয় দৃশ্যের লয় ঘটে। এজন্যই দৃশ্য কখনও সত্য হতে পারে না। তবে যা সৎ তার লয়, ক্ষয় বা ব্যয় কিছুই হতে পারে না। সে এসবের ঊর্ধ্বে। তাই সৎ শাশ্বত, চিরন্তন। সৎ কখনও কোনো অবস্থায় পরিবর্তিত হতে পারে না। সৎ পরিবর্তনরহিত। সত্য চিরকাল সর্বাবস্থাতে সত্য। কিন্তু যা দৃশ্য বা বিষয় তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এ জন্যই তা সত্য নয়, অধ্যাস মাত্র। সত্যের সঙ্গে

মিথ্যার মিশ্রণেই লোকব্যবহার সম্ভব হচ্ছে। এটা সবারই প্রত্যক্ষগোচর। কাজেই এই লোকব্যবহারের মূল কারণ অধ্যাস। অধ্যাস, অবিদ্যা, বিপর্যয়, বিকল্প প্রভৃতি সবই অজ্ঞান। এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলে যে বোধ বা প্রতীতি তা-ই অধ্যাস। যথার্থ স্বরূপের প্রতীতিকে বলে জ্ঞান, আর অযথার্থ প্রতীতিকে বলে অধ্যাস। যা যা নয়, তাতে তার প্রতীতিকেই বলে অধ্যাস। অনাত্মায় যখন আত্মপ্রতীতি জাগে তখনই অধ্যাসের উৎপত্তি হয়। এসব নিয়েই আচার্য শঙ্কর তাঁর অধ্যাসভাষ্যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

অধ্যাস শব্দের অর্থ

আলঙ্কারিকদের মতে, অধি–অস্+ঘঞ্ প্রত্যয়ের মিশ্রণে অধ্যাস পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এখানে যে 'ঘঞ্' প্রত্যয়ের কথা বলা হচ্ছে সেটি আবার ভাববাচ্যে ও কর্মবাচ্যে উভয়ভাবে বিহিত হতে পারে। তাই এখানে অধ্যাস শব্দের দু–ধরনের অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। ভাবশব্দ ক্রিয়া শব্দকে সূচিত করে। তাই ভাব মানে ক্রিয়া। কাজেই ভাববাচ্যে বিহিত 'ঘঞ্' প্রত্যয়নিষ্পন্ন অধ্যাস শব্দের অর্থ হবে অধ্যাসক্রিয়া। কিন্তু কর্মবাচ্যে বিহিত 'ঘঞ্' প্রত্যয় নিষ্পন্ন অধ্যাস শব্দের অর্থ হবে অধ্যাস কর্ম। 'অসূ' ধাতুটির অর্থ ক্ষেপণ বা ছুঁড়ে ফেলা। আর 'অধি' উপসর্গের অর্থ 'উপরে'। কাজেই ভাববাচ্যে অধ্যাস শব্দের পূর্ণাঙ্গ অর্থ কোনো কিছুর উপরে অন্য কোনো কিছুকে ক্ষেপণ করা বা ছুঁড়ে ফেলা কিংবা চাপিয়ে বা আরোপ করে দেয়া। এ অর্থে যখন কোনো কিছুর উপরে অন্য কোনো কিছুকে আরোপ করা হয়, তখনই ঘটে অধ্যাস ক্রিয়াটি। আর কর্মবাচ্যে অধ্যাস শব্দের অর্থ হবে কোনো কিছুর উপরে অন্য কোনো কিছুকে, যাকে আরোপ করা হয় সেই বস্তুটি। যেমন রজ্জুতে যখন সর্পকে আরোপ করা হয় তখন সেই আরোপের ক্রিয়া যেমন অধ্যাস শব্দের অর্থ, তেমনি রজ্জুতে আরোপ করা সর্পটিও অধ্যাস শব্দের অর্থ বুঝতে হবে। আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায়, রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান হয় সেই জ্ঞানটি যেমন অধ্যাস, তেমনি রজ্জুতে যে সর্পের জ্ঞান হয় সেই জ্ঞেয় সর্পটিও অধ্যাস। তাই ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্যভেদে অধ্যাস শব্দের দু'রকম অর্থ নিষ্পত্তি হলো।

আচার্য শঙ্কর অধ্যাসভাষ্যের সূচনায় অধ্যাস সম্পর্কে বলেছেন, চেতনার ধর্মকে জড়ের ধর্ম, আর জড়ের ধর্মকে চেতনার ধর্ম বলে মনে করা, অর্থাৎ সত্য ও মিথুন কিংবা চিৎ ও অচিতের গ্রন্থিকে অধ্যাস বলে।[৭] অধ্যাস কাকে বলে? অধ্যাসের স্বরূপ-ই বা কী? এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাসভাষ্যে বলা হয়েছে 'অধ্যাস এক ধরনের অবভাস'।[৮] অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ট কোনো বস্তুর অন্য বস্তুতে প্রতীতিরূপ মিথ্যা প্রত্যয়মাত্র। স্মৃতিজ্ঞান যেভাবে পূর্বপ্রতীতি অনুসারে উৎপত্তি লাভ করে, অধ্যাসও সেভাবে পূর্বপ্রতীতি অনুসারে উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রাথমিকভাবে 'অবভাস' কথাটির অর্থ জ্ঞান– এক বস্তুতে অন্যবস্তুর জ্ঞান। আর অবভাস হলেই তাকে অধ্যাস বলা হয়। অবভাস কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র তাঁর ভামতীতে বলছেন :

অবভাসের 'ভাস' উপসর্গের দ্বারা অবসাদ বা অবসানকে বোঝানো হচ্ছে।[৯] বেদকল্পতরুর মতে, অবসাদ কথাটির অর্থ উচ্ছেদ। পরবর্তী অন্য কোনো জ্ঞানের দ্বারা পূর্ববর্তী যে জ্ঞান তার বাধ বা উচ্ছেদ হওয়ার নাম অবসাদ। আর অবসান কথাটির অর্থ 'যৌক্তিকতিরস্কারঃ'। মানুষের ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ইত্যাদি কার্য করার শক্তি তিরোহিত হওয়াকে বলে যৌক্তিক তিরস্কার।[১০] শুক্তিকে যখন মানুষ রজত বলে মনে করে তখন একে লাভ করার জন্য মানুষ প্রলুব্ধ হয় বটে, কিন্তু ওই রজতের দ্বারা ব্যবহারিক জীবনে মানুষের কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। শুক্তিতে রজতজ্ঞান যখন মানুষের তিরোহিত হয় তখন মিথ্যা রজতের কার্যকর শক্তির অভাবে মানুষকে প্রলুব্ধ করার শক্তিও তিরোহিত হয়। কাজেই অবভাস কথাটির দ্বারা জ্ঞান বা জ্ঞেয়বস্তুর মিথ্যাত্বেরই প্রতীতি হয়। আর এটাই অধ্যাসের প্রাথমিক লক্ষণ।

এখানে অধ্যাসের যে প্রাথমিক লক্ষণের কথা বলা হচ্ছে তার দ্বারা ব্যবহারিক জগৎ যে ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয়ে আছে সে কথারই ইঙ্গিত দেয়া হলো। 'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ'– এই বিশেষ লক্ষণ দ্বারা প্রাতিভাসিক বস্তুর মিথ্যা প্রদর্শন করা হচ্ছে। শুক্তিরজতের ক্ষেত্রে মিথ্যা বা অলীক রজতের অধিষ্ঠান শুক্তি। অনুরূপভাবে মিথ্যা বা অলীক জাগতিক পদার্থের অধিষ্ঠান পরব্রহ্ম। শুক্তিরজত, রজ্জুসর্প প্রভৃতি অধ্যাসের দৃষ্টান্ত থেকেই জানা যায় যে, শুক্তিতে উৎপন্ন রজত যেমন মিথ্যা, রজ্জুতে উৎপন্ন সর্প যেমন মিথ্যা, তেমনি ব্রহ্মে অধ্যস্ত ব্যবহারিক জগৎও মিথ্যা। যাঁরা জগৎকে মিথ্যা বলেন না তাঁরাও শুক্তিরজত এবং রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত অঙ্গীকার করতে কার্পণ্য করেন না। অবভাস কথাটিতে 'ভাস' শব্দটি ভাস্‌ধাতু 'ঘঞ্' প্রত্যয় যোগ করলে ভাস কথাটির অর্থ দাঁড়ায় জ্ঞান, আর কর্মবাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় যুক্ত করলে ভাস কথাটির অর্থ দাঁড়ায় জ্ঞেয়। কাজেই অবভাস কথাটি জ্ঞান এবং জ্ঞেয় উভয় অর্থই নির্দেশ করে। কিন্তু অবভাস কথাটির দ্বারা যদি অধ্যাসের সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যেত তাহলে আর অধ্যাসের বিস্তৃত পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন হতো না। স্মরণ করা যেতে পারে যে, অবভাস কথাটিকে কিন্তু অনেক সময় ব্যবহারিক সত্যবস্তুর প্রকাশক অর্থেও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন : কোনো নীলবস্তুতে নীলবর্ণের প্রকাশ বা অবভাস।[১১]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কেবল অবভাস বললে ব্যবহারিক সত্য বস্তুতেও অতিব্যাপ্তি হয়ে পড়ে। এজন্যই 'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ'–এ ধরনের বিস্তৃত লক্ষণের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। আলোচিত বিস্তৃত লক্ষণে 'পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ' কথাটির অর্থ বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যাবে যে, ভাববাচ্যে দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে 'ক্ত' প্রত্যয় যুক্ত করলে পূর্বদৃষ্ট কথাটির অর্থ দাড়াঁয় 'পূর্ববর্তী দর্শন'। আর কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় যুক্ত করলে এর অর্থ দাঁড়ায় 'পূর্বে যে বস্তু দৃষ্ট হয়েছে সেই বস্তু'। তাহলে 'পূর্বদৃষ্টাবভাস' কথাটির দু'রকম অর্থ স্থির হলো। প্রথম অর্থটি হবে পূর্ববর্তী দর্শনের মতো দর্শনের যে প্রকাশ, আর দ্বিতীয় অর্থটি হবে পূর্বদৃষ্ট বস্তুর মতো বস্তুর প্রকাশ। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সূত্রে 'পূর্বদৃষ্ট' কথাটি প্রয়োগ করা হলো কেন? 'স্মৃতিরূপঃ' এবং 'পরত্র' কথার সঙ্গে 'পূর্বদৃষ্ট' কথাটি প্রয়োগ করার কারণ, পূর্বদৃষ্ট বস্তুটি

এবং সে বিষয়ক জ্ঞানটি সত্য না হলেও চলবে। নতুবা 'স্মৃতিরূপঃ' কথাটির দ্বারাই বক্তব্য বিষয়টি প্রপঞ্চিত হয় বলে 'পূর্বদৃষ্ট' কথাটি 'পুনরুক্তি' দোষে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। কারণ, কোনো বস্তুর পূর্বদৃষ্টত্ব না-থাকলে তার স্মৃতি হতে পারে না। পূর্ব থেকে যে বস্তুর জ্ঞান নেই বা হয়নি তার কোনোরূপ স্মৃতি হতে পারে না। তাই বলতে হবে, সেই যে পূর্বদৃষ্টত্ব বা পূর্বদর্শন এবং পূর্বদৃষ্ট বস্তু এ দুটি সত্য না হলেও চলবে। লক্ষণে 'পরত্র' কথাটির দ্বারা আরোপের অধিষ্ঠানকে বোঝায় এবং তার আপেক্ষিক সত্যতাও সূচনা করে। আর আলোচিত বিস্তৃত লক্ষণে 'স্মৃতিরূপঃ' থাকায় স্মৃতিজ্ঞান যে অধ্যাস নয় তা নির্দেশ করে। মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞান অধ্যাস নয়। আর এ কারণে প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞান অধ্যাসের মতো ভ্রমজ্ঞান নয়। অধ্যাস সর্বত্রই ভ্রমজ্ঞান সূচিত করে। যখনই এক বস্তুর ধর্মকে অন্যায্যভাবে অন্য বস্তুতে আরোপ করা হয় তখনই সৃষ্টি হয় অধ্যাসের। অধ্যাস সর্বদেশে, সর্বকালে ভ্রান্ত। এ পর্যায়ে সমকালীন যৌক্তিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অধ্যাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

অধ্যাসের যৌক্তিক বিশ্লেষণ

শঙ্করাচার্য তাঁর অধ্যাসভাষ্যে অধ্যাসকে যেভাবে প্রপঞ্চনা করেছেন তাতে একে মনস্তাত্ত্বিক অর্থেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন বলে সর্বসাধারণের ধারণা। অধ্যাসকে যাঁরা পরাতাত্ত্বিক অর্থে ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতী তাঁদের মতে এ ধরনের ভ্রম তাৎক্ষণিক বা সাময়িকমাত্র নয়। এ ধরনের ভ্রম চিরন্তন ও সার্বিক। অনাদি অবিদ্যাই অধ্যাসের ভিত্তিমূলে কাজ করে। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার কারণেই এক বস্তুতে অন্য বস্তু, এক বস্তুর ধর্মে অন্য বস্তুর ধর্ম আরোপ করা হয়। আর এভাবেই হয় অধ্যাসের সৃষ্টি। এ অর্থে অধ্যাসকে অতীন্দ্রিয় বলেও অভিহিত করা চলে। আর যা অতীন্দ্রিয় তা অবশ্যই চিরকালীন এবং দীর্ঘস্থায়ী। সহজে এর নিরাস ঘটানো সম্ভব নয়। এ হলো অধ্যাসের ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যার পাশাপাশি অধ্যাসকে যৌক্তিক ভ্রান্তি হিসেবেও ব্যাখ্যা করা চলে। অধ্যাসকে যদি যৌক্তিক ভ্রান্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে সমকালীন প্রতীচ্যের যৌক্তিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়ও অধ্যাসের ব্যাখ্যা করা যায়।[১২] যৌক্তিক বচনে উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয় কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে। বচনের এ দুটি প্রধান অঙ্গ উদ্দেশ্য ও বিধেয় ধারণাগত ও আপেক্ষিকভাবে দুটি স্বতন্ত্র প্রকার বা দুটি স্বতন্ত্র জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। যুক্তিবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রের ঐতিহ্য অন্তত এ কথাই বলে। উদ্দেশ্য ও বিধেয় নামে বচনের এ দুটি অঙ্গকে যদি এক ও অভিন্ন করে ফেলা হয় তাহলে এতে যৌক্তিক দোষ ঘটা অবশ্যম্ভাবী। কারণ বচনের এ দুটি অঙ্গ দুটি প্রকার বা জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। অনুরূপভাবে পৃথক দুটি ধারণাকে যখন সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে সংযুক্ত করে ফেলা হয় তখন অধ্যাস বা ভ্রান্তি সৃষ্টি হতে বাধ্য। জাতি, প্রজাতি প্রভৃতি যৌক্তিক বিধেয়র বিচারে বচনের উদ্দেশ্যপদ এবং বিধেয়পদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান।

এরপরও যদি কোনো বচনের উদ্দেশ্যপদের প্রতি অযৌক্তিকভাবে ভিন্ন শ্রেণির কোনো বিধেয়কে আরোপ করা হয় তাহলে তাতে অধ্যাস ঘটতে বাধ্য।

শঙ্করাচার্য অধ্যাসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সঙ্গে সমকালীন প্রতীচ্যের প্রচলিত ভাষাদার্শনিক গিলবার্ট রাইলের শ্রেণিবিভ্রান্তি (category mistake)-র ব্যাখ্যার তুলনা করা যায়। গিলবার্ট রাইল ডেকার্টের দেহ-মন সম্পর্কীয় মতের সমালোচনায় এই শ্রেণিবিভ্রান্তির অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। রাইলের মতে, ডেকার্ট দেহ-মনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেহ ও মনকে অস্তিত্ব বলে কথিত জাতির পৃথক প্রজাতি বলে মনে করেছেন। আর তা করতে গিয়েই তিনি একটি শ্রেণিবিভ্রান্তি করেছেন। এক বিশেষ শ্রেণির বস্তুকে অযৌক্তিকভাবে অন্য কোনো বিশেষ শ্রেণির ওপর আরোপ করলেই শ্রেণিবিভ্রান্তি ঘটে। আচার্য শঙ্করও তাঁর অধ্যাসভাষ্যে অধ্যাসের স্বরূপ বর্ণনায় অনেকটা এ ধরনের কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, অনাত্মায় আত্মা বা আত্মায় অনাত্মা, সৎ-এ অসৎ বা অসৎ-এ সৎ, চিৎ বস্তুতে অচিৎ বা অচিৎ বস্তুতে চিৎ ধর্মের আরোপ থেকেই অধ্যাসের সৃষ্টি হয়। শঙ্করাচার্য সকল সাধারণ বচনকে সংসার্গাবগাহী বা সম্বন্ধসাপেক্ষ বলে মনে করেন। তাঁর মতে, প্রতিটি সাধারণ বচনেই আমরা উদ্দেশ্যপদ এবং বিধেয়পদের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করি। আর এ ধরনের সকল বচনেই অধ্যাসের সম্ভাবনা থাকে। তবে তাদাত্ম্য সম্বন্ধভিত্তিক বচনকে শঙ্করাচার্য অতি অযৌক্তিক বলে মনে করেন। যেমন : 'তত্ত্বমসি' বা তুমিই সেই। এ ধরনের বচন সংসর্গাবগাহী নয়। এদের সংসর্গানবগাহী বলে শঙ্করাচার্য মনে করেন। এ ধরনের বচনে কোনো আপেক্ষিক সম্বন্ধ সূচিত হয় না। আর যে বচনে আপেক্ষিক সম্বন্ধ সূচিত হয় না, সেই বচনে অধ্যাসেরও উদ্ভব ঘটে না। এ ধরনের বচনকে আপ্তবচন বলে অভিহিত করা যায়। এরা সর্বত্র একটা চূড়ান্ত অদ্বৈত সম্পর্কের অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের বচনের অর্থও উপলব্ধিগম্য। শঙ্করাচার্য ভাব লক্ষণ দ্বারা এ ধরনের বচনের তাদাত্ম্য তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেন।

প্রতীচ্যের সমকালীন ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণি ব্যাখ্যায় অধ্যাস বলতে কোনো মনস্তাত্ত্বিক ভ্রমকে নির্দেশ করে না। এ ধরনের বিশ্লেষণি ব্যাখ্যায় অধ্যাস বাস্তব কোনো ঘটনারও নির্দেশ করে না। অবিদ্যার কারণে এ ধরনের অধ্যাসের উদ্ভব ঘটে না। এ ধরনের বিশ্লেষণি ব্যাখ্যায় অধ্যাস বলতে একটি নৈয়ায়িক ও ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা নির্দেশ করে। শঙ্করাচার্যের মতে, সত্য ও অসত্যের মিথুনীকৃত দোষই অধ্যাসের ভিত্তিমূলে কাজ করে। শঙ্করাচার্যের এ ধরনের বক্তব্যকে বিশ্লেষণি ব্যাখ্যায় বিভিন্ন জাতিভুক্ত কিংবা বিভিন্ন যৌক্তিক পরিবারভুক্ত ধারণার ভ্রমাত্মক সংযোজন অর্থে গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক এস. কে. চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতে, অধ্যাসভাষ্যে শঙ্করাচার্য কোথাও এমন ধরনের মন্তব্য করেননি যে, যেহেতু স্পষ্ট ও পৃথক ধারণাসমূহের সংযোজন ছাড়া কোনো

ভাষাগত প্রকাশই সম্ভব নয়, সে কারণে ভাষা নিজের প্রয়োজনেই মিথ্যা বর্ণনা দেয় এবং এ কাজে ভাষা তার অন্তর্নিহিত ব্যর্থতাকেই প্রমাণ করে মাত্র।[১৩] শঙ্করাচার্য এমন কথাও বলেননি যে, বাস্তবতার সত্যরূপ প্রকাশ করার পক্ষে ভাষা আদৌ কোনো হাতিয়ার নয়। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, 'অনাত্মায় আত্মার মতো আত্মায় অনাত্মা এবং একটির বিষয়ধর্ম অন্যটির ওপর অবৈধ আরোপের ফলে যে ভ্রম হয় তা-ই অধ্যাস। আর এ ধরনের অধ্যাসই শঙ্করাচার্যের অধ্যাসভাষ্যের একমাত্র আলোচ্য বিষয়।'[১৪] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাকস্‌মূলার বলেন, অনাত্মায় আত্মা তথা 'বিষয়' ও 'বিষয়ী' শব্দ দুটিকে শঙ্করাচার্য কেবল নৈয়ায়িক অর্থেই ব্যবহার করেননি। 'বিষয়ী' বলতে তিনি আত্মাকে নির্দেশ করেছেন। আর এই 'বিষয়ী' সর্বদেশে এবং সর্বকালে সত্য এবং বাস্তব। আর 'বিষয়' বলতে তিনি অনাত্মা, দেহাদি, ইন্দ্রিয়াদিকে নির্দেশ করেছেন, যা সর্বত্রই অবভাসিক, প্রাপঞ্চিক, অসত্তাবান। কাজেই শঙ্করাচার্য পরাতাত্ত্বিক অর্থে 'অধ্যাস' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

প্রতীচ্যের সমকালীন ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সঙ্গে শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যার অন্য বিষয়েও বিলক্ষণ লক্ষণীয়। শঙ্করাচার্য তাঁর অধ্যাসভাষ্যে 'বিষয়ী' শব্দটিকে যৌক্তিক অর্থে ব্যবহার করেননি। তিনি শব্দটির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন সম্পূর্ণ পরাতাত্ত্বিক অর্থে। তাই শঙ্করাচার্যের আত্মা বা বিষয়ী পরাতাত্ত্বিক শব্দ। অনুরূপভাবে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যব্যাখ্যায় অনাত্মা বা বিষয়ও পরাতাত্ত্বিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তাঁর অনাত্মা বা বিষয়ও পরাতাত্ত্বিক শব্দ। শঙ্করাচার্যের অধ্যাসভাষ্যে বিশুদ্ধ বিষয়ী মানে বিশুদ্ধ আত্মা। প্রতীচ্যের দার্শনিকরা বিষয়ী বলতে আত্মার যে ব্যাখ্যা দেন সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী সেই আত্মাকে জানা যায়, তার বর্ণনা দেয়া যায় এবং সর্বোপরি তাকে জ্ঞানের একটি বিষয়রূপে গড়ে তোলাও সম্ভব। কিন্তু শঙ্করাচার্যের মতে, আমরা অবভাসিক আত্মাকে জানতে পারি। তাঁর মতে, অহম, চিত্ত ও মনকেই আমরা কেবল জানতে পারি, বর্ণনাও করতে পারি। কিন্তু বিশুদ্ধ বিষয়ী বা আত্মা আমাদের জানার অতীত। যা বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ তা কখনও বিবৃতিমূলক হতে পারে না। সমকালীন প্রতীচ্যের কোনো কোনো দার্শনিক[১৫] বিশুদ্ধ বিষয়ী বা আত্মার ধারণাকেই বাতিল করে দেন। তাঁদের মতে, এ ধরনের ধারণা ছদ্মধারণা মাত্র। শঙ্করাচার্যের মতে, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, ধারণা প্রভৃতি সবই অনাত্মার। অবভাসিক আত্মাকেই শঙ্করাচার্য অনাত্মা বলেন। আর এই অনাত্মার ধর্মকে যখন আমরা বিশুদ্ধ আত্মায়, আর বিশুদ্ধ আত্মার ধর্মকে যখন অনাত্মায় অযৌক্তিকভাবে আরোপ করি তখনই উদ্ভব ঘটে অধ্যাসের।

অধ্যাসের শ্রেণিভেদ

অধ্যাস মূলত এক প্রকার ভ্রান্তি। অনাত্মায় আত্মার ধর্ম, আর আত্মায় অনাত্মার ধর্ম আরোপ করাকেই শঙ্করাচার্য অধ্যাস বলে অভিহিত করেছেন। এরপরও ভাষ্যকাররা অধ্যাসের

শ্রেণিভেদ স্বীকার করেন। প্রথমেই অধ্যাসকে অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাস, এই দু–শ্রেণিতে ভাগ করা চলে। অধ্যাস যখন কেবল বস্তুমাত্রের হয় তখন সেই অধ্যাসকে বলে অর্থাধ্যাস। পক্ষান্তরে, অধ্যাস যখন বস্তুজ্ঞানের হয় তখন সেই অধ্যাসকে বলে জ্ঞানাধ্যাস। অর্থাধ্যাস বস্তুজ্ঞাপক আর জ্ঞানাধ্যাস জ্ঞানজ্ঞাপক। যে অধ্যাসে এক বস্তু অন্য বস্তুতে অধ্যস্ত বা আরোপিত হয় সেই অধ্যাস হলো অর্থাধ্যাস। আর যে অধ্যাসে কেবল বস্তু নয়, এক বস্তুর জ্ঞান অন্য বস্তুর জ্ঞানে অধ্যস্ত হয় তাকে বলে জ্ঞানাধ্যাস। শুক্তিতে যখন রজতের অধ্যাস হয় তখন রজতরূপ বস্তুর অধ্যাস হয় বলে তা অর্থাধ্যাস। আবার অধ্যাসে যে কেবল রজতরূপ বস্তুরই অধ্যাস হয় তা তো নয়, সঙ্গো সঙ্গো শুক্তিতে রজতজ্ঞানও অধ্যস্ত হয়ে থাকে। এ ধরনের অধ্যাসক বলে জ্ঞানাধ্যাস। এ থেকে বোঝানো গেল যে, অর্থাধ্যাস এবং জ্ঞানাধ্যাস একই সঙ্গো সম্পাদিত হয়ে থাকে। অর্থাধ্যাস ছাড়া যেমন জ্ঞানাধ্যাস হতে পারে না, তেমনি জ্ঞানাধ্যাস না হলে অর্থাধ্যাস কখনই সম্পন্ন হতে পারে না। দুটি অধ্যাস এক সঙ্গো সম্পাদিত হলে তবেই তা অধ্যাস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে এই অধ্যাসকে আবার দু–ভাগে ভাগ করা হয়। এক টুকরো স্ফটিকের কাছে লাল বর্ণের কোনো ফুল রেখে দিলে ওই ফুলের লালত্ব স্ফটিকে অধ্যস্ত বা আরোপিত হয়। এখানে লালবর্ণের ফুলটি হচ্ছে উপাধি। কারণ, স্বসন্নিহিত স্ফটিকে লাল বর্ণের ফুল নিজের ধর্ম লালত্বকে অধ্যস্ত করে থাকে। লালত্ব অধ্যস্ত হয়ে থাকে বলে এ ধরনের অধ্যাসকে বলে সোপাধিক অধ্যাস। কিন্তু শুক্তি রজতের স্থলে শুক্তিতে রজতই স্বয়ং অধ্যস্ত হয়, এখানে রজতের কোনো উপাধি অধ্যস্ত হয় না। এ কারণেই শুক্তিতে রজত ভ্রমের স্থলে যে অধ্যাস ঘটে তাকে বলে নিরুপাধিক অধ্যাস। সোপাধিক অধ্যাসে বস্তুর প্রতিনিধি হিসেবে তার উপাধি অধ্যস্ত হয়, আর নিরুপাধিক অধ্যাসে স্বয়ং রজত অধ্যস্ত হয় বলে সেই অধ্যাসকে বলে নিরুপাধিক অধ্যাস। নিরুপাধিক অধ্যাস উপাধি বর্জিত, আর সোপাধিক অধ্যাস উপাধি সম্বলিত।

ধর্ম ও ধর্মীভেদে অধ্যাস আবার দু–রকম। এক্ষেত্রে একটিকে বলে ধর্মের অধ্যাস, আর অন্যটিকে বলে ধর্মীর অধ্যাস। সোপাধিক অধ্যাসকেই বলে ধর্মের অধ্যাস, আর নিরুপাধিক অধ্যাসকে বলে ধর্মীর অধ্যাস। সোপাধিক অধ্যাসে বস্তুর পরিবর্তে বস্তুর ধর্ম বা উপাধি অধ্যস্ত হয় বলে এর নাম ধর্মের অধ্যাস। নিরুপাধিক অধ্যাসে বস্তুধর্মের পরিবর্তে স্বয়ং বস্তুই অধ্যস্ত হয় বলে এর নাম ধর্মীর অধ্যাস। শুক্তিতে যখন রজত অধ্যস্ত হয় তখন রজতরূপ ধর্মীর অধ্যাস ঘটে। আত্মায় যখন দেহাদির অধ্যাস ঘটে তখন দেহাদির ধর্ম কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বের অধ্যাস হয়ে থাকে। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এখানে ধর্মীর অধ্যাস না হলে ধর্মের অধ্যাস হয় না। এটাই প্রচলিত ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠিত বিধান। অবশ্য এ ধরনের সাধারণ বিধিবিধানের ব্যতিক্রমও স্বীকার্য। কোথাও কোথাও ধর্মীর অধ্যাস না হলেও ধর্মের অধ্যাস হতে পারে, বা হয়ে থাকে।

যেমন : কানত্ব, বধিরত্ব প্রভৃতি। এখানে ইন্দ্রিয় ধর্মী, আর কানত্ব ও বধিরত্ব তার ধর্ম। অহং কান : এরূপ বললে ইন্দ্রিয়রূপ ধর্মীর অধ্যাস না হয়ে কেবল ধর্মেরই অধ্যাস সংঘটিত হয়ে থাকে। অধ্যাসের এই বিভাজনে তৃতীয় অন্য এক ধরনের অধ্যাসের কথাও কোনো কোনো ভাষ্যকার উল্লেখ করেছেন। সেই তৃতীয় অধ্যাসের নাম সম্বন্ধের অধ্যাস বা সাম্বন্ধিক অধ্যাস। যেমন : আমরা যখন বলি 'আমার শরীর, আমার ইন্দ্রিয়', তখন তাতে সম্বন্ধের অধ্যাসই ঘটে।

কারণাধ্যাস এবং কার্যাধ্যাস ভেদে এই অধ্যাস আবার দু'রকম। যখন ভ্রম পরম্পরা হয়, অর্থাৎ একটি ভ্রম অন্য একটি ভ্রমের কারণ হলে পূর্ববর্তী ভ্রমটিকে কারণাধ্যাস এবং পরবর্তী ভ্রমটিকে কার্যাধ্যাস বলে। সেই কার্যাধ্যাসটি আবার পূর্ববর্তী অন্য কোনো ভ্রমের কারণে হলে তা কারণাধ্যাস হয়ে যায়। যেমন : শুক্তি-রজত ভ্রমের ক্ষেত্রে শুক্তি হবে কারণাধ্যাস আর রজত হবে কার্যাধ্যাস। আবার পরব্রহ্মে এই জাগতিক শুক্তি প্রভৃতি তাবৎ পদার্থ অধ্যস্ত বা আরোপিত হয় বলে শুক্তি প্রভৃতি সকল পদার্থ কার্যাধ্যাসরূপে বিবেচিত হবে। কাজেই প্রাতিভাসিক অধ্যাসগুলি যা কারণাধ্যাস হিসেবে বিবেচিত, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তা-ই আবার কার্যাধ্যাস রূপে গণ্য। তবে কোনো অধ্যাসের পক্ষেই একইসঙ্গে কারণাধ্যাস ও কার্যাধ্যাস উভয়ই হতে পারে না। ভাবভূত অজ্ঞান অবস্থা কখনও কার্যাধ্যাস হতে পারে না। কারণ, অজ্ঞানাবস্থা অনাদি। আর যা অনাদি তা কখনও কার্যাধ্যাস হবে না। প্রকৃতকল্পে ব্রহ্মে যে জ্ঞানের অধ্যাস তা-ই কারণাধ্যাস। এছাড়া বাকি সব অধ্যাসই কার্যাধ্যাস রূপে বিবেচিত। সে যাই হোক, শঙ্করাচার্যের মতে, অধ্যাসমাত্রেই অনুভূয়মান পদার্থান্তরেরই অধ্যাস হয়ে থাকে। যেহেতু তিনি অধ্যস্ত বস্তুটি প্রাতিভাসিক বলে স্বীকার করেন সেকারণে এটি যে প্রত্যক্ষভাবে প্রতীয়মান সেকথাও তিনি অস্বীকার করেন না। শঙ্করাচার্য মনে করেন, প্রাতিভাসিক বস্তুর অজ্ঞাতসত্তা নেই বলে প্রাতিভাসিক বস্তুর ভ্রমস্থলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এবার খ্যাতিবাদ তথা ভ্রম বিষয়ে প্রচলিত মতের গভীরে প্রবেশ করা যাক।

খ্যাতিবাদ : ভ্রমবিষয়ে প্রচলিত মত

আচার্য শঙ্করের মতে, আত্মা-অনাত্মার অধ্যাস ব্যতিরেকে দ্বৈত প্রপঞ্চের প্রতিভাস এবং সেজন্য অহঙ্কারগ্রস্ত জীবের লৌকিক ও শাস্ত্রানুসারী ক্রিয়াবিধি পরিপালনরূপ ব্যবহার সকল নিষ্পন্ন হতে পারে না। কিন্তু এই অধ্যাস পদের অর্থ কী? অধ্যাস পদের অর্থ আরোপ বা প্রকাশ। কিন্তু কেবল আরোপ বা প্রকাশ অর্থে গ্রহণ করলে আচার্য শঙ্করের অভিমত অনুযায়ী অধ্যাস পদের যথাযথ অর্থ নির্ণয় হয় না। আরোপ বা প্রকাশ বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং হয়েও থাকে। কিন্তু আচার্য শঙ্কর কেবল ভ্রমার্থে অধ্যাস পদটি ব্যবহার করেছেন। আত্মা-অনাত্মার অধ্যাস ভ্রম। ভ্রমে আরোপের বিষয় সত্যবস্তু, কিন্তু আরোপণীয় মিথ্যাবস্তু। আচার্য শঙ্করের মতে, ভ্রমে আরোপের ফলে সত্যবস্তু ও মিথ্যাবস্তুর অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, অধ্যাসে যে একটি বস্তুতে অন্য একটি বস্তুর আরোপ সেখানে বস্তুটি

পারমার্থিকভাবে থাকে না। কিন্তু বস্তুটির প্রকাশ থাকে। অর্থাৎ বস্তুটি পারমার্থিকভাবে থাকে না। কিন্তু বস্তুটির প্রকাশ থাকে। অর্থাৎ বস্তুটি প্রতীয়মান হয়। তাই এই আরোপ বা ভ্রমকে ঐতিহ্য অনুসারে 'খ্যাতি' বলে অভিহিত করা হয়। এই খ্যাতির অর্থ কী? বৈদান্তিক দর্শন ও সাহিত্যে এই 'খ্যাতি' শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পারিভাষিক অর্থে খ্যাতি মানে ভ্রমে ভাসমান বস্তুর জ্ঞান। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভ্রমে একটি বস্তুর ওপর অন্য একটি বস্তু অযৌক্তিকভাবে আরোপিত হয়। এখানে মূলবস্তুর জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, মূলবস্তুটির ওপর আরোপিত বস্তুর জ্ঞান, সত্যবস্তুটির ওপর মিথ্যাবস্তুর জ্ঞান, মূল বস্তুটির ওপর অধ্যস্ত বা ভাসমান বস্তুর জ্ঞান।

ভ্রম প্রক্রিয়ায় ভ্রান্তধী ব্যক্তির যে বিষয় অবলম্বনে ভ্রম হয় সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনে বিতর্কের মহাপ্লাবন বয়ে গেছে। যাঁরা মনে করেন, ভ্রমে অন্তস্থ জ্ঞানাকার বস্তুই বাহ্যাকারে বাহ্যবস্তু রূপে প্রতীয়মান হয় তাঁদের মতবাদকে বলা হয় আত্মখ্যাতিবাদ। যাঁরা ভ্রমপ্রক্রিয়ায় ভাসমান বস্তুকে অসৎ বলেন তাঁদের সিদ্ধান্তকে বলা হয় অসৎখ্যাতিবাদ। যাঁরা ভ্রমপ্রক্রিয়ায় ভাসমান বস্তুকে সৎ বলেন তাঁদের সিদ্ধান্ত সৎখ্যাতিবাদ হিসেবে পরিচিত। যাঁরা ভ্রমে ভাসমান বস্তুকে সদাসৎ বলেন তাঁদের মতবাদকে বলে সদাসৎ খ্যাতিবাদ। যাঁরা মনে করেন, ভ্রমে ভাসমান বস্তু অন্যস্বরূপ অন্যবস্তুর জ্ঞান রূপে প্রতীয়মান হয় তাঁদের মতবাদকে বলে অন্যথা খ্যাতিবাদ। যাঁরা মনে করেন, ভাসমান বস্তুতে কোনো ভ্রমজ্ঞানই স্বীকার্য নয় তাঁদের সিদ্ধান্তকে বলে অখ্যাতিবাদ। আর যাঁরা ভ্রম প্রক্রিয়ায় ভাসমান বস্তুর জ্ঞানকে অনির্বাচ্য বলেন, তাঁদের মতবাদ অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। প্রসিদ্ধ খ্যাতিবাদের নাম এবং সেই খ্যাতিবাদের সমর্থক দার্শনিক সম্প্রদায়ের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে প্রদত্ত হলো :

নং	খ্যাতিবাদের নাম	সমর্থক দার্শনিক সম্প্রদায়ের নাম
১	আত্মখ্যাতিবাদ	বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়
২	অসৎখ্যাতিবাদ	শূন্যবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়
৩	সৎখ্যাতিবাদ	রামানুজ সম্প্রদায়
৪	সদসৎ খ্যাতিবাদ	সাংখ্য পণ্ডিত বিজ্ঞানভিক্ষু সম্প্রদায়
৫	অন্যথা খ্যাতিবাদ	ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়
৬	অখ্যাতিবাদ	মীমাংসক সম্প্রদায়
৭	অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ	শাঙ্কর সম্প্রদায়

ভ্রম সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তকে প্রসিদ্ধ পাঁচ প্রকার খ্যাতিবাদে রূপায়িত করে নিম্নোক্ত কারিকায় প্রকাশ করার একটা ঐতিহ্য আছে।

আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
তথানির্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্।।

ভ্রমের মূলে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ আত্মখ্যাতি, শূন্যবাদী বৌদ্ধ অসৎখ্যাতি, মীমাংসক সম্প্রদায় অখ্যাতি, ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় অন্যথাখ্যাতি এবং বিশুদ্ধ অদ্বৈত বৈদান্তিক সম্প্রদায় অনির্বচনীয় খ্যাতি সমর্থন করে থাকে। এই কারিকার প্রধান অসঙ্গতি হলো, এখানে স্বামী রামানুজের সৎখ্যাতি নামে একটি অতি প্রসিদ্ধ খ্যাতিবাদ উপেক্ষিত হয়েছে। এছাড়া আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুর সদসৎ খ্যাতিবাদেরও এখানে কোনো উল্লেখ নেই। এ ধরনের ত্রুটি থাকায় এ কারিকাকে আধুনিক পণ্ডিত সমাজ প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। তাই একে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যায় না। উপযুক্ত সারণিতে যে কটি খ্যাতিবাদের[১৭] উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতিটি নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা রয়েছে। তবে তার পূর্বে আরও একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া ভালো।

ভ্রমের স্থলে শুক্তিতে যে আমরা রজত প্রত্যক্ষ করি, ওই প্রত্যক্ষে শুক্তিতে কিন্তু রজত আসলে থাকে না। ওই প্রত্যক্ষে কেবল শুক্তিই থাকে। সামনে পতিত ঝিনুকের খণ্ডাংশে রজতের খ্যাতি-ই কেবল থাকে। অর্থাৎ শুক্তি বা ঝিনুকে রজত অধ্যস্ত, আরোপিত বা প্রতীয়মান হয় মাত্র। আর এ কারণেই ভ্রম সম্পর্কে বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে খ্যাতিবাদ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। শুক্তিতে রজতের যে ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষের উদয় হয়ে থাকে, তা সবাই অনুভব করেন। এখন আসল কথা হলো, শুক্তিতে যখন রজত প্রত্যক্ষ হয়, তখন সেই রজত শুক্তিতে কোথা থেকে এবং কীভাবে এলো? কীভাবে এটি নেত্রগোচর হলো এবং প্রত্যক্ষ হলো? এ প্রশ্নই ভ্রমসমীক্ষার আসল প্রশ্ন। কেননা দৃশ্য বিষয় ইন্দ্রিয়ের গোচরে না এলে সেই বিষয়ের জ্ঞানকে তো প্রত্যক্ষ করা যেত না। ভ্রমের ক্ষেত্রে সবাই ঝিনুকের খণ্ডাংশকে রজত খণ্ড হিসেবে প্রত্যক্ষ করে থাকে। শুক্তিতে রজতের ওই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ দার্শনিক আচার্যগণ তাঁদের দার্শনিক সমীক্ষার অনুকূল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার মূল্যায়ন করে প্রপঞ্চিত করার চেষ্টা করেছেন। আর এ কারণেই ভ্রমের ব্যাখ্যায় ভারতীয় দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন খ্যাতিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রথমেই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের আত্মখ্যাতিবাদ নিয়ে আলোচনা করা যায়।

আত্মখ্যাতিবাদ

শঙ্করাচার্য তাঁর অধ্যাসভাষ্যের প্রারম্ভেই ভ্রম বিষয়ে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আত্মখ্যাতিবাদের বিস্তৃত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। অধ্যাসভাষ্যের প্রারম্ভেই তিনি 'তং কেচিদন্যত্র অন্যধর্মাধ্যাস ইতি বদন্তি' নামে একটি বাক্যের অবতারণা করেছেন। এখানে 'কেচিৎ' পদটির দ্বারা তিনি সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, বিজ্ঞানবাদী বা যোগাচার এবং শূন্যবাদী বা মাধ্যমিক[১৮]– এই চার প্রকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। শাক্যমুনির একটি বাণীকে কেন্দ্র করেই বৌদ্ধরা এই চারভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এই বাণীটি ছিল :

'সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং স্বলক্ষণম্ স্বলক্ষণম্ শূন্যম্'। কিন্তু বৌদ্ধ শিষ্যগণ তথাগতের এই রহস্যোক্তির মর্ম উপলব্ধি করতে না পেরে উল্লিখিত চারটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। এর মধ্যে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক বৌদ্ধগণ ক্ষণিক জ্ঞান এবং জ্ঞানের অতিরিক্ত ক্ষণিক জ্ঞেয় বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এটুকুই যে, সৌত্রান্তিকগণ বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলে স্বীকার করেন না। জ্ঞানের বৈচিত্র্য দেখে বাহ্যবস্তু অনুমিত হয়ে থাকে বলে এঁরা মনে করেন। কিন্তু বৈভাষিক সম্প্রদায় বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলে স্বীকার করে নেন। যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদীরা মনে করেন ক্ষণিক বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য, আর জ্ঞানভিন্ন বাকি সবই মিথ্যা, অলীক। জ্ঞানের বাইরে জ্ঞেয় বলে কিছু নেই। যাকে আমরা জ্ঞেয়বস্তু বলি তা জ্ঞানেরই একটি বিশেষ আকার মাত্র। জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তু মূলত এক ও অভিন্ন। জ্ঞেয়বস্তুই জ্ঞানকে রূপায়িত করে, আবার জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়েই জ্ঞেয়বস্তুর প্রকাশ সম্ভব হয়। এ দুটি যেন একে অন্যের অভিন্ন সহচর। একটিকে ছেড়ে অন্যটি থাকতে পারে না।

জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তু পারস্পরিক নিত্য সহচর বলে এরা একই সময়ে জ্ঞানে ফুটে ওঠে। জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তুর এ ধরনের অবিচ্ছেদ্য সাহচর্যই এদের অভিন্নতা সূচিত করে। জ্ঞেয়বস্তু যে বিশেষ আকারধারী ক্ষণিক বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু নয় বা হতে পারে না এ সত্যই ঘোষণা করে চলেছে। ক্ষণিক জ্ঞান ছাড়া যেমন জ্ঞেয়বস্তু নেই, তেমনি ক্ষণিক জ্ঞান ছাড়া জ্ঞাতার অস্তিত্বও স্বীকার্য নয়। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়বস্তু প্রভৃতি সবই অবিদ্যার সৃষ্টি, আর এ কারণেই তা মিথ্যা, বিজ্ঞানবাদীর এ ধরনের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধরা। তাঁরা মনে করেন যা জ্ঞানকে রূপায়িত করে সেই জ্ঞেয়বস্তুকে মিথ্যা, অলীক হিসেবে গ্রহণ করলে জ্ঞানও সে ক্ষেত্রে মিথ্যায় পর্যবসিত হবে। আর এতে মহাশূন্যতাই হবে বৌদ্ধ দর্শনের শেষ কথা। এ-ই হলো সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক বৌদ্ধমতের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। এ আলোচনা থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকরা অপেক্ষাকৃত অনুদার এবং যোগাচার ও মাধ্যমিকরা অপেক্ষাকৃত উদার মনোভাবাপন্ন। এ কারণেই সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকরা হীনযানপন্থী এবং যোগাচার ও মাধ্যমিকরা মহাযানপন্থী হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[২০]

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ মতে, শুক্তিতে যে রজতের ভ্রম হয় সেই ভ্রমের স্থলে শুক্তিতে জ্ঞানের ধর্মই অধ্যস্ত বা আরোপিত হয়ে থাকে। সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক বৌদ্ধরা বাহ্যবস্তুকে সত্য ও স্বাভাবিক বলে মনে করেন। কাজেই তাঁদের মতে, সত্যশক্তির অধিষ্ঠানকে অবলম্বন করেই ভ্রমজ্ঞান সংঘটিত হয়। তবে বিজ্ঞানবাদীরা বাহ্যবস্তুকে অসত্য এবং কল্পিত বলে মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, ওই অসত্য এবং কল্পিত শক্তিকে আশ্রয় করেই 'এটি রজত' (ইদম্ রজতম্) এ ধরনের ভ্রমের উদ্ভব ঘটে। বিজ্ঞানবাদী সিদ্ধান্তে নিরধিষ্ঠানেই ভ্রম জ্ঞানের উদয় হয়। ভ্রমস্থলে 'ইদম্' পদার্থে যা অধ্যস্ত হয়ে থাকে, সেই রজতাদি মানস কল্পনাপ্রসূত এবং মিথ্যা,

সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই এ ধরনের বক্তব্য স্বীকার করেন। বৌদ্ধ দার্শনিকরা তাঁদের নিজেদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলেন যে, যে বস্তু যেভাবে আমাদের জ্ঞানে ধরা দেয়, সেই বস্তু প্রকৃতকল্পে সেরূপই বটে। আর এটাই হলো জ্ঞানের সাধারণ নিয়ম। যদি কোনো ক্ষেত্রে, এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় তাহলে বুঝতে হবে অন্য কোনো প্রবলতর জ্ঞানের সাহায্যে পূর্বে উৎপন্ন জ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে পূর্বের জ্ঞানটি যে স্রেফ ভ্রান্তি, তা উপলব্ধি করতে আমাদের আদৌ অসুবিধা হয় না। 'এটি রজত' এ ধরনের জ্ঞানোদয়ের পর 'এটি রজত নয়' এভাবে যে বাধক জ্ঞান জন্মে তার দ্বারা 'এটি রজত' এই জ্ঞান ভ্রান্ত বলে প্রপঞ্চিত হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, 'এটি রজত নয়' এই বাধকজ্ঞান কোন অংশে কার বাধ সাধন করে? যার ফলে 'এটি রজত' জ্ঞানটি এবার ভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত হলো? 'এটি রজত নয়' এর দ্বারা কি 'এটি রজত' এই জ্ঞানের রজতাংশের নিষেধ হলো? না-কি 'এটি বা ইদম্' অংশের নিষেধ হলো? এখানে বিজ্ঞানবাদীর সিদ্ধান্ত এই যে, 'এটি রজত নয়' এ ধরনের বাধবুদ্ধির উদয়ের ফলে ইদমের সঙ্গে রজতের অভেদবুদ্ধিই বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতকল্পে ভ্রমের ক্ষেত্রে 'ইদম্' অংশেরই বাধ হয়ে থাকে, রজতাংশ বাধাপ্রাপ্ত হয় না। রজতের বাধ স্বীকার করলে সেক্ষেত্রে রজতের ধর্ম 'ইদম্'-এর বাধকেও স্বীকার করে নিতে হয়। কারণ ধর্মী না থাকলে তার ধর্মও থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় রজতের বাধ স্বীকার না করে, কেবল রজতের বাহ্যধর্মের বাধ স্বীকার করাই বেশি যুক্তিযুক্ত। যেখানে একের বাধের দ্বারাই অভিপ্রায় সিদ্ধ হতে পারে সেখানে উভয়ের বাধের কল্পনা করতে যাওয়া যেমন অগৌরবের তেমনি নিষ্প্রয়োজনও বটে। এখানে রজতের 'ইদম্' রূপে বহিঃপ্রকাশ বাধিত হওয়ায় রজত যে বাইরের কোনো বস্তু নয়, মনের বস্তু, আত্মার বস্তু, জ্ঞানেরই এক বিশেষ ধর্ম এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, 'এটি রজত নয়' এ ধরনের বাধবুদ্ধির উদয়ের ফলে আলোচ্য ভ্রমজ্ঞানের 'ইদম্' অংশটি মাত্র অপসৃত হয়ে থাকে, রজতাংশ অপসৃত হয় না। রজতের 'ইদন্তা' বা বহির্বর্তিতা বাধিত হওয়ার কারণে, রজতজ্ঞানের ধর্ম হিসেবে মনোরাজ্যে বিজ্ঞানের আকার বা অংশ হিসেবেই অক্ষুণ্ন থেকে যায়। এটা ভ্রমব্যাখ্যায় আত্মখ্যাতিবাদী বৌদ্ধের বক্তব্য। রজতের এই জ্ঞান স্বরূপতার কারণে আলোচিত এই বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত জ্ঞান খ্যাতিবাদ এবং আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হওয়ার কারণে বৌদ্ধমতের এই খ্যাতিবাদটি আত্মখ্যাতিবাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের আলোচিত এই সিদ্ধান্তে এখানে আরও একটি লক্ষ করার বিষয় হলো, এখানে 'ইদম্'-এ অধ্যস্ত রজত দেখে যেখানে 'এটি রজত' এ ধরনের ভ্রান্তির উদয় হয়, সেখানে মনোময় রজতকে মনোরাজ্যের বাইরে অস্তিত্বশীল বলে প্রতীত হওয়ার কারণে এ ধরনের জ্ঞান মিথ্যা হতে বাধ্য। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসিদ্ধান্তে দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ সবই মনোময় রূপে প্রপঞ্চিত। মনোময় জাগতিক বস্তুর বহিঃপ্রকাশ শুক্তি-রজতের মতোই বিভ্রম বটে। আমাদের চারপাশে এই যে শ্যামলা বিশ্ব-ভুবনের কোটি কোটি বিচিত্রবস্তু অহরহ প্রত্যক্ষ করছি

এগুলোও বিশেষ বিশেষ আকারধারী এক একটি বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজ্ঞানবাদী মনোময় বিশ্বপ্রপঞ্চকে যখন মনোরাজ্যের বাইরে জড়প্রপঞ্চরূপে দেখেন, তখন তাঁর সেই দৃষ্টিকে আমরা ভ্রান্তি ছাড়া আর কোনো কিছু বলতে পারি না। এই ভ্রম লক্ষণের শুক্তিরজত যেমন লক্ষ্য, তথাকথিত সত্যজগৎও তেমনি লক্ষ্য বলে জানতে হবে। জ্ঞেয়মাত্রই জ্ঞানের বিশেষ আকার ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। বিজ্ঞান ছাড়া এ মতে অন্য কোনো পদার্থ নেই। কাজেই, 'ইদম্' রূপে উৎপন্ন সব ধরনের বস্তুজ্ঞানই এ মতে অলীক কল্পনাপ্রসূত এবং মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। এই বিজ্ঞান নদীপ্রবাহের মতো জীবের মনোরাজ্য প্লাবিত করে একটানা বয়ে চলছে। অসংখ্য জলকণা মিলে যেমন নদীপ্রবাহের সৃষ্টি হয়, তেমনি অনন্ত জ্ঞানকণা বা ক্ষণিকবিজ্ঞান মিলে বিজ্ঞানপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই বিজ্ঞানপ্রবাহই বিশেষ আকারপ্রাপ্ত হয়ে জ্ঞেয় বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং জ্ঞাতা 'আমি' প্রভৃতি রূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। 'আমি', 'আমি' (অহমহম্) এ ধরনের বিজ্ঞানপ্রবাহের নামই 'আলয়বিজ্ঞান'। এই আলয়বিজ্ঞানকেই বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে জীবের আত্মা বলা হয়ে থাকে। জ্ঞেয় বিষয়ের দ্বারা বিজ্ঞানের যে বিশেষ রূপ প্রকাশ পায় তাকে বিজ্ঞানবাদী সিদ্ধান্তে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান বলা হয়েছে।[২১] প্রবৃত্তিবিজ্ঞান হিসেবে রজতজ্ঞানও অবশ্য সত্য; কেবল মনোময় রজতকে 'ইদম্' রূপে মনের বাইরে দেখাই এ মতে ভ্রম। এখানে উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে জ্ঞানের স্বভাবই এমন যে, একই জ্ঞান দুভাবে প্রকাশিত হয়। যথা : জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। এই জ্ঞাতাকেই বিজ্ঞানবাদী বলেন 'আলয়বিজ্ঞান' এবং জ্ঞেয়কে বলেন 'প্রবৃত্তিবিজ্ঞান'। জ্ঞাতাতেই জ্ঞান থাকে বলে তার নাম আলয়বিজ্ঞান, জ্ঞেয় বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় বলে তার নাম প্রবৃত্তিবিজ্ঞান।[২২] ভ্রম বিষয়ে এই হলো বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের সিদ্ধান্ত।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ শুক্তি রজতের রজতকে জ্ঞানেরই এক বিশেষ ধর্ম বা আকার বলে সিদ্ধান্ত করে ভ্রমের স্থলে আত্মখ্যাতিবাদ প্রপঞ্চনা করেছেন।[২৩] প্রভাকর মতাবলম্বী মীমাংসক দার্শনিকেরা এখানে প্রশ্ন তুলেছেন, কোন প্রমাণের সাহায্যে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ রজতকে জ্ঞানের ধর্ম বলে সাব্যস্ত করলেন? রজত যদি জ্ঞানের ধর্মই হতো তাহলে তা অহম্ রূপে প্রকাশ পেত। কারণ বিজ্ঞানবাদীরা জ্ঞানকে আত্মা বলে মানেন। এমতাবস্থায় 'ইদম্ রজতম্' বা 'এটি রজত' এ ধরনের জ্ঞান না-হয়ে 'অহম রজতম্' বা 'আত্মা রজত' এভাবে প্রপঞ্চিত হতো। 'এটি রজত' বললে রজতের বহিঃপ্রকাশ এতে সূচিত হলেও যখন 'এটি রজত নয়' বা 'নেদম্ রজতম্' বলা হয় এমন ইদম্ পদার্থ যে রজত নয়, এর দ্বারা কেবল তা-ই জানা যায়। কাজেই 'ইদম্' রূপে যা দৃশ্যমান তা রজত না-হলে, অর্থাৎ রজতের বহিঃপ্রকাশ ব্যাহত হলেই তা-যে অন্তরের বা জ্ঞানের ধর্ম হয়ে যাবে তা কীভাবে বলা যায়? বাহ্যত 'ইদম্' রজত বস্তুর ধর্ম নয়, একথা জানলেই যে তা অন্তরের বা জ্ঞানের ধর্ম হয়ে যাবে, এমন কথা কোনো প্রমাণের দ্বারাই প্রতিষ্ঠা করা যায় না। 'ইদম্' রূপ বাহ্য জগতের নিষেধ হলেও অন্য কোনো বাহ্য রজতের

প্রতীতিও তো হতে পারে। কাজেই বিজ্ঞানবাদীরা যে রজতকে জ্ঞান বা অন্তরের ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তার সমর্থনে তাঁরা কোনো শক্তিশালী প্রমাণ দিতে পারেননি।

বিজ্ঞানবাদীর ভ্রান্তিসিদ্ধ রজতটির উৎপত্তি ও প্রতীতির কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। যে পদার্থ উৎপন্নই হয়নি তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে পারে না বলে শুক্তি-রজত ভ্রমের বিষয়ীভূত ওই রজতটির উৎপত্তি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এর উৎপত্তি কি বাহ্যবস্তু থেকে না-কি আন্তরজ্ঞান থেকে? বাহ্যবস্তু থেকে ওই রজতের উৎপত্তি হতে পারে না। কারণ বিজ্ঞানবাদী সিদ্ধান্তে বাহ্যবস্তু বলে কোনো কিছু নেই। আবার অন্তরজ্ঞান থেকেও এর উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। কারণ নিরন্বয় বা অবলম্বনহীন বিনাশপ্রাপ্ত কোনো জ্ঞান থেকে কোনো কিছুই উৎপন্ন হতে পারে না। রজতস্বরূপ কোনো জ্ঞেয়বস্তুকে যথার্থজ্ঞানের আকার বলা যায় না। কারণ এ জ্ঞেয়বস্তুটি জ্ঞেয় থেকে ভিন্ন হবে, না-কি অভিন্ন হবে তার কোনো স্থিরতা নেই। অভিন্ন হতে পারে না। কারণ নিজেই নিজের গ্রাহ্য হওয়া কোনো পদার্থের পক্ষেই সম্ভব নয়। আবার ভিন্নও হতে পারে না। কারণ জ্ঞানটি ওই রজতের জনক। এ জন্য রজতস্বরূপ জ্ঞেয়বস্তুর পূর্বে জ্ঞানটি থাকবে, আবার জ্ঞেয়বস্তুটি যদি পূর্বে না থাকে তাহলে সেটি সেই জ্ঞানের জ্ঞেয়বস্তুই হতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীরা জ্ঞানটিকেই পূর্ববর্তী বলছেন। কাজেই ওই রজতটি যে জ্ঞানের আকার, সেই জ্ঞানের দ্বারাই যে সে প্রকাশিত হবে তা দাবি করা অযৌক্তিক।

বিজ্ঞানবাদী আত্মখ্যাতিবাদের বিরুদ্ধে আরও কিছু বলার আছে। আত্মখ্যাতিবাদের বিরুদ্ধে প্রভাকরপন্থী মীমাংসকরা বলেন, 'এটি রজত নয়' বা 'নেদম্ রজতম্' এ ধরনের নিষেধ বুদ্ধির দ্বারা 'ইদম্' পদার্থ যে রজত নয় তা অনুধাবন করতে পারলেও রজত যে অন্তরের বস্তু এবং জ্ঞানের ধর্ম একথা বিজ্ঞানবাদীকে কে বলল? 'ইদম্' রূপে সামনে যা দেখা যাচ্ছে তা রজত না হলেও অন্য কোনো বাহ্যবস্তু যে রজত হতে পারবে না তা বিজ্ঞানবাদী কীভাবে ধরে নিলেন, এটা বোঝা যায় না। জ্ঞানের ধর্ম আর 'ইদম্' পদার্থের ধর্ম ছাড়া আর কোনো পদার্থের কি কোনো ধর্ম নেই যে, 'ইদম্' পদার্থের ধর্ম না হলেই তা অগত্যা জ্ঞানের ধর্ম হবেই। বিজ্ঞানবাদী যদি বলেন, ওই রজত যে জ্ঞানের ধর্ম নয়, একথা যখন বুঝা যাচ্ছে না তখন 'ইদম্'-এর ধর্ম না হলে জ্ঞানের ধর্ম হতেই বা বাধা কী? এর উত্তরে বলা যায় যে, রজত বাহ্য, 'ইদম্' বস্তুর ধর্ম নয়– এ থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, রজত অন্তরের বস্তু। প্রকৃতকল্পে 'ইদম্' রূপে প্রকাশিত এই বাহ্যবস্তুটি রজত নয়– এ ধরনের নিষেধের দ্বারা অন্য কোনো বাহ্যবস্তু রজত এরূপ বুঝানোই স্বাভাবিক এবং নৈয়ায়িক। রজতের মনোময়তা সাধন, জ্ঞানধর্মতা প্রপঞ্চনা স্বাভাবিকও নয়, প্রমাণগম্যও নয়। তাই বিজ্ঞানবাদীর ভ্রমব্যাখ্যা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ পর্যায়ে প্রপঞ্চিত মাধ্যমিক শূন্যবাদী বৌদ্ধের ভ্রম বিষয়ক বক্তব্য তথা অসৎ খ্যাতিবাদ দিয়ে আলোচনা করা যাক।

অসৎ খ্যাতিবাদ

পঞ্চপাদিকা বিবরণ এবং রত্নপ্রভা টীকা অনুসারে, মহাবৈদান্তিক আচার্য শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে ভ্রম বিষয়ে যে তৃতীয় লক্ষণের উল্লেখ করেছেন সেই তৃতীয় লক্ষণটি মাধ্যমিক শূন্যবাদী বৌদ্ধের অসৎ খ্যাতিবাদকেই যুক্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। শূন্যবাদী বৌদ্ধমতে, শুক্তিরজতের ভ্রমে শুক্তিতে যে রজত অধ্যস্ত হয় সেই রজত অসৎ।[২৪] মাধ্যমিক শূন্যবাদী বৌদ্ধ দৃশ্যমান বিশ্বভুবনকে যেভাবে মিথ্যা ও অলীক বলেন, ঠিক সেভাবে তাঁরা বিজ্ঞানবাদীর বিজ্ঞানকেও মিথ্যা ও অলীক বলে মনে করেন। মাধ্যমিক মতে, জ্ঞেয়বস্তুই জ্ঞানকে রূপায়িত করে। এখন জ্ঞানের রূপদানকারী জ্ঞেয়বস্তুই যদি মিথ্যা হয়ে যায় তাহলে তথাকথিত বিজ্ঞানও মিথ্যা হতে বাধ্য। জ্ঞেয় যেমন মিথ্যা, জ্ঞাতাও তেমনি মিথ্যা। ভ্রমের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় যেমন মিথ্যা, তেমনি অধ্যস্ত রজতও মিথ্যা। রজতকে যিনি প্রত্যক্ষ করবেন সেই প্রত্যক্ষকর্তাও তেমনি মিথ্যা। সর্বত্রই চলছে মিথ্যার খেলা। এর ফলে শূন্যই দাঁড়ায় চরম কথা। জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতি সবারই মহাশূন্যতায় শেষ পর্যন্ত পর্যবসান হয়। এ কারণেই এই মাধ্যমিক মতবাদ অসৎ খ্যাতিবাদ নামে সমধিক খ্যাতি লাভ করে।

তথাগত বুদ্ধ এই শূন্যতা দিয়ে যে কী বুঝিয়েছেন তা নিয়ে বৌদ্ধ পণ্ডিত সমাজে বিতর্কের মহাপ্লাবন প্রবাহিত হয়ে গেছে। কোনো কোনো প্রাচীন বৌদ্ধ যাঁরা এমনকি বেদব্যাস, জৈমিনি প্রমুখ পূর্বাচার্যের পূর্ববর্তী বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন তাঁরা শূন্যকে অসৎ বলেই সিদ্ধান্ত করতে চান। আলোচিত অসৎ খ্যাতিবাদ এ সকল আদি পূর্বাচার্যের মতবাদ বলেই অনেকে মনে করেন। উত্তরকালে নাগার্জুন প্রমুখ আচার্যগণ বুদ্ধের এই মহাশূন্যকে সৎও নয়, অসৎও নয়, সদসৎও নয়, সদসৎ ভিন্নও নয়, এভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালিয়েছেন। শূন্যবাদীরা আদ্যন্ত অসৎবাদী। তত্ত্ববিচারের শেষ কোটিতে তাঁরা মহাশূন্যতাকেই তত্ত্বভাব বলে মনে করেন। অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁদের মতভেদ সুস্পষ্ট। কাজেই শূন্যবাদীদের পক্ষে আরোপের বিষয় এবং আরোপণীয় উভয়ই প্রকৃত অসৎ। শুক্তি রজতের ভ্রমে ব্যবহারিক শুক্তি যেমন অসৎ, ভ্রমে ভাসমান প্রাতিভাসিক রজতও তেমনি অসৎ। অনুরূপভাবে রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তে ভ্রমজ্ঞানের বিষয় সর্প যেমন অসৎ তেমনি ভ্রমজ্ঞানের অধিষ্ঠান রজ্জুও অসৎ। এ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় শশীভূষণ তর্কবাগীশের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'সর্ব শূন্যতাবাদী বা সর্বাসৎবাদী প্রাচীন নাস্তিক সম্প্রদায়বিশেষের মতে, সমস্ত পদার্থই অসৎ। তাঁহাদের মতে, সর্বত্র অসতের উপরই অসতের আরোপ হইতেছে। সুতরাং তাঁহারা সর্বত্র সর্বাংশেই অসতের ভ্রম স্বীকার করায় 'অসৎখ্যাতিবাদী'। তাঁহারা গগনকুসুমাদি অলীক পদার্থেরও প্রত্যক্ষাত্মক ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন। অসতের ভ্রমই অসৎখ্যাতি'।[২৫]

শূন্যবাদী বৌদ্ধমতে, অবিদ্যার দোষ এবং পূর্বের ভ্রমসংস্কারের কারণে পদার্থের প্রতিভাস হলেই ভ্রমের উৎপত্তি ঘটে। ভ্রমের সময় অসৎ বস্তু প্রতিভাসের জন্য কোনো সত্যবস্তু এবং

সেই সত্যবস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযোগের জন্য প্রমাকরণের আদৌ অপেক্ষা থাকে না। শূন্যবাদী মনে করেন, সত্য অধিষ্ঠানস্বরূপ বস্তুতে মিথ্যা বস্তুর অবভাসকে যারা মিথ্যা ও অলীক বলেন তা সর্বাংশে অর্থহীন মনঃকল্পনা।[২৬] অধিষ্ঠানস্বরূপ সত্যবস্তু এবং সত্য বস্তুবিষয়ক সামান্যাংশের জ্ঞান ছাড়াই অসৎ মায়া কল্পিত রজতাদির প্রতিভাস সম্ভব হতে পারে। ব্যবহারিক জগতের জন্য ব্যবহারিক জীবনে উপলব্ধ কোনো বস্তুর প্রতিভাসেই কোনো সত্য অধিষ্ঠানের আদৌ প্রয়োজন পড়ে না। অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা ভ্রম বিষয়ে শূন্যবাদী বৌদ্ধের এ ধরনের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অযৌক্তিক বলে মনে করেন। কারণ নিরধিষ্ঠান ভ্রম কখনও আমরা প্রত্যক্ষ করি না। নিরধিষ্ঠান ভ্রম তাই সম্ভবই নয়।[২৭] ভ্রমে কোনো-না-কোনো অধিষ্ঠান একেবারেই বাধ্যতামূলক।

শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা যদি মনে করেন যে, নিজ হাতে চোখ মর্দন করলে অনেক সময় চোখরশ্মিকে কেশপিণ্ড বলে আমাদের মনে হয়। ওই কেশপিণ্ড যেমন মিথ্যা, কেশপিণ্ডের জ্ঞানও তেমনি মিথ্যা এবং অধিষ্ঠানসত্তা ছাড়াই ওই কেশপিণ্ডের জ্ঞান আমাদের হয়। তাই নিরধিষ্ঠান ভ্রম অসম্ভব হতে পারে না। অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা শূন্যবাদীদের এ ধরনের দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে বলেছেন, শূন্যবাদীরা যে দৃষ্টান্ত বলে নিরধিষ্ঠান ভ্রম প্রপঞ্চনা করতে চেয়েছেন সেই দৃষ্টান্তস্থলেও নয়নরশ্মির কেশপিণ্ড কোনো-না-কোনো প্রতিভাসকে অবলম্বন করেই অধ্যস্ত হয়। আর শূন্যবাদীদের মতেও ভ্রমে এক বস্তুতে অন্য একটি বস্তু অধ্যস্ত হয়। যে বস্তুতে অন্যবস্তু অধ্যস্ত হয় সেই বস্তুর নিজের স্বভাবের বিপরীত অন্য ধর্ম তাতে কল্পনা করা হয়। ফলে প্রকারান্তরে শূন্যবাদীরাও ভ্রমস্থলে অধিষ্ঠান স্বীকার করে নিয়েছেন অনেকটা তাঁদের অজান্তেই। তাই পরোক্ষভাবে হলেও ভ্রমাবভাসের দ্বিনিষ্ঠতা শূন্যবাদীরা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে, ভ্রমকালে সত্য ও মিথ্যার ইতরতারাধ্যাস বা ভেদাধ্যাস হয়ে মিথুনীকরণ হয়।

শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা মনে করেন, এ ধরনের ভেদাধ্যাস যদি মিথ্যা জ্ঞান ও মিথ্যাবস্তুর পরস্পরাধ্যাসে সংঘটিত হয় তাহলে পরস্পরধ্যাসে মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যা অসৎবস্তু পরস্পর অধ্যস্ত হবে। বাধকপ্রত্যয়ের কারণে ভ্রমের নিরাসকালে মিথ্যাত্বের জন্য প্রাতিভাসিক বস্তু এবং সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান উভয়ই অপসৃত বা বাধিত হয়। শূন্যবাদী সত্যাধিষ্ঠান কল্পনা করতে পারেন না। তাঁরা বীজাঙ্কুর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে রজতভ্রমে সংবিদে রজতের এবং রজতে সংবিদের পরস্পরাধ্যাস স্বীকার করেন। কিন্তু অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা মনে করেন, বীজাঙ্কুর দৃষ্টান্তে শূন্যবাদীরা ভ্রমব্যাখ্যায় ভেদাধ্যাস প্রমাণের যে চেষ্টা করেছেন তাতে তাঁরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, একটি বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমের পর, ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধমতে, পুনরায় অঙ্কুর থেকে বীজোৎপত্তি হলে সেই উৎপন্ন বীজ এবং পূর্বে উৎপন্ন বীজ এক হতে পারে না। শূন্যবাদীরা ভ্রমব্যাখ্যায় যা বলছেন সেই অনুসারে যে সংবিদে অসৎ

রজতের অধ্যাস সেই সংবিদেরই আবার অধ্যাস ঘটে রজতে। কিন্তু শূন্যবাদী বৌদ্ধের পক্ষে সকল বিষয়ের ক্ষণভঙ্গোর কারণে সংবিদ ও রজতের পরস্পরাধ্যাসে প্রয়োজন যুগপৎ একত্রে সহাবস্থান, যা নিতান্তই দুর্ঘট এবং অসম্ভব।

তবে একথাও স্বীকার্য যে, বাস্তবে বীজাঙ্কুর পরস্পরের উপাদানস্বরূপ হলেও বীজাঙ্কুরের পারস্পরিক উপাদানত্বে পরস্পরাক্রমই লক্ষিত হয়। প্রথমে একটি অঙ্কুরোদগম বীজ থেকে দ্বিতীয় অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় অঙ্কুর থেকে দ্বিতীয় বীজের উৎপত্তি ঘটে। এভাবে পারস্পরিকভাবে বীজাঙ্কুরের পারস্পরিক উপাদানত্ব সিদ্ধ হয়, ফলে তা থেকে পরস্পরাশ্রয়ত্ব দোষ অপনোদিত হয়। অধ্যাসভাষ্যে আচার্য শঙ্কর তাই প্রপঞ্চক্রমে আত্মা-অনাত্মার ভেদাধ্যাস প্রসঙ্গো বীজাঙ্কুর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে অনাদি প্রবাহরূপে অধ্যাসের পরিণত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু নিরধিষ্ঠান ভ্রমবাদী বৌদ্ধেরা একথা স্বীকার করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা সাধিষ্ঠান ভ্রমের পক্ষে বলেছেন যে, ভ্রমপ্রক্রিয়ায় ভাসমান বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষই অধিষ্ঠান-অধিষ্ঠেয় ভাব বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ ভ্রমকালে 'ইদম্ রজতম্' দুটি আকার বিশিষ্ট হয়ে জ্ঞান প্রদান করে। ওই দ্বিআকার বিশিষ্ট জ্ঞানে ভাসমান ইদমাংশ এবং রজতাংশ যখন পারস্পরিকভাবে অধ্যস্ত হয়ে একাত্ম হয় তখন প্রকৃতকল্পে ইদম্ অংশের দ্বারা অধিষ্ঠানস্বরূপ বস্তু সূচিত হয়, রজতাংশ মিথ্যা অধিষ্ঠানে আরোপিত অধিষ্ঠেয়মাত্র।

অবশ্য ভ্রমকালে ভ্রান্তধী ব্যক্তি এই জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না। 'এটি রজত নয়' এটি যখন বাধকপ্রাপ্ত বা ব্যধিত হয় তখন শুক্তিকারূপ বিশেষ অংশের জ্ঞান হওয়ায় মিথ্যা রজতের সঙ্গো একাত্মসংর্গাপন্ন শুক্তিকাংশে অধিষ্ঠানভাব সূচিত হয়। আর যদি বিশেষ কোনো ভ্রমের স্থলে অনুমিতির কারণে কিংবা আপ্তবাক্য শ্রবণে ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাতিভাসিক রজত বিশেষে মিথ্যাত্বের জ্ঞান হয়েই থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে জিজ্ঞাস্য হবে, স্বাভাবিক বস্তুটি যদি যথাযথভাবে রজত না-হয় তাহলে পূর্ববর্তী বিষয় হিসেবে সেটি গোচরীভূত হবে কি? তিনি আরও জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ওই পূর্ববর্তী বিষয় হিসেবে গোচরীভূত পদার্থটি স্বরূপত কী? বাধ প্রত্যয়ের দ্বারা যাতে সত্য রজতের পরিবর্তে মিথ্যা রজত অধ্যস্ত হয়েছিল সেই রজতাধ্যাসের আধারস্বরূপ সত্য বস্তুটিই কি রজতাধ্যাসের অধিষ্ঠান?[২৮] অদ্বৈত বৈদান্তিক প্রধান কারণতাবাদ এবং পরমাণু কারণতাবাদ প্রভৃতিকে নিরাস করেছেন। অদ্বৈত বেদান্তের বিচারে প্রপঞ্চ উদ্ভবে ব্রহ্মকারণতা অস্বীকার করা যায় না। পঞ্চপাদিকা বিবরণে সাক্ষ্যচৈতন্যকে সব ধরনের ভ্রমের অধিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করায় কোনো ভ্রমকেই অদ্বৈত বৈদান্তিকের পক্ষে নিরধিষ্ঠান বলে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। এ যুক্তিতেই আচার্য শঙ্কর সব ধরনের ভ্রমকেই অধিষ্ঠান বলে সাব্যস্ত করেছেন। প্রকৃতকল্পে বৌদ্ধরা নৈরাত্মবাদী বলে তাঁদের বিচারে ধ্রুব অনপায়ী সাক্ষীস্বরূপ আত্মার অসদ্ভাব হেতু মায়াময় প্রপঞ্চভ্রম নিরাসে

শূন্যতাপত্তিই হয়। এ কারণেই আচার্য শঙ্কর অসৎখ্যাতিবাদকে একান্তভাবে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন। এ পর্যায়ে সৎখ্যাতিবাদ নিয়ে আলোচনা করা যায়। বৈষ্ণাবতার এবং শ্রী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী রামানুজ ভ্রমব্যাখ্যায় সৎখ্যাতিবাদ প্রপঞ্চনা করেছেন। বলা বাহুল্য যে, শঙ্করাচার্যের অনেক পরে স্বামী রামানুজ আবির্ভূত হয়েছেন। এ কারণে আচার্য শঙ্করের লেখায় এ মতের সমালোচনা লক্ষ করা যায় না। তবে শঙ্করাচার্যের অনুসারীদের কাছে এ মতবাদ তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। বর্তমান আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করার কারণে আমরা এখন এমতের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করব।

সৎখ্যাতিবাদ

ভারতীয় পূর্বাচার্যেরা ভ্রমব্যাখ্যায় যে সকল লক্ষণ উপস্থাপন করেছেন সে অনুসারে ভ্রমাবভাসকে সৎখ্যাতিবাদ, অসৎখ্যাতিবাদ এবং অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ– এ তিনভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে, যদিও বর্তমান প্রবন্ধে ইতোমধ্যে খ্যাতিবাদকে মোট সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিকদের ভ্রম লক্ষণ অনুসারে ভ্রান্তির বিষয়টি যেমন অসৎ নয়, তেমনি অনির্বচনীয়ও নয়। অলৌকিক সন্নিকর্ষের কারণে দেশান্তরস্থিত কালান্তরে দৃষ্ট বস্তুরই ভ্রমে অবভাস হয়। তবে স্বরূপত, ভ্রমাবভাসের বিষয় সম্পূর্ণ সৎ। ভ্রম প্রক্রিয়ায় ভাসমান বস্তু আসলে সৎ। আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবের অনেক পরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য রামানুজ তাঁর শ্রীভাষ্যে ভ্রমব্যাখ্যায় সৎখ্যাতিবাদ প্রপঞ্চনা করেছেন।[২৯] অবশ্য ন্যায়-বৈশেষিকদের ভ্রম লক্ষণ তিনি গ্রহণ করেননি, যদিও তাঁর মতেও অন্য খ্যাতিবাদীদের মতো শেষ পর্যন্ত অন্যথাখ্যাতিবাদের লক্ষণ তিনি অঙ্গীকার করে নিয়েছেন।

রামানুজ তাঁর শ্রীভাষ্যে সৎখ্যাতিবাদ প্রপঞ্চনা করতে গিয়ে শুরুতেই জ্ঞানের সত্যতা উৎপাদন করার চেষ্টা করেছেন। তার মানে অখ্যাতিবাদী প্রভাকর মীমাংসকরা যেমন 'এটি রজত' বা 'ইদম্ রজতম্' এ ধরনের ভ্রমের স্থলে একটি বিশিষ্ট জ্ঞানের পরিবর্তে 'ইদম্'-এর প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতিজ্ঞান– এ ধরনের দুটি সত্যজ্ঞান অঙ্গীকার করে ওই জ্ঞান দুটির অখ্যাতি 'ইদম্ রজতম্' এ ধরনের ভ্রমের ব্যাখ্যা করে জ্ঞানমাত্রকেই সত্য বলে ধরে নিয়েছেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজাচার্যও তেমনি তাঁর শ্রীভাষ্যে 'সমার্থং সর্ববিজ্ঞানমিতি বেদ বিদ্যাংমত্ম'– এ ধরনের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে অখ্যাতিবাদীর ভিন্ন দৃষ্টিতে সকল জ্ঞানকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। রামানুজ ও তাঁর অনুসারীরা সৎখ্যাতিবাদ সমর্থন করতে গিয়ে বলেন যে, ঝিনুকের খণ্ডাংশ দেখে 'ইদম্ রজতম্' এভাবে যে রজতজ্ঞানের উদয় তা ঝিনুকের মধ্যে রজতের যে অংশ আছে সেই রজতাংশকে অবলম্বন করে উৎপন্ন হয়ে থাকে বলে ওই রজতজ্ঞান যে যথার্থ হবে তাতে সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না।

রামানুজ বলতে চান যে, যে-সকল বস্তুর মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্যবোধের উদয় হয় তাদের ওই সাদৃশ্যের মূলে রয়েছে তাদের উপাদান মৌলিক পরমাণুগুলোর সাদৃশ্য। সদৃশ পরমাণুগুলো পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এর ফলেই সদৃশ বস্তুগুলোর মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্যবোধের উদয় হয়। ঝিনুকে যেমন ঝিনুকের পরমাণু আছে, তেমনি রজতের পরমাণুও আছে। এভাবে রজতে যেমন রজতের পরমাণু আছে তেমনি ঝিনুকের পরমাণুও আছে। যে বস্তুতে যে বস্তুর মৌলিক পরমাণু বেশি মাত্রায় বর্তমান থাকে, সেই অনুসারে বস্তুর নামকরণ হয়ে থাকে। ঝিনুকে ঝিনুকের পরিমাণ বেশি থাকলে সেটির নাম হবে ঝিনুক। অনুরূপ যুক্তিতে রজতে রজতের পরিমাণ বেশি থাকলে তার নাম হবে রজত। ঝিনুক খণ্ড দেখে যেখানে 'এটি রজত' এরকম জ্ঞানোদয় হয় সেখানে চোখের ভ্রান্তিবশত ঝিনুকে ঝিনুকের মৌলিক পরমাণুর আধিক্য থাকলেও তা জ্ঞানের গোচর হয় না, তিরোহিতই থাকে। ঝিনুকের মধ্যে অল্পমাত্রায় থাকা রজতের অংশই জ্ঞানে ভাসে এবং রজতেই রজতের জ্ঞানোদয় হয়। রজত দেখে রজতার্থীকে তার প্রতি ধাবিত হতে দেখারও অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। চোখের ভ্রান্তি সেক্ষেত্রে থাকে না, সেখানে ঝিনুকের ঝিনুক অংশটি নেত্রগোচর হয়।

এরই ফলে, ঝিনুককে ঝিনুক বলে লোকে চিনতে পারে, রজত বলে আদৌ বোঝে না। এ জন্যই ওই জ্ঞানকে সত্য, আর ঝিনুকখণ্ডে অল্পমাত্রায় বর্তমান রজতাংশের জ্ঞানকে মিথ্যা বলে। ঝিনুকের জ্ঞানের দ্বারা রজতের জ্ঞানকে বাধাপ্রাপ্ত বা বাধিত হতেও দেখা যায়।[৩০] শুক্তিরজতের রজতজ্ঞান শুক্তির রজতাংশকে আশ্রয় করে উৎপন্ন হলেও শুক্তিরজতের রূপার দ্বারা আসল রূপার কাজ চলতে পারে না। শুক্তিরজতের রূপার দ্বারা প্রকৃত রূপার বাসন, রূপার অলঙ্কার প্রস্তুত করা যায় না। কাজেই রূপার খণ্ড দেখে রূপা বলে জানা, আর শুক্তিরজতের রূপার অংশকে রূপা বলে জানা একই ধরনের জানা বলে সাব্যস্ত হতে পারে না। প্রথম জ্ঞানটিকে বলে সত্যজ্ঞান, আর দ্বিতীয়টিকে বলে মিথ্যাজ্ঞান। রামানুজাচার্যের মতে, দ্বিতীয় জ্ঞানটির ক্ষেত্রেও রজতেই, শুক্তির রজতাংশে রজতবুদ্ধির উদয় হয়েছে বলে এ জ্ঞানও যে যথার্থই জ্ঞানপদবাচ্য, তা অস্বীকার করা যায় না, যেতে পারে না। রামানুজ ও তাঁর অনুসারীদের মতে, ভ্রমপ্রক্রিয়ার সর্বত্র সত্যবস্তুরই প্রকাশ হয়ে থাকে বলে এই মত সৎখ্যাতিবাদ নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

আচার্য রামানুজ তাঁর সৎখ্যাতিবাদ প্রপঞ্চনা করতে গিয়ে বস্তুমাত্রেরই মূল সন্ধান করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ভারতীয় ঐতিহ্যে জড়বস্তুকে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ এই ভূতত্রয়াত্মক কিংবা ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভৌতিক বলা হয়েছে।[৩১] সব বস্তুর মধ্যেই সব মৌলিক বস্তুর সত্তা বিদ্যমান। ক্ষিতির মধ্যে রয়েছে জল ও তেজঃ প্রভৃতি, তেজের মধ্যে রয়েছে ক্ষিতি, জল প্রভৃতি, তেমনি জলের মধ্যে বর্তমান আছে ক্ষিতি ও তেজঃ প্রভৃতির অস্তিত্ব। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। উপাদানের আধিক্য ভেদেই ক্ষিতি, জল,

তেজঃ প্রভৃতির নামকরণ করা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় রামানুজের দৃষ্টিতে মরু-মরীচিকায় জলের জ্ঞান, ঝিনুক খণ্ডে রজতের জ্ঞান কিংবা রজ্জুতে সর্পজ্ঞান কোনো কিছুই অসৎ বস্তুর জ্ঞান নয়। সৌরকিরণের মধ্যে জলের যে অংশ আছে, ঝিনুকের মধ্যে রূপার যে অংশ আছে এবং রজ্জুতে সর্পের যে অংশ আছে, সে সকল সত্যবস্তুকে অবলম্বন করেই ওই সকল জ্ঞানের উদয় হয়ে থাকে, অসত্য বা অলীক বস্তুকে অবলম্বন করে হয় না। 'পীতঃ শঙ্খ'ঃ প্রভৃতি ধারণা বিশ্লেষণ করলেও শ্বেত শঙ্খের পীতবোধ বা কোনো কিছুই রামানুজাচার্যের মতে অযথার্থ বোধ নয়।

এ অবস্থায় বিষয়টা দাঁড়ায় এরকম, জণ্ডিস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, নেত্রযুগলের অন্তর্গত দূষিত পিত্তের পীততার সঙ্গো তার নয়নরশ্মিসমূহ মিশ্রিত হয়ে পড়ে। পিত্তের পীতবর্ণের দ্বারা শঙ্খের স্বভাবসিদ্ধ শুক্লতা অভিভূত হয়ে থাকে। এ জন্য শঙ্খের শুভ্রতা আর জণ্ডিসরোগীর নেত্রগোচর হয় না। শঙ্খটিকে সে সোনার শঙ্খের মতো হলুদ বর্ণের দেখে। এক্ষেত্রে জণ্ডিস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির নেত্রস্থ পিত্তের পীততাই শঙ্খগত হয়ে তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। পিত্তের পীতবর্ণকে অবলম্বন করেই এক্ষেত্রে পীতবুদ্ধির উদয় হচ্ছে। কাজেই জণ্ডিস রোগে পীড়িত ব্যক্তির ওই ধরনের জ্ঞান যে সত্যবস্তুতে আশ্রয় করেই উদিত হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। স্ফটিক স্বভাবত স্বচ্ছ শুভ্র হলেও সম্মুখস্থ জবা কুসুমের লোহিত প্রভায় স্ফটিকের শুভ্রতা যখন অভিভূত হয়, স্ফটিককে রক্তবর্ণ দেখায়, সেখানে জবাকুসুমের রক্তিমাই দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়। কাজেই এখানে স্ফটিকের জ্ঞান সৎই থাকে।

আচার্য রামানুজ তাই এই প্রতীতিকে যথার্থ বলেই মনে করেন। এ ধরনের নানাবিধ যুক্তিজাল বিস্তার করে রামানুজ সব ধরনের ভ্রমের যথার্থতা আবিষ্কার করে নিজের সৎখ্যাতিবাদ প্রপঞ্চিত করেন। স্বপ্নে থাকাবস্থায় জীবের যে-সকল স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়- তাও, সৎখ্যাতিবাদীর মতে সত্যবস্তুরই সত্য জ্ঞান। জীবের পাপ-পুণ্য প্রভৃতির তারতম্য অনুসারে স্বপ্নাবস্থায় ওই জীবের ওই সময়ের ভোগ্য এবং দৃশ্যবস্তুসমূহ জগৎপিতা পরমেশ্বরই করুণাভরে সৃষ্টি করে থাকেন। ঈশ্বরের সৃষ্ট সত্যবস্তুই জীব স্বপ্নাবস্থায় দেখতে পায় এবং ভোগ করে। ওই সব স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু, যে জীবের জন্য দয়াময় শ্রীভগবান সৃষ্টি করেন, সে শুধু তা দেখতে পায় এবং ভোগ করে।[৩২] অন্যে তা জানতে পারে না, ভোগও করে না। ভোক্তা জীবের পক্ষে সেই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন সত্য, তেমনি তার জ্ঞানও সত্য। এটাই সৎখ্যাতিবাদের বক্তব্য।[৩৩]

রামানুজ তাঁর শ্রীভাষ্যে সৎখ্যাতিবাদ প্রপঞ্চনা করতে গিয়ে স্বপ্নাবস্থায় জীব যা দেখে বা ভোগ করে তার সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য, ভ্রমের ব্যাখ্যায় শ্রীভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করেছেন। এ প্রসঙ্গো তিনি জীবের পাপ-পুণ্য, অদৃষ্ট প্রভৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। দার্শনিক চিন্তার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একে কোনোভাবেই শোভন বলে গ্রহণ করা যায় না। ভ্রমের ব্যাখ্যায় ভগবৎ

সৃষ্টি এবং ভগবৎ প্রসাদের ওপর নির্ভর করলে সেই ব্যাখ্যাকে মননের উন্নত স্তরে অবস্থিত, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গঠিত বলে উপযুক্ত মর্যাদা দেয়া যায় না। তাঁর ব্যাখ্যায় যুক্তির চেয়ে শ্রুতি, বিবেকের চেয়ে আবেগ এবং লজিকের চেয়ে ম্যাজিকের ওপর আদ্যতা প্রদান করায় এ ব্যাখ্যাকে দার্শনিক ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করা যায় না।

এছাড়া, মরীচিকা-জল, শুক্তি রজত প্রভৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সৎখ্যাতিবাদের সমর্থক রামানুজ সৃষ্টির মূলতত্ত্ব বিচার করে বিশ্বের সকল বস্তুকেই ক্ষিতি, অপ, তেজঃ এই ভূতত্রয়াত্মক অবস্থা বা পঞ্চভূতের মিশ্রণে গঠিত বলে সিদ্ধান্ত করে, সকল বস্তুতে সকল বস্তুর সত্তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সদৃশ বা তুল্য বস্তু তথা শুক্তি-রজত, রজ্জু-সর্প প্রভৃতির সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শক্তির পরমাণুসমূহের মধ্যে রজতের পরমাণুর কিংবা রজ্জুর পরমাণুসমূহের মধ্যে সর্পের পরমাণুর আংশিক অস্তিত্ব স্বীকার করে শুক্তি-রজত কিংবা রজ্জু-সর্প প্রভৃতিতে যে সত্য রজত কিংবা যে সত্য সর্পের খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানে প্রশ্ন ওঠে, যেহেতু এটি শুক্তি, রজত নয়, কিংবা যেহেতু এটি রজ্জু, সর্প নয়, তাই শুক্তি বা রজ্জুর অংশ বা উপাদান যে সেখানে বেশিমাত্রায় বিদ্যমান আছে, রজত কিংবা সর্পের উপাদানের মাত্রা কম, একথা কিন্তু রামানুজ অস্বীকার করতে পারেন না।

এহেন অবস্থায় যা বেশিমাত্রায় বিদ্যমান সেই শুক্তি বা রজ্জু অংশের জ্ঞান না হয়ে কমমাত্রায় বিদ্যমান রজত বা সর্প অংশের জ্ঞানোদয় হলো কেন? মরুমরীচিকায় যে জলের জ্ঞানোদয় হয় সেখানে বেশি পরিমাণে বিদ্যমান সৌরকিরণমালার প্রতীতি না হয়ে কম মাত্রায় বিদ্যমান জলের জ্ঞান কেন উৎপন্ন হলো? এর কোনো সন্তোষজনক উত্তর আমরা সৎখ্যাতিবাদে পাই না। এছাড়া শুক্তি-রজতের রজত সত্যরজতের মতো ব্যবহারিক জীবনেও আমাদের কোনো কাজে লাগে না। ফলে, শুক্তি-রজতের রজত যথার্থ হলেও প্রকৃত রূপার খণ্ডের ন্যায় তাকে আমরা সত্য বলতে পারি না। সৎ খ্যাতিবাদে এসব আপত্তি থাকার কারণে অন্য কোনো দার্শনিক একে ভ্রমের স্বরূপ ব্যাখ্যার সঠিক মতবাদ বলে গণ্য করেন না। এ পর্যায়ে সদসৎ খ্যাতিবাদ নিয়ে আলোচনা করা যায়।

সদসৎ খ্যাতিবাদ

ভ্রমের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাংখ্যাচার্যগণ যে মতবাদ প্রপঞ্চিত করেন, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে তা-ই সদসৎ খ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। সাংখ্যাচার্যগণ ভ্রমের ব্যাখ্যায় আচার্য রামানুজের সৎখ্যাতিবাদ পরিবর্জন করে এ মতবাদ প্রস্তাব করেন। এ মতবাদের সমর্থনে সাংখ্যাচার্যগণ বলেন যে, ঝিনুকের টুকরো দেখে 'ইদম্ রজতম্' বা 'এটি রজত' এভাবে যে ভ্রমজ্ঞানের উদয় হয় তার উৎপত্তি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যেখানে নেত্রদোষে ঝিনুকের বিশেষ ধর্মের জ্ঞান না হয়ে, 'ইদম্' রূপে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তা মূলত সৎ বা সত্যবস্তুরই জ্ঞান বটে। আবার, 'ইদম্'-এ অনুপস্থিত রজতের যে জ্ঞান তা মূলত সৎ বা

সত্যবস্তুর জ্ঞান নয়, অসতেরই জ্ঞান। তার মানে ভ্রমে সৎ ও অসৎ উভয়ই বিদ্যমান। একারণেই বিজ্ঞানভিক্ষুর এ মত সদসৎ খ্যাতিবাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, ভ্রমের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এ ধরনের সৎ এবং অসতের জ্ঞানোদয় হয়ে থাকে। রূপা প্রকৃতকল্পে সত্যবস্তু হলেও 'ইদম্'-এ, 'ইদম্' রূপে প্রতীয়মান বা ভাসমান বস্তুতে রজতের আরোপকে কোনো মতেই আমরা সৎ বলতে পারি না। 'ইদম্'-এ অধ্যস্ত রজত সৎ নয়, অসৎ। 'ইদম্ রজতম্'–এ ধরনের ভ্রান্তিতে 'ইদম' অংশে সত্যবস্তুর এবং 'ইদম্' রূপ আধারে অসৎ রজতের জ্ঞান হয় বলেই এ মতবাদ সদসৎ খ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। ইদমে অসৎ বা অবিদ্যমান রজতের সত্তা উপপাদনের জন্য আলোচ্য সাংখ্যাচার্যের ব্যাখ্যায়ও রজতের অস্ফুট স্মৃতি, অর্থাৎ 'তদ্‌রজতম্' বা 'সেই রজত' এ সবে রজতের স্মৃতি না-হয়ে শুধু 'রজত' এভাবে রজতের অপরিস্ফুট স্মৃতি, স্মৃতির পরিচায়ক সেই অংশটুকুর অপলাপ এবং ইদম্ পদার্থে রজতের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অস্বীকার করা যায় না।[৩৪]

সৎকার্যবাদী সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুর সিদ্ধান্তে অসতের জ্ঞান স্বীকার করতে হয় বলেই এ মতকে গ্রহণ করা যায় না। অসতের জ্ঞান স্বীকার করতে গেলে আকাশকুসুম, বন্ধ্যাজননী প্রভৃতি অসদ্‌বস্তুর জ্ঞানকেও বৈধতা দিতে হয়। কিন্তু বাস্তবাভিজ্ঞতায় আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাজননীর কোনো অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়। এক কথায় অসতের খ্যাতি অসম্ভব কল্পনা ছাড়া কিছু হতে পারে না। মনে রাখতে হবে যে, খ্যাতি কেবল সৎবস্তুরই হতে পারে, অসৎ বস্তুর খ্যাতি হয় না, হতে পারে না। তাই সদসৎ খ্যাতিবাদ কেবল কথার কথাই মাত্র। এবার ন্যায়-বৈশেষিকদের অন্যথা খ্যাতিবাদ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

অন্যথা খ্যাতিবাদ

অন্যথা খ্যাতিবাদীর মতানুসারে অধ্যাসের লক্ষণ[৩৫] নিরূপণ করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর তাঁর অধ্যাসভাষ্যে বলেছেন : 'যেখানে শুক্তি প্রভৃতিতে রজতের অধ্যাস হয় সেখানে সেই শুক্তির বিপরীত ধর্ম, অর্থাৎ রজতত্বধর্ম কল্পনা করতে হয়'।[৩৬] অর্থাৎ শুক্তিতে তার বিপরীত ধর্মের কল্পনা করলেই তাকে অধ্যাস বলতে হবে। এ ভাষ্যোক্তির তাৎপর্য এই যে, শুক্তিতে যে রজতের জ্ঞান হয়, তা কেবল যেমন শুক্তির জ্ঞানও নয়, তেমনি কেবল রজতজ্ঞানও নয়, এ দুটি জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র তৃতীয় একটি বিশিষ্ট জ্ঞান। এ জ্ঞানের বিশেষ্য হলো 'ইদম্' অংশ আর বিশেষণ হলো রজত। কাজেই এখানে যথার্থ জ্ঞান হলো না, যা-হলো তাকে বলা চলে ভ্রমজ্ঞান। ইদম্ এবং রজতের এই বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবটি আত্মখ্যাতিবাদী বৌদ্ধও স্বীকার করেন। কিন্তু অখ্যাতিবাদী প্রভাকর মীমাংসকরা এটি স্বীকার করেন না।

ভ্রমজ্ঞানের বিষয় অনুপস্থিত রজত, রজতার্থীর প্রবৃত্তি কীভাবে উৎপাদন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে অন্যথাখ্যাতিবাদী বলেন যে, প্রথমত সামনে অবস্থিত চাকচিক্যময় বস্তুর সঙ্গে চোখের

সংযোগ ঘটে। চোখের অসুস্থতা বা দুর্বলতার কারণে সেই চাকচিক্যময় বস্তুর বিশেষ ধর্ম বা স্বরূপ আত্মগোচর হয় না। ইদম্ রূপেই তা তখন জ্ঞানে আসে। এরপর সামনের চাকচিক্যময় বস্তুর এবং রজতের সাদৃশ্য বুদ্ধি উৎপন্ন হয়ে রজতের স্মৃতি জন্মে। স্মৃতিজ্ঞানের বিষয় সেই অনুপস্থিত বা অবিদ্যমান রজতের সঙ্গে সামনে অবস্থিত ইদম্‌বস্তুর যে অভেদ বা তাদাত্ম্যে চোখের অসুস্থতায় কল্পিত হয়ে থাকে তাকেই বলে ভ্রম। এই ভ্রম জ্ঞানোদয়ের ফলে অসত্য রজত দেখেও 'এই রজত লাভ করলে জীবনের অনেক প্রয়োজন সাধিত হবে' এভাবে সত্য রজতের মতোই প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক বুদ্ধির উদয় হয়ে থাকে এবং রজতার্থীর রজত গ্রহণের ইচ্ছা জাগে। ইচ্ছার পর গ্রহণ করার প্রবৃত্তি বা চেষ্টা আসে। এ ধরনের প্রবৃত্তির মূলে আছে ওইরূপ ভ্রান্ত রজতবোধ। এটি কেবল ইদমের প্রত্যক্ষও নয়, আবার রজতের স্মৃতিও নয়। এটি স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ ভিন্ন তৃতীয় একটি বিশিষ্ট জ্ঞান মাত্র।

এখানে যে তৃতীয় বিশিষ্ট জ্ঞানের কথা বলা হলো সেই জ্ঞানের বিশেষ্য হলো 'ইদম্' বস্তু, আর বিশেষণ হলো রজতাংশ। ইদম্‌রূপে সামনে অবস্থিত বস্তুর চাকচিক্য দেখে রজতের স্মৃতি মনোলোকে উদিত হয়ে 'জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ' বলে ইদমে রজতের ভ্রম প্রত্যক্ষ জন্মে। প্রশ্ন থাকে, জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ কাকে বলে? এর উত্তরে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেরা বলেন যে, দৃশ্য বিষয়ের সঙ্গে চোখেন্দ্রিয়ের সংযোগ ছাড়া দৃশ্যবস্তু প্রত্যক্ষগোচর হয় না, হতে পারেও না। প্রত্যক্ষের মূল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে দৃশ্যবিষয়ের এই সম্বন্ধের নামই 'সন্নিকর্ষ'[৩৭]। এটা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার। দৃশ্য বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের এই সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ যেক্ষেত্রে সোজাসুজি পাওয়া যায় না, অথচ সেইরূপ দৃশ্য বিষয়েরও যে প্রত্যক্ষ হবে তাও অস্বীকার করা যায় না। সেখানে একটি অলৌকিক বা গৌণসন্নিকর্ষ আমাদের মেনে নিতে হয়। সেই রূপ স্থানেই 'জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ' স্বীকৃত হয়ে থাকে।

এতে প্রথমে মনের সঙ্গে স্মৃতিপথে আরূঢ় বিষয়ের একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তারপর সেই স্মৃত বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত মন, চোখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ার ফলে, স্মৃত বিষয়ের সঙ্গেও চোখ প্রমুখ ইন্দ্রিয়ের একটি গৌণ সম্বন্ধ সংঘটিত হয় এবং তার ফলেই বিষয়টি প্রত্যক্ষগোচর হয়। এ ধরনের 'জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ' সত্য এবং মিথ্যা উভয় প্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। 'সুরভি চন্দন দেখছি'– এভাবে চন্দনের সুবাসের যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মে, তাও যেমন 'জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ'-মূলক প্রত্যক্ষ, 'ইদম্' রূপে পরিজ্ঞাত শুক্তিতে অনুপস্থিত, স্মৃত রজতের প্রত্যক্ষও জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষমূলক প্রত্যক্ষ। এ ধরনের প্রত্যক্ষের সাহায্যে ভ্রান্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের অগোচরে অবস্থিত স্মৃতিপথে আরূঢ় রজতকে ইদমের সঙ্গে অভিন্নভাবে উপলব্ধি করে থাকে। এটাই হলো ভ্রম। ওই ধরনের ভ্রান্ত রজত প্রত্যক্ষের পর রজতের উপকারিতা নিম্নোক্তভাবে অনুমান প্রক্রিয়ারও প্রপঞ্চনা করা যায়।

ক. রূপা যে কাজে লাগে সামনে রাখা বস্তুও সেই কাজ করার যোগ্য, ...প্রতিজ্ঞা

খ. যেহেতু সামনে রাখা বস্তুও রজত বটে, এতেও রজতের ধর্মত্ব রজতত্ব আছে, ...হেতু

গ. যেখানে যেখানে রজতের ধর্ম রজতত্ব আছে, তা-ই রূপার দ্বারা যে প্রয়োজন সাধিত হয় সেই প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হয়ে থাকে, যেমন : আমার হাতের মুঠায় রাখা রজত; ..... দৃষ্টান্ত

ঘ. এই রজতেও রজতত্ব আছে;..... উপনয়

ঙ. সুতরাং, এই সামনে রাখা বস্তু যে রূপার প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হবে তাতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।.....নিগমন

এভাবে রজতের উপকারিতাবোধ জাগার সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিমান দর্শক রজতগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। ভ্রান্ত ব্যক্তির রজত গ্রহণের প্রবৃত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রভাকর মীমাংসকেরা বলেন, ইদম্ বস্তুকে রজত নয় বলে ভ্রান্ত ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে না। এ জন্যই সে রজত গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। মীমাংসকেরা তাঁদের এ ধরনের অভিমত নিচের অনুমান প্রক্রিয়ায় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

ক. রূপার দ্বারা যে উপকার সাধিত হয়, সামনে রাখা বস্তু সেই উপকার সাধনে সমর্থ হয়ে থাকে, ...প্রতিজ্ঞা

খ. যেহেতু এটি রজতভিন্ন বলে প্রতীতিগোচর হয় না; ..... হেতু

গ. যা রজতভিন্ন বলে প্রতীতিগোচর হয় না, তা রূপার দ্বারা যে উপকার সাধিত হয় সেই উপকার সাধন করতে সমর্থ হয়ে থাকে, যেমন : পূর্বে অনুভূত সত্য রজত; .. উদাহরণ

ঘ. 'ইদম্ রজতম্' বলে ইদমে যে রজতবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাও রজতভিন্ন বলে প্রতীতি হয় না;..... উপনয়

ঙ. সুতরাং, এও রজতসাধ্য উপকার সাধনে সমর্থ হবে বৈকি!.....নিগমন

মীমাংসকদের এ ধরনের অনুমান প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অন্যথা খ্যাতিবাদীর বক্তব্য, মীমাংসকদের এ ধরনের অনুমানের হেতুটি যে সাধ্যের ব্যভিচারী হবে, তা মীমাংসকরা লক্ষ করেননি। সাধ্য বা প্রধান পদ যেখানে নেই সেখানেও মীমাংসক প্রদর্শিত হেতু বা মধ্যপদটিকে বর্তমান থাকতে দেখা যায়। এ ধরনের, সাধ্যের ব্যভিচারী হেতুকে প্রকৃত হেতুপদ বলা যায় না। এ ধরনের হেতুকে বলে দূষিত হেতু বা হেত্বাভাস। রূপার দ্বারা যে কাজ হয় সেই কাজ করার ক্ষমতা একমাত্র রূপাতেই থাকে, অন্য কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু 'রজতভিন্ন বলে বুঝা যায় না' এ ধরনের হেতুপদ রজতে যেমন থাকে, সেই ধরনের রজতভিন্ন ঝিনুকখণ্ড প্রভৃতিতেও

যে তা থাকে তা মীমাংসকেরাও অস্বীকার করতে পারেন না। কারণ মামীংসকেরাই বলছেন যে, সামনে রাখা ইদম্‌বস্তু রজত নয়, অথচ তা রজতভিন্ন বলে প্রতীতিগোচর হচ্ছে না; অর্থাৎ যা রজত নয় তাতেও মীমাংসা প্রদর্শিত অনুমানের হেতুটি যে বিদ্যমান রয়েছে, মীমাংসকদের নিজেদের স্বীকারোক্তি দ্বারাই তা প্রমাণিত হচ্ছে।

এ অবস্থায় আলোচ্য অনুমানের হেতুটি যে সাধ্য পদের ব্যভিচারী হবে তা কারও পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কাজেই মীমাংসা প্রদর্শিত অনুমানের মূল্যকেও স্বীকার করা যায় না। রজতার্থী ব্যক্তির সামনে রাখা 'ইদম্' বস্তু সম্পর্কে যে জ্ঞানোদয় হয়, তা প্রকৃতকল্পে রজতজ্ঞান থেকে পৃথক কোনো জ্ঞান নয়। ওই জ্ঞান সামনে রাখা 'ইদম্'বস্তু থেকে অভিন্নভাবে প্রতীয়মান রজত সম্পর্কেই উৎপন্ন হয়ে আসে। সামনে রাখা 'ইদম্' বস্তুকে বিশেষ্যপদ করে এবং রজতাংশকে বিশেষণ হিসেবে গ্রহণ করে সেখানে যে এক বিশিষ্ট বুদ্ধিই জন্মে তাও নিম্নোক্ত অনুমান প্রক্রিয়ায় সহজেই আমরা প্রমাণ করতে পারি।

ক. ভ্রমপ্রক্রিয়ায় উৎপন্ন রজতজ্ঞান সামনে রাখা বস্তু সম্পর্কেই উদিত হয়ে থাকে...প্রতিজ্ঞা

খ. যেহেতু সামনে রাখা বস্তু প্রতিনিয়ত রজতার্থী ব্যক্তিকে রজত গ্রহণে প্রলুব্ধ করে থাকে, ... হেতু

গ. যে জ্ঞান সেই অর্থী ব্যক্তিকে যে বিষয়ে নিয়তই প্রলুব্ধ করে, সেই জ্ঞান সেই বস্তু সম্পর্কেই উদিত হয়ে থাকে। যেমন : বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ের স্বীকৃত সত্যরজতের জ্ঞান, ... উদাহরণ

ঘ. ভ্রমপ্রক্রিয়ার রজতজ্ঞান ও প্রতিনিয়তই রজতার্থীকে রজত গ্রহণে প্রলুব্ধ করে থাকে, ... উপনয়

ঙ. সুতরাং, ভ্রান্ত রজতজ্ঞানও যে সামনে রাখা বস্তুকে অবলম্বন করেই উদিত হয়ে থাকে, এ কথা নিঃসন্দেহ। ..... নিগমন

ভ্রমপ্রক্রিয়ায় 'ইদম্ রজতম্' এভাবে যে জ্ঞানোদয় হয় তা যেমন কেবল ইদম্‌জ্ঞান নয়, তেমনি তা কেবল রজতজ্ঞানও নয়, ইদমের সঙ্গে অভিন্নভাবে উৎপন্ন রজতের একটি বিশেষ প্রকারের বোধ। ইদমের প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি, এ দুটি জ্ঞান স্বীকার না করে তৃতীয় একটি বিশিষ্ট ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করলে সকল জ্ঞানের প্রামাণ্য বা বৈধতা সম্পর্কে সংশয় উপস্থিত হয়। জ্ঞানের বৈধতা সম্পর্কে সংশয় রাখলে আমরা কোনো জ্ঞানের ওপরই নির্ভর করতে পারি না। কোন জ্ঞানটি ভ্রম, আর কোন জ্ঞানটি সত্য তা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সকল জ্ঞানকে প্রজ্ঞা বা যথার্থজ্ঞান বলে গ্রহণ করলে আর সেই ভয় থাকে না। সুতরাং, 'যথার্থং সর্ববিজ্ঞানম্' সমস্ত জ্ঞানই সত্য, এ সিদ্ধান্তই নির্বিবাদে মেনে নেয়া সবচেয়ে নিরাপদ। অনুমান প্রভৃতির দ্বারাও এ

ধরনের সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। মীমাংসকদের এ ধরনের উত্তরের প্রত্যুত্তরে অন্যথাখ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক বলেন যে, মীমাংসকেরা সকল জ্ঞানের বৈধতা সাধনের উদ্দেশ্যে যে অনুমান উপস্থাপন করেছেন সেই অনুমানও ত্রুটিমুক্ত নয়। মীমাংসা মতে, জ্ঞানের বৈধতা স্বতঃ এবং স্বাভাবিক হলেও জ্ঞানের উপাদানের মধ্যে কোথাও যদি কোনো ত্রুটি থাকে তাহলে ওই ত্রুটির কারণমূলে উৎপন্ন জ্ঞান যে সত্য না হয়ে মিথ্যাই হবে তা সবাই উপলব্ধি করতে পারেন। এ অবস্থায় যেহেতু এটি জ্ঞান, তাই তা সত্য, এ ধরনের নিশ্চিতি কাম্যও নয়, শোভনও নয়। জ্ঞানত্বকে হেতুরূপে উপস্থাপন করে মীমাংসকেরা জ্ঞানমাত্রেরই যে সত্যতার অনুমান করেছেন সেই অনুমানের হেতু যে হেত্বাভাসপূর্ণ হবে তা অবশ্যই স্বীকার্য। ভ্রম বিষয়ে এটাই অন্যথাখ্যাতিবাদের বক্তব্য।

অন্যথা খ্যাতিবাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুলেছেন বিশুদ্ধ অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা। আচার্য শঙ্কর এই অদ্বৈতবাদী মতের এক প্রধান প্রবক্তা। ভ্রমের স্বরূপ ব্যাখ্যায় অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদের সমর্থক বিশুদ্ধ অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা বলেন, অন্যত্র অবস্থিত রজতের 'জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ'বশত ইদমে প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে, অন্যথা খ্যাতিবাদীর এ ধরনের বক্তব্য যুক্তিসিদ্ধ নয়। কারণ প্রত্যক্ষস্থলে দৃশ্য বিষয়ের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়াদির সন্নিকর্ষ বা সংযোগ অতি আবশ্যক। যে বস্তুর সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় না তা কখনও প্রত্যক্ষ হতে পারে না। প্রত্যক্ষভ্রমস্থলে ইদম্‌বস্তুতে দূরবর্তী ঘরে অবস্থিত রজতের প্রত্যক্ষকে স্বীকার করলে সেই ঘরে অবস্থিত রজতের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এতে দূরবর্তী রজতের সঙ্গে চোখের সংযোগ ঘটে না। কাজেই একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ইদম্ পদবাচ্য শুক্তিতে রজতের যে ভ্রম প্রত্যক্ষ হয়, তাতে রজতের সেই ভ্রান্তি প্রত্যক্ষ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগের কারণে হয় না। ইদমে প্রকৃতকল্পে রজত নেই, অথচ সত্য রজতের প্রত্যক্ষের মতোই কোনো বিশেষ দেশ, কোনো বিশেষ কাল নিয়েই যে এখানে রূপার প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়ে থাকে তা অস্বীকার করা যায় না।

এই সর্বজনীন প্রত্যক্ষবোধ প্রপঞ্চনা করার জন্য অবিদ্যার কারণে সেই দেশে এবং কালে তখনকার মতো অনির্বচনীয় বা প্রাতিভাসিক রজতের উৎপত্তি ঘটে থাকে– এ ধরনের অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। যদি বলা হয়, ভ্রমপ্রক্রিয়ায় রজতের যে প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদয় হয় তা অন্যথা খ্যাতিবাদের মতে লৌকিক প্রত্যক্ষ নয়, তা অলৌকিক প্রত্যক্ষ। লৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে দৃশ্য বিষয়ের সংযোগ অত্যাবশ্যক হলেও অলৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে তা অপরিহার্য নয়। রজত এখানে বস্তুত সন্নিহিত নেই বলেই তার প্রত্যক্ষের জন্য অলৌকিক সংযোগের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। সেই অলৌকিক জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষের কারণ ঘরে অবস্থিত রজতেরই ইদমে প্রত্যক্ষ হতে বাধা নেই। ইদম্ বস্তুর সঙ্গে চোখের সংযোগের ফলে রজতের মতো চাকচিক্য দেখে পূর্বানুভূত রজতের যে স্মৃতি মনের

মধ্যে উদিত হয়, তা-ই রজতের জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ। সেই অলৌকিক সন্নিকর্ষ এবং ইদমের সঙ্গে চোখের সংযোগরূপ লৌকিক সন্নিকর্ষ, এ দুটি মিলিত হয়েই ঝিনুকখণ্ডে 'ইদম্ রজতম্' এভাবে বিভ্রম জন্মে।

ভ্রমের এ ধরনের ন্যায়-বৈশেষিকদের ব্যাখ্যার প্রতিবাদে অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা বলেন যে, ন্যায়শাস্ত্রের দৃষ্টিতে বিচার করলে যেসকল অনুমানের পক্ষপদ প্রত্যক্ষগম্য, সে সব স্থলে প্রত্যক্ষত জ্ঞান পক্ষে সাধ্যপদের আর অনুমান জ্ঞানোদয় হতে পারে না। আলোচিত জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষের কারণে সে সকল ক্ষেত্রে পক্ষে সাধ্যপাদের প্রত্যক্ষই হয়ে দাঁড়ায়। পর্বতগাত্র থেকে উত্থিত ধূমরাজি দেখে 'যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্' এভাবে ধূম ও বহ্নির যে ব্যাপ্তির স্মৃতি হয়ে থাকে, ওই ব্যাপ্তি স্মৃতি বলে, পর্বতে বহ্নির অনুমান না হয়ে, জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষের কারণ অনুমানের ক্ষেত্রে সর্বত্র বহ্নির প্রত্যক্ষই উৎপন্ন হবে। কেননা অনুমানের উপাদান এবং প্রত্যক্ষের উপাদান এই উভয়বিধ উপাদান বর্তমান সকলে সেক্ষেত্রে অনুমানের উদয় না হয়ে প্রাত্যক্ষিক জ্ঞানেরই উদয় হয়। আর এটাই সর্বজনীন নিয়ম। ফলে প্রবলতর প্রত্যক্ষের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনুমানেরই যে উচ্ছেদ ঘটে যাবে, ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

অনুমানের এ ধরনের উচ্ছেদ-নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষের সঙ্গে বিরোধে অনুমানের বৈধতা সমর্থনের জন্য নৈয়ায়িক যদি বলেন যে, লৌকিক প্রত্যক্ষের উপাদান এবং অনুমানের উপাদান– এই উভয় প্রকার উপাদান উপস্থিত থাকলে তবেই সেখানে প্রবলতর প্রমাণ প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুমান বাধিত হবে এবং সেক্ষেত্রে অনুমান না-হয়ে প্রাত্যক্ষিক জ্ঞানেরই উদয় হবে। কিন্তু প্রত্যক্ষটি যদি লৌকিক না-হয়ে অলৌকিক হয় তাহলে সেখানে অলৌকিক প্রত্যক্ষের চেয়ে অনুমানই শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াবে। অনুমানের উচ্ছেদের প্রশ্নই ওঠে না। নৈয়ায়িকদের এ ধরনের সমাধানেরও কোনো মূল্য দেয়া যায় না। কারণ, লৌকিক প্রত্যক্ষের উপাদানের মতো অলৌকিক প্রত্যক্ষের উপাদানও যে অনুমান অপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে থাকে তা অবশ্যই স্বীকারযোগ্য। এক্ষেত্রে ন্যায়-বৈশেষিকদের কী বক্তব্য তা বোঝা যায় না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সমান বিষয়ে লৌকিক এবং অলৌকিক– এই উভয় প্রকার প্রত্যক্ষের উপাদানই অনুমান থেকে শক্তিশালী এবং অনুমানকে প্রতিহত করতে সক্ষম। এর ফলে অনুমানের উচ্ছেদই অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু অনুমানের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা নৈয়ায়িক দার্শনিকেরা অনুমানের বিনাশ বা উচ্ছেদ সাধনে অবশ্যই সম্মত হবেন না। অনুমান উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার শঙ্কায় অগত্যা তাঁরা জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ এর পক্ষই পরিত্যাগ করতে চাইবেন। আলোচ্য জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ না মানলে, ভ্রমপ্রক্রিয়ায় ঝিনুকখণ্ডে অনুপস্থিত রজতের জ্ঞানও হতে পারে না, আবার প্রত্যক্ষও অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভ্রম প্রক্রিয়ায় 'ইদম্' বস্তুকে সবাই রূপার খণ্ড বলে প্রত্যক্ষ করে থাকেন। রজতের এই চাক্ষুষ প্রাত্যক্ষিক ক্ষমতা উৎপাদনের জন্য সাময়িক অনির্বচনীয় রজতের উৎপত্তিকে এ অবস্থায় স্বীকার না করে উপায় নেই। জ্ঞান-

লক্ষণা–সন্নিকর্ষ না মানলে 'সুরভি ছন্দময়' এরূপ জ্ঞানে সৌরভের সঙ্গে চোখের সাক্ষাৎ সংযোগ না থাকায় সৌরভের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষতা উপপাদন করা অসম্ভব বলে উক্ত জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ মানার অনুকূলে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয়ে থাকে, বৈদান্তিকের মতে সেই যুক্তিরও কোনো মূল্য স্বীকারযোগ্য নয়।

তাছাড়া, তর্কের খাতিরে জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ স্বীকার করলেও এর দ্বারা যে শুক্তি রজতের বিভ্রম ব্যাখ্যা করা যায় না, ভ্রান্তির ব্যাখ্যার জন্য রজতের সাময়িক অবিদ্যক উৎপত্তিই স্বীকার করে নিতে হয়, তা সমর্থন করতে গিয়ে অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা বলেছেন যে, জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষের কারণে ন্যায় মতে চন্দন সৌরভের যে প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে, ওই প্রাত্যক্ষিক জ্ঞানটি অনুব্যবসায়ের সাহায্যে যখন দ্রষ্টার গোচরে আসে তখন সাধারণ প্রত্যক্ষ হিসেবেই তা প্রকাশিত হয়। এটাই যদি জ্ঞান-লক্ষণা-সন্নিকর্ষ স্বীকার করেও শুক্তি রজতের ভ্রম প্রক্রিয়ায় 'আমি রজতের টুকরোটিকে চোখের দ্বারা দেখছি' এ ধরনের রজতের প্রত্যক্ষ ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরাও উপপাদন করতে পারবেন না। এসব আপত্তির কারণে অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা ভ্রমব্যাখ্যায় ন্যায়-বৈশেষিকদের অন্যথা খ্যাতিবাদকে একটি গ্রহণযোগ্য মতবাদের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। এবার প্রভাকর মীমাংসক দার্শনিকদের অখ্যাতিবাদ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

অখ্যাতিবাদ

প্রভাকর মীমাংসকেরা ভ্রমের স্বরূপ ব্যাখ্যায় যে মতবাদ প্রপঞ্চনা করেছেন তারই নাম অখ্যাতিবাদ। এরা ভ্রমজ্ঞানের অস্তিত্বকেই স্বীকার করেন না। এরা মনে করেন 'নেদম্ রজতম্' এই নিষেধে আমরা এটুকুই বুঝতে পারি যে, ভ্রম প্রক্রিয়ায় প্রকৃতকল্পে রজতের নিষেধ হয় না। এমনকি 'ইদম্'-এর নিষেধও সূচিত করে না। রজতের সঙ্গে ইদম-এর যে কোনো সম্বন্ধ নেই, 'ইদম্' ও রজত যে পারস্পরিকভাবে অসম্বন্ধ, সেই অসম্বন্ধ বা ভেদের জ্ঞানাভাবের কারণেই দুটিকে একত্রে মিলিয়ে 'ইদম্ রজতম্' এ ধরনের মিথ্যাবুদ্ধির উদয় হয়ে থাকে। 'ইদম্' ও রজতের ভেদবুদ্ধির অভাবে 'ইদম্ রজতম্' এভাবে ভাষায় প্রয়োগ ভ্রান্তদর্শীর রজতকে করতলগত করার চেষ্টা লক্ষ করা যায় তারও নিষেধ 'নেদং রজতম্' এ ধরনের বাধবুদ্ধির দ্বারা সূচিত হয়ে থাকে।

অখ্যাতিবাদের লক্ষণ নির্বাচন করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর তাঁর অধ্যাসভাষ্যে বলেছেন, যে-বস্তুতে যে-বস্তুর অধ্যাস বা ভ্রম জন্মে সেই উভয় বস্তুর মধ্যে পরস্পর যে ভেদ বিদ্যমান আছে, ওই ভেদের জ্ঞানোদয়ের অভাবই এক বস্তুতে অন্য বস্তু বলে বুঝে থাকে।[৩৮] উভয়ের বিভেদ ভুলে অভেদের বোধক 'ইদম্ রজতম্' এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করে। আর একেই বলে ভ্রম।[৩৯] প্রকৃতকল্পে ভ্রম বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। সকল জ্ঞানই সত্যজ্ঞান বা প্রমা।[৪০] ভ্রমজ্ঞান একটি কথার কথা মাত্র। শুক্তিতে রজতের অধ্যাস বা ভ্রম হয় বলে লোকে যে ব্যবহার করে তার রহস্য শুধু এই যে, শুক্তি ও রজতের মধ্যে যে ভেদ আছে ভ্রান্তদর্শী তা ভুলে

যায়। আর এ কারণেই সে রজতকে 'ইদম্' বলে শুক্তির সঙ্গে অভিন্ন করে নির্দেশ করে। এভাবে শব্দের প্রয়োগ এবং ভেদ অভেদের নির্দেশই ভ্রম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করছে।[৪১] জ্ঞান আসলে জ্ঞেয়বস্তুর প্রকৃত রূপেরই পরিচয় প্রদান করে থাকে। জ্ঞানোদয়ের ফলে আমাদের দৃষ্টিতে যে-বস্তু যেভাবে প্রকাশিত হয়, তা যদি ঠিক সেরূপ না-হয় তাহলে আমরা কোনো জ্ঞানের ওপরই নির্ভর করতে পারি না। সকল জ্ঞানের বৈধতা সম্পর্কেই তখন সংশয় উপস্থিত হয়। ফলে জ্ঞানের দ্বারা কোনো ক্ষেত্রেই আমরা জ্ঞেয়বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করতে পারি না।

কাজেই জ্ঞানমাত্রই স্বতঃপ্রামাণ্য এবং যথার্থ– একথা আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। এখন কথা হলো, জ্ঞানমাত্রই যদি সত্য হয়, যথার্থ হয় তাহলে মানুষ যে ভ্রমজ্ঞানের কথা বলে সেই ভ্রমজ্ঞানের অর্থ আসলে কী? এর উত্তরে প্রভাকরপন্থি মীমাংসকেরা বলেন, ঝিনুকের টুকরো দেখে 'ইদম্ রজতম' এভাবে যে তথাকথিত ভ্রমজ্ঞানের উদয় হয় তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মানুষ যাকে ভ্রমজ্ঞান বলে তা একটি মাত্র নয়, দুটি জ্ঞান সূচিত করে। আর সেই দুটি জ্ঞানই সর্বৈব সত্য, আদৌ মিথ্যা নয়। সেই দুটি সত্যজ্ঞানকে ভ্রান্তধীব্যক্তি দুটি জ্ঞান বলে বুঝতে পারে না। জ্ঞান দুটি একত্র করে একটি জ্ঞান বলে সে ভ্রম সম্পাদন করে। 'ইদম' জ্ঞানটি এখানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আর রজত-বিষয়ক জ্ঞানটি স্মৃতিজ্ঞান। 'ইদম' জ্ঞানটি প্রত্যক্ষজ্ঞান এ কারণেই যে, এটি চোখের গোচরে অবস্থিত কোনো বস্তুকে বুঝায়। এই 'ইদম' জ্ঞানটি, যাকে আমরা প্রত্যক্ষজ্ঞান বলেছি সেটি দর্শকের মনে পূর্বে অনুভূত রজতের সুপ্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে বলে রজতের জ্ঞান স্মৃতিজ্ঞান। আর সেই জাগ্রত রজতের সংস্কারই রজতের সুপ্তস্মৃতিকে জাগ্রত করে দেয়। তাহলে দেখা গেল, আলোচ্যস্থলে জ্ঞান একটি নয়, দুটি। একটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আর দ্বিতীয়টি স্মৃতিজ্ঞান।

অখ্যাতিবাদীদের মতে, 'ইদম্ রজতম্' বললে 'ইদম্'-এর যে প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান হয় তা যেমন সত্য, রজতের যে স্মৃতি, সেই স্মৃতিজ্ঞানও তেমনি সত্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, 'ইদম্'-এর প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান আর রজতের স্মৃতিজ্ঞান কিন্তু এক ধরনের জ্ঞান নয়, পরস্পর পৃথক দু' ধরনের জ্ঞান। এ জ্ঞান দুটির মধ্যে জাতিগত, আকারগত এবং বিষয়গত যে পার্থক্য আছে ভ্রান্তধী ব্যক্তি তা উপলব্ধি করতে পারে না। এ জ্ঞান দুটি ভ্রান্তধীব্যক্তির কাছে দুটি জ্ঞান বলে খ্যাতি লাভ করে না। এ দুটি জ্ঞানকেই সে একটি বিশিষ্ট জ্ঞান বলে মনে করে এবং সেই অনুযায়ী সে ব্যবহারও করে থাকে। ইদম্ এবং রজতের অভেদ উপলব্ধি করে ভ্রান্তধীব্যক্তি রজত লাভের আশায় রজতের প্রতি ধাবিত হয়। এই জ্ঞানকে সে রজতের মতো, রজতের প্রত্যক্ষের মতো সত্য ও স্বাভাবিক বলে মনে করে। তথাকথিত ভ্রমজ্ঞান এবং সত্যজ্ঞানের পূর্ণ সাদৃশ্যই যে তার এই মনে করার কারণ, এতে কোনো সংশয় নেই। ভ্রমজ্ঞানের সমর্থক দার্শনিকেরা প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি যে দুটি ভিন্ন জ্ঞান এ কথা স্বীকার করেন না। আর এ কারণে তাঁরা এই জ্ঞান দুটির অখ্যাতিও সমর্থন করতে পারেন না। ভ্রমজ্ঞান বলে তাঁরা একটি বিশিষ্ট জ্ঞানকে স্বীকার করে নেন, যা আদৌ ঠিক নয়। এখানে প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতি, এ দুটি জ্ঞানের

অখ্যাতি স্বীকার করে নিলেই 'ইদম্ রজতম্' এ ধরনের ভ্রমের যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদর্শন করা যেতে পারে। এহেন অবস্থায় ভ্রমজ্ঞান বলে তৃতীয় একটি বিশিষ্ট জ্ঞান ভ্রমের ক্ষেত্রে মেনে নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বলে অখ্যাতিবাদী প্রভাকর মীমাংসকেরা মনে করেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, 'ইদম্ রজতম্' এ ধরনের ভ্রমের স্থলে যেমন প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতি, এ জ্ঞান দুটির অখ্যাতি হয়ে থাকে, তেমনি ওই জ্ঞান দুটির যা বিষয়—ইদম্ এবং রজত তাদের পারস্পরিক পার্থক্য ভ্রান্তধীব্যক্তির জ্ঞানে ভাসে না। জ্ঞান দুটির ভেদও যেমন গৃহীত হয় না, জ্ঞেয় বিষয়ের পারস্পরিক পার্থক্যও অবোধগম্য থাকে। আর এ কারণেই ভ্রান্তি জন্মে। ওই জ্ঞান দুটি পরস্পর ভিন্ন জাতীয় জ্ঞান; ইদম্ জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ আর রজত জ্ঞানটি স্মৃতি, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। দুটি বিজাতীয় জ্ঞানের ভেদ গৃহীত হয়নি বলেই অভেদের সূচক 'ইদম্ রজতম্' এরূপ বিভ্রমের সৃষ্টি হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'পীতশঙ্খ' ভ্রমের উল্লেখ করা যায়। 'পীতশঙ্খ' এ ধরনের শব্দপ্রয়োগ এবং ব্যবহারের তথ্য যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে, হলুদ বর্ণের একটি ফুল দেখে যখন আমরা একে হলুদ বর্ণের বুঝি তখন হলুদ বর্ণের সঙ্গে ওই ফুলের সম্বন্ধ যে আসলে নেই তা বুঝি না। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলেই আমরা ধরে নিই। ফলে ফুলটিকে হলুদ বর্ণের বলে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করি। অনুরূপ ভ্রান্তি 'পীতশঙ্খ'-এর ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে। এখানেও আমরা পীতবর্ণের জ্ঞান এবং শঙ্খজ্ঞানকে এক ও অভিন্ন বলে ভ্রম উৎপাদন করি।

প্রসঙ্গত একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো ভ্রমের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় এই উভয়ের ভেদবুদ্ধি অপসৃত হয়ে তথাকথিত ভ্রম উৎপাদিত হয়ে থাকে। 'ইদম্'-এর প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি এই উভয় জ্ঞানের এবং এ দুটি জ্ঞানের বিষয় ইদম্ এবং রজত, এদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য আছে তা আমাদের অনুভবেই ধরা দেয় না। এর ফলে 'ইদম্ রজতম্' এ ধরনের বিভ্রম ঘটে। আবার কখনও কখনও জ্ঞানের বিষয় দুটি পারস্পরিকভাবে পৃথক বোধ হলেও জ্ঞানদুটির অভেদবুদ্ধির কারণে ভ্রমের উৎপন্ন হয়। 'পীতশঙ্খ' এ ধরনের বিভ্রম। এখানে পীতবর্ণের জ্ঞান এবং শঙ্খজ্ঞান, এই জ্ঞান দুটি পারস্পরিক অভিন্ন বলে মনে হলেও ওই জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয় শঙ্খ এবং পীতবর্ণের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য বিদ্যমান তাকে অস্বীকার করা যায় না। এক্ষেত্রে জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও জ্ঞানদুটির মধ্যে কোনরূপ ভেদবুদ্ধি না থাকায় ভেদজ্ঞানের অখ্যাতি নিবন্ধনই যে এরূপ ভ্রান্তির কারণ তা অস্বীকার করা যায় না।

কাজেই ভ্রমবাদীগণ যাকে ভ্রম বলে দাবি করেন, তা ঠিক নয়। জ্ঞানমাত্রই যথার্থ এবং সত্য। মিথ্যা বা ভ্রান্তজ্ঞান বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়। সংশয় বা ভ্রম বলে মানুষ যা ব্যবহার করে, সেই ব্যবহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেই সকল ব্যবহারের মূলে সত্য বা যথার্থজ্ঞান বিদ্যমান। ভ্রমজ্ঞান বলে প্রকৃতকল্পে কোনো কিছু নেই বলে 'ইদম্ রজতম্' এ ধরনের ভেদ অভেদের ব্যবহার এবং সেইরূপ শব্দ প্রয়োগই কেবল হতে দেখা যায়। 'নেদম্

রজতম' এ ধরনের জ্ঞানকে যে ভ্রমজ্ঞানের বাধকজ্ঞান বলে তা-ও ঠিক বা যথার্থ কথা নয়। জ্ঞান কোনো কালে কোনো অবস্থায় বাধিত হয় না। জ্ঞান সর্বত্রই অবাধিত থাকে। আর এটাই জ্ঞানের স্বভাব। কেবল 'ইদম্ রজতম্' এ ধরনের অভেদবোধক শব্দের প্রয়োগ এবং অভেদমূলক ব্যবহারের বাধ সাধন করে বলেই পরবর্তীকালে উৎপন্ন 'নেদং রজতম্' এই জ্ঞানকে বাধকজ্ঞান বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানের বাধক বলে একে বাধকজ্ঞান বলে না, অভেদবুদ্ধির মূলে উৎপন্ন ব্যবহারের বাধ সাধন করে বলেই গৌণভাবে একে বাধকজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। জ্ঞানমাত্রই যে অবাধিত সত্য এবং যথার্থ একথা অখ্যাতিবাদের সমর্থক প্রভাকর মীমাংসকেরা নিম্নোক্ত অনুমান প্রক্রিয়ায়ও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

ক. 'ইদম্ রজতম্' এ ধরনের ব্যবহারের কারণ জ্ঞান যথার্থ বটে,.....প্রতিজ্ঞা

খ. যেহেতু তা-ও জ্ঞান পদবাচ্য,.....হেতু

গ. জ্ঞানমাত্রই যথার্থ বা সত্য হয়ে থাকে, যেমন বাদী মীমাংসক প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের অভিমত এই প্রভৃতির জ্ঞান,.....উদাহরণ

ঘ. 'ইদম্ রজতম্' এ ধরনের ব্যবহারের মূলে জ্ঞানরূপ হেতু বিদ্যমান আছে,.....উপনয়

ঙ. সুতরাং 'ইদম্ রজতম্' এই ব্যবহারের কারণে জ্ঞানও যে যথার্থই হবে, তাতে সন্দেহ কী?.....নিগমন

এভাবেই প্রভাকর সম্প্রদায়ের মীমাংসকেরা জ্ঞানমাত্রেরই যথার্থতা বা সত্যতা প্রতিপাদন করে তথাকথিত ভ্রমব্যাখ্যায় তাদের অখ্যাতিবাদ প্রতিপাদন করেন।

প্রভাকর মীমাংসকদের অখ্যাতিবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে অন্যথা খ্যাতিবাদের সমর্থক ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা বলেন, 'ইদম্ রজতম্' এ ধরনের জ্ঞানোদয়ের পর রজতার্থী ব্যক্তিকে 'এটি একখণ্ড রূপা' এরূপ মনে করে রূপার টুকরো সংগ্রহ করার জন্য প্রয়াসী হতে দেখা যায়। রজতার্থীর রজতলাভের এ ধরনের প্রচেষ্টা কেবল ইদমের প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি এই ভিন্ন জাতীয় দুটি জ্ঞানের এবং ওই জ্ঞানের বিষয় ইদম্ বস্তু ও রজতের পরস্পর ভেদজ্ঞানের অভাবের কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে, এ ধরনের বক্তব্যের সমর্থনে কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। যিনি বুদ্ধিমান প্রজ্ঞাঘন ব্যক্তি তিনি সংশ্লিষ্ট সবকিছু জেনে শুনেই কর্মে প্রবৃত্ত হন। না জেনে না শুনে, পূর্বাপর অবস্থাদি বিবেচনা না করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোনো কর্মে প্রবৃত্ত হন না। সুষুপ্তি অবস্থায় কোনো মানুষের জ্ঞান থাকে না। এ কারণে সুষুপ্তি অবস্থায় কোনো মানুষকে আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হতে দেখি না। জাগরণে এবং স্বপ্নাবস্থায় মানুষের জ্ঞান থাকে। এ অবস্থায় মানুষের চেষ্টা, প্রবৃত্তি সবই সক্রিয় থাকে। এ থেকে জ্ঞান যে সর্বৈব প্রবৃত্তির কারণ, ইদম্ এবং রজতের ভেদজ্ঞানের অভাব যে কোনো মতেই রজতার্থীর রজতগ্রহণে প্রবৃত্তির কারণ হতে পারে না, একথাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। কাজেই অখ্যাতিবাদের আলোচ্য বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য এবং বাস্তবানুগ হতে পারে না।

অখ্যাতিবাদের বিরুদ্ধে অন্যথা খ্যাতিবাদের আরও একটা প্রধান আপত্তি হলো, ভেদজ্ঞানের অভাবের কারণে সত্য এবং মিথ্যাজ্ঞানের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করে তার মূলে অখ্যাতিবাদী রজতার্থীর ব্যবহার, প্রবৃত্তি প্রভৃতির সার্থকতা প্রমাণের যে প্রয়াস চালিয়েছেন সেখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই সাদৃশ্যটি কি এক্ষেত্রে রজতার্থীর জ্ঞানগোচর হয়ে তার চেষ্টা, প্রযত্নকে উৎপাদন করবে, না-কি অজ্ঞাত থেকেই রজতার্থীর ব্যবহার, প্রচেষ্টার কারণ হবে? দ্বিতীয়ত. অখ্যাতিবাদী এখানে যে সাদৃশ্যের কথা বললেন সেই সাদৃশ্যের স্বরূপটি এখানে কেমন এবং কীভাবে হবে? কার সঙ্গে কার সাদৃশ্য, কীরূপ সাদৃশ্য বুঝাবে? তা অখ্যাতিবাদীর আরও স্পষ্টভাবে বলা আবশ্যক। ভ্রমপ্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ইদম্ এবং রজতম্, এ দুটি জ্ঞানের সঙ্গে 'ইদম্ রজতম্' এই প্রমা বা সত্যজ্ঞানের যে সাদৃশ্য আছে সেটি কী? ভ্রম প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ইদম্ এবং রজত, এ দুটি জ্ঞান মিলে যদি 'ইদম্ রজতম্' এই সত্যজ্ঞানের সদৃশ হয় তাহলে এই সাদৃশ্যবোধ কোনোভাবেই সত্যজ্ঞানের যা কর্ম, যা ব্যবহার ও প্রবৃত্তি তা উৎপাদন করতে পারে না। তাই এখানেও অখ্যাতিবাদীর বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না।

এরপর অখ্যাতিবাদীর মতে, ভ্রমপ্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ইদম্ এবং রজতম্, এ দুটি জ্ঞানের মধ্যে যে ভেদবুদ্ধি আছে সেই ভেদজ্ঞানের অভাবের কারণে সত্য 'ইদম্ রজতম্' জ্ঞানের সঙ্গে মিথ্যা 'ইদম্ রজতম্' জ্ঞানের মধ্যে যে সাদৃশ্যের উদ্ভব হয়, সেই সাদৃশ্য ওই সাদৃশ্যের জনক ভেদবুদ্ধির অভাববুদ্ধির সঙ্গে একত্রে কিছুতেই থাকতে পারে না। কারণ, অখ্যাতিবাদীদের মতে, ভ্রমের স্থলে উৎপন্ন ইদম্ এবং রজতম্– এ দুটি জ্ঞান একত্রে 'ইদম্ রজতম্' এই সত্য জ্ঞানেরই তুল্য। তখন কিন্তু অখ্যাতিবাদীরা ভ্রমপ্রক্রিয়ায় দুটি জ্ঞানকে 'দুটি জ্ঞান' হিসেবেই নির্দেশ করেন। অখ্যাতিবাদীদের এ ধরনের স্বীকারোক্তি থেকে জ্ঞান দুটি যে পরস্পর ভিন্ন একথাই বুঝা যায়। এমতাবস্থায় ভেদজ্ঞানের অভাব আর থাকে না। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে, সাদৃশ্যটি জ্ঞাত হয়েই এটি রজতার্থীর ব্যবহার এবং প্রবৃত্তির কারণ হয় বললে, ভেদজ্ঞানের অভাব ব্যাখ্যা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে ভেদজ্ঞানের অভাব না থাকলে প্রস্তাবিত সাদৃশ্য আদৌ জন্মাতে পারে না। এমতাবস্থায় ভেদজ্ঞানের অভাবমূলে যে সাদৃশ্যের উদ্ভব সেই সাদৃশ্য জ্ঞানগোচর হয়েই তা ব্যবহার ও প্রবৃত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, অখ্যাতিবাদীদের এ ধরনের দাবি অসঙ্গত বলেই মনে হয়।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ভ্রম প্রক্রিয়ায় 'ইদম্ জ্ঞান' এবং রজতজ্ঞানের মধ্যে যে ভেদবুদ্ধির অভাব আছে তা সত্য রজতজ্ঞানের ভেদবুদ্ধির অভাবেরই তুল্য, এভাবে সত্য ও মিথ্যাজ্ঞানের মধ্যে যে সাদৃশ্যবোধ উদিত হয় তা-ই রজতার্থীর ব্যবহার এবং প্রবৃত্তির কারণ হয়ে থাকে। এমন দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যার সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা করতে গেলে তারও কোনো বিশেষ মূল্য দেয়া যায় না।[৪২] কারণ, এক্ষেত্রেও ইদম জ্ঞান এবং রজতজ্ঞান, এ দুটি জ্ঞানের মধ্যে ভেদজ্ঞানের অভাবের কারণে সাদৃশ্য স্বীকার করায় আগের মতোই স্বীয় উক্তির বিরোধ এসে উপস্থিত হয়। দুটি জ্ঞান, এই বোধ থাকলে ভেদজ্ঞানকে আর অস্বীকার

করা চলে না। তাহলে ভেদজ্ঞানের অভাবের কারণে সাদৃশ্যেরও আর উদ্ভব হতে পারে না। ভেদবুদ্ধির অভাবের মূলে উৎপন্ন সাদৃশ্যটি পরিজ্ঞাত হয়েও তা যেমন ব্যবহার, প্রবৃত্তি, প্রযত্ন প্রভৃতি উৎপাদন করতে পারে না, তেমনি সাদৃশ্যটি অজ্ঞাত থেকেও চেষ্টা, প্রযত্ন, প্রবৃত্তি উৎপাদন করতে পারে না। জ্ঞাত সাদৃশ্য যেমন দুই ধরনের হতে দেখা গিয়েছে অজ্ঞাত সাদৃশ্যও তেমনি দুই প্রকার হতে দেখা যায়। এর কোনোটিই যে রজতার্থীর ব্যবহার, চেষ্টা প্রভৃতি উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তা-ও এ প্রসঙ্গো স্মরণ রাখা আবশ্যক।

ভ্রম প্রক্রিয়ার 'ইদম্' এবং 'রজতম্' এই জ্ঞান দুটির সঙ্গো 'ইদম্ রজতম্' এই সত্যজ্ঞানের যে সাদৃশ্য আছে সেই সাদৃশ্য অজ্ঞাত থেকেই যদি ব্যবহার ও প্রবৃত্তির কারণ হয় বলে অখ্যাতিবাদী মনে করেন, তাহলে সেই অজ্ঞাত সাদৃশ্য 'ইদম্ রজতম্' এই সত্য ও মিথ্যা জ্ঞান দুটির মধ্যে যেমন আছে, তেমনি 'ইদম্ রজতম্' এই মিথ্যাজ্ঞান এবং সত্য ঘটজ্ঞানের মধ্যেও তা আছে। এহেন অবস্থায় অজ্ঞাত সাদৃশ্য রজতের প্রযত্ন, ব্যবহার, প্রবৃত্তি প্রভৃতির উৎপাদনে সমর্থ হলে ঘটের আনয়ন প্রভৃতি ব্যবহার, প্রযত্ন, প্রবৃত্তি প্রভৃতির উৎপাদনেও তা সমর্থ হবে। এর কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা অখ্যাতিবাদীর কাছে পাওয়া যায় না। তাই অজ্ঞাত সাদৃশ্যকে ব্যবহার এবং প্রবৃত্তির কারণ বলা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। সত্য ও মিথ্যাজ্ঞানের মধ্যে ভেদজ্ঞানের অভাবের কারণে যে সাদৃশ্য আছে সেই সাদৃশ্য অজ্ঞাত থেকে অন্য কোনো জ্ঞান উৎপাদন না করেই ব্যবহার এবং প্রবৃত্তির কারণ হয়ে থাকে, অখ্যাতিবাদীর এমন দাবি যুক্তিবহ নয়। কারণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি পূর্বাপর অবস্থা বিবেচনা না করে কখনও কোনো কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারেন না। রজত যদি কোনো ব্যক্তির জ্ঞানের বিষয়ই না-হয় তাহলে সেই অজ্ঞাত রজত সম্পর্কে তার কোনো চেষ্টার উদয় হয় না। কাজেই বলতেই হয় যে, ভেদবুদ্ধির অভাবমূলে যে অজ্ঞাত সাদৃশ্যের উদয় হয় তা অন্য কোনো জ্ঞান উৎপাদন করেই রজতার্থীর ব্যবহার এবং প্রবৃত্তির কারণ হয়ে থাকে। এই জ্ঞানই হলো, অনুপস্থিত রজতকে সামনে অবস্থিত হিসেবে দেখা, অন্যথা খ্যাতিবাদীরা যাকে ভ্রম বলে নির্দেশ করেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ভ্রমের ব্যাখ্যায় অখ্যাতিবাদীকে অজ্ঞাতসারে অন্যথা খ্যাতিবাদেরই শরণাপন্ন হতে হচ্ছে।

নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে অখ্যাতিবাদী যদি দাবি করেন যে, উল্লিখিত অজ্ঞাত ভেদাগ্রহ কোনো পৃথক জ্ঞান উৎপাদন করে ভ্রান্তধীব্যক্তিকে তাঁর ব্যবহারে প্রবৃত্ত করে না, সামনে অবস্থিত দ্রব্যের রূপার তুল্য চাকচিক্যের কারণে রজতের সংস্কারে উদ্বুদ্ধ হয়ে রজতের যে স্মৃতি জন্মে, সেই রজতস্মৃতিই হলো রজতার্থীর প্রবৃত্তির মূল। অখ্যাতিবাদীদের এ ধরনের বক্তব্যেরও কোনো মূল্য নেই। রজতের স্মরণজ্ঞানের কারণেই কেবল রজতার্থী প্রলুব্ধ হয় না। রজতার্থী ব্যক্তি সামনে অবস্থিত 'ইদম্' বস্তুকে রজত মনে করে তার প্রতি প্রলুব্ধ হন। সামনে কিছু না দেখে কেবল রজতকে মনে মনে স্মরণ করে কোনো স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিই সামনের দিকে ধাবিত হন না। এমতাবস্থায় কেবল রজতের স্মৃতিকে রজতার্থীর প্রবৃত্তি বা প্রলুব্ধের জনক বলে কেউই স্বীকার করতে পারেন না। রজতার্থী ব্যক্তির প্রবৃত্তির মূলে কাজ

করে রজতের প্রতি তাঁর উদগ্র বাসনা। বাসনা না থাকলে প্রবৃত্তি জন্মে না। আর বাসনার মূলে আছে জ্ঞান। কাজেই এটা স্বীকার করতে হবে যে, সামনে অবস্থিত বস্তুকে রজত বলে না বুঝলে কেবল রজতকে মনে মনে স্মরণ করে রজতার্থী এটি গ্রহণ করতে কখনও অভিলাষী হন না। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, আলোচ্য অজ্ঞাত ভেদাগ্রহ ভ্রমরূপ একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্ট জ্ঞান উৎপাদন না করে কোনোভাবেই রজত গ্রহণের জন্য রজতার্থীর যে প্রযত্ন দেখা যায় তার হেতু হতে পারে না। তাই অখ্যাতিবাদী রজত গ্রহণের প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বলেন তা স্পষ্ট নয়। আর এসব কারণে ভ্রমের স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রভাকর মীমাংসকদের অখ্যাতিবাদ ত্রুটিমুক্ত নয়। এ পর্যায়ে জ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্করের অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ নিয়ে আলোচনা করা যায়।

অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ

অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদের সমর্থক অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা মনে করেন, ভ্রমপ্রক্রিয়ায় ঝিনুক খণ্ডের 'ইদম্' রূপে সামান্যত জ্ঞানোদয় হলে চাকচিক্য প্রভৃতি সাদৃশ্যের কারণে ঝিনুক খণ্ড যে চৈতন্যে অধিষ্ঠিত সেই চৈতন্যে আশ্রিত অধিকার তমোভাব থেকে অনির্বচনীয় রজত উৎপন্ন হয়ে তা প্রত্যক্ষগোচর হয়। এই রজত 'ইদম্' রূপে প্রত্যক্ষের গোচর হয় বলে একে আকাশকুসুমের ন্যায় একেবারে অলীকও বলা যায় না। আবার রজতের কল্পিত আধার শুক্তিকার জ্ঞানোদয়ে বাধিত হয় বলে একে সত্যও বলা যায় না। একে আবার সৎ এবং অসৎ পরস্পর বিরুদ্ধ বলে সদসৎও বলা যায় না। আবার সদসদভিন্ন বলেও মনে করা যায় না। এভাবে কোনোভাবেই রজতের স্বরূপ নির্বাচন করা যায় না বলেই একে 'অনির্বচনীয়' বলা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তে এই অনির্বচনীয় বস্তুকে প্রাতিভাসিক বা অবভাস[৪৩] বলে অভিহিত করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত রজত ভ্রান্তধী ব্যক্তির দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় ততক্ষণ পর্যন্তই কেবল অনির্বচনীয় রজতের সত্যতা স্বীকৃত হয়। ভ্রম নিরাস হয়ে গেলে এর আর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। যে পর্যন্ত প্রতিভাস বা প্রকাশ থাকে, সেই পর্যন্তই কেবল বর্তমান থাকে। আর এ কারণেই এ ধরনের বস্তুকে প্রাতিভাসিক সৎ বলা হয়ে থাকে।[৪৪] ইদমে রজতে এ ধরনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী চৈতন্যে অধিষ্ঠিত অবিদ্যার সত্ত্বগুণের পরিণাম। অনির্বচনীয় অভিনব রজতের উপাদান হলো শুক্তি চৈতন্যে আশ্রিত অবিদ্যা। অভিনব রজতের উৎপত্তি হয় তখন, যখন গুণময়ী অবিদ্যার শরীরে বিক্ষোভ বা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। যে কারণে অবিদ্যার সেই বিক্ষোভ, সাক্ষী চৈতন্যাশ্রিত অবিদ্যার ক্ষোভেরও একই কারণ। এ জন্যই একই সময়ে রজত এবং রজতের প্রত্যক্ষানুভূতি উৎপন্ন হয় এবং অধিষ্ঠান শুক্তিকার জ্ঞানোদয়ে একই সময়ে আবার তিরোহিত হয়।

এই বিভ্রম অবিদ্যার পরিণাম এবং চৈতন্যের বিবর্ত। যেহেতু অবিদ্যাপ্রসূত রজত এবং তার ভ্রান্তি সকলই অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তে অনির্বচনীয়, সে কারণে ভ্রমের উপাদান কারণ

অবিদ্যাও অনির্বচনীয়। এখানে লক্ষণীয় যে, শুক্তি রজত এবং স্বাপ্নিক রজত উভয়ই অদ্বৈত বেদান্তের মতে, অনির্বচনীয় এবং সে কারণে মিথ্যা। তবে উভয়ই মিথ্যা হলেও রজতের ভ্রমপ্রক্রিয়ায় 'ইদম্' রূপে এটি প্রতীতির বিষয় হয়ে থাকে বলে সেখানে বাইরের অবিদ্যাংশ হয়ে থাকে রজতের উপাদান কারণ। আর সাক্ষী চৈতন্যাশ্রিত আন্তর অবিদ্যাংশ পরিণতি লাভ করে রজতের জ্ঞানরূপ বুদ্ধির উপাদান কারণ হিসেবে। স্বাপ্নিকভাবে সাক্ষি চৈতন্যে আশ্রিত অবিদ্যার তমোগুণাংশ স্বপ্নদৃশ্য বিষয়রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় এবং সেই অবিদ্যারই সত্ত্বগুণাংশ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞানবৃত্তি হিসেবে পরিণতি লাভ করে। স্বাপ্নিক ভ্রমে আন্তর অবিদ্যাই স্বপ্নদৃশ্য বিষয় এবং স্বপ্নজ্ঞান, এই উভয়েরই উপাদান কারণরূপে গণ্য হয়। শুক্তি রজত ও স্বাপ্নিক রজত যেমন মিথ্যা এবং অনির্বচনীয, তেমনি সেই পরিদৃশ্যমান নিখিল বিশ্বভুবনকেই অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তে অনির্বচনীয় এবং মিথ্যা বলে আখ্যাত করা হয়েছে। শুক্তিরজত এবং স্বাপ্নিক রজতের উপাদান কারণ যেমন অনির্বচনীয় অবিদ্যা, তেমনি এই দৃশ্যমান বিশ্বভুবনেরও উপাদান কারণ অনির্বচনীয় অবিদ্যা। পার্থক্য কেবল এটুকু যে, শুক্তিরজতের উপাদান কারণকে বলে তুলা অবিদ্যা বা জীবচৈতন্যের উপাধিখণ্ড অবিদ্যা, আর বিশ্বভুবনের কারণ মূলা অবিদ্যা বা ঈশ্বরচৈতন্যের উপাধি অখণ্ড অবিদ্যা। শুক্তিরজতের স্রষ্টা জীব, আর, মায়াময় বিশ্বভুবনের স্রষ্টা পরমেশ্বর। ভ্রমজ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যায় এটাই অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদের সারকথা।

ভ্রমের স্বরূপ ব্যাখ্যায় অদ্বৈত বৈদান্তিকদের অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ নিয়ে আরও কিছু বলা যায়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রকাশ কখনও সত্যতার লক্ষণ হতে পারে না। কোনো কিছু প্রকাশিত হলেই যে তা সত্য হয়ে যাবে এমন দাবি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারেন না। যা আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় তা অসৎও হতে পারে। আমাদের চারপাশে পরিদৃশ্যমান যে বিশ্বপ্রপঞ্চ, দেহাদি ইন্দ্রিয় সবই আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে থাকে বলেই যে এগুলোকে সত্য বলে বিবেচনা করতে হবে, অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা এমন অযৌক্তিক দাবি করেন না। 'ইদম্ রজতম্' এভাবে ভ্রম প্রক্রিয়ায় ঝিনুকের খণ্ড রজতরূপে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। রূপার টুকরো লাভের প্রত্যাশায় রজতার্থী ঝিনুকখণ্ডের অভিমুখে ধাবিত হন। কিন্তু তাই বলে ঝিনুক তো আর মন্ত্রবলে রূপা হয়ে যেতে পারে না। এটি যে ঝিনুক সেই ঝিনুকই থাকে। যে বস্তু যেভাবে প্রকাশিত হয়, এবং সেই প্রকাশিত রূপেই যদি সেই বস্তু সত্য হয় তাহলে মরুভূমিতে মরীচিকায় জলের যে প্রকাশ হয় তাকে সত্য বলতে হয় এবং সঙ্গো সঙ্গো সেই জল পান করে পীপাসার্ত ব্যক্তির জলতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তা তো ঠিক না। কাজেই একথা স্বীকার করতে হবে যে, আরোপিত বা অধ্যস্ত বস্তু প্রকাশিত হলেও প্রকৃতকল্পে তাকে সত্য বলে স্বীকার করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। সৌরকিরণ রূপে জল কখনও সত্যবস্তুর দাবি করতে পারে না। তবে মরীচিকার জল সত্যবস্তু না হলেও আমরা যখন তাকে উপলব্ধি করতে পারি তখন অসত্য বস্তু যে উপলব্ধির বিষয় হয় তা অস্বীকার করা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

প্রভাকর মীমাংসা মতের অখ্যাতিবাদকে অনুসরণ করে যদি বলা যায় যে, জগতে অসৎ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়, অভাব বলে কোনো পদার্থ নেই, সব বস্তুই ভাবস্বরূপ এবং সত্য বা সৎপদার্থ; কেবল কখনও কখনও কোনো একটি ভাববস্তুকে অন্য একটি ভাববস্তুর সঙ্গো মিশিয়ে, অর্থাৎ তাকে সেই অন্য ভাববস্তুর স্বরূপে রূপায়িত করে যখন আমরা তার ব্যবহার করতে যাই তখনই তাকে আমরা অভাব বলে আখ্যাত করি। অভাব বলে কথিত হলেও ওই অভাব স্বরূপত ভাবই থাকে। যার যা সত্যস্বরূপ তার কখনই বিচ্যুতি ঘটে না। ঘটবস্তু ঘটরূপেই সত্য, পটের অভাব রূপে ঘট সত্য হতে পারে না। আবার পটবস্তু পটরূপেই সত্য, ঘটের অভাবরূপে পট সত্য হতে পারে না। যখনই আমরা বলি যে 'ঘটঃ পটো ন ভবতি' তখনই পটের অভাব ঘটের বিশেষণরূপে প্রতিভাত হয়ে, পটের অভাবরূপে ঘট যে সত্য নয় তা-ই স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। অভাব বলে মীমাংসা মতে স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ নেই। একটি ভাববস্তুই অন্য একটি বস্তুর অভাব বলে অভিহিত হয়। বিশ্বভুবনের সকল বস্তুকেই আমরা দু' ভাগে ভাগ করে থাকি। কখনও বস্তুকে আমরা ভাবরূপে, আবার কখনও অভাবরূপে দেখে থাকি। যা সে বস্তুর নিজস্ব রূপ, সেই নিজরূপে কোনো বস্তুকে দেখি তখনই তাকে অভাব বলে নির্দেশ করি। যখন আমরা বলি, 'ঘটাভাববদ্ ভূতলম্' তখন শুদ্ধ ভূতজ্ঞানের রূপ আমাদের মানসপটে ভাসে না। ঘট প্রভৃতি বস্তুর অভাব ভূতলের বিশেষণরূপে আমাদের মানসনেত্রে ভাসে। প্রকৃতকল্পে, তাই ঘটাভাব বলে কোনো পদার্থ নেই। অভাব বলে ভূতলের কোনো বিশেষ ধর্মও আমাদের প্রতীতিগোচর হয় না। কেবল বিরোধী ঘটাভাবরূপে ভূতলের ভাবনাই ঘটাভাবের ভাবনা। তাই ভাবই হলো একমাত্র তত্ত্ব।[৪৫]

এ যুক্তিতেই প্রভাকর মীমাংসকেরা সকল পদার্থকেই ভাব পদার্থ এবং সকল জ্ঞানকেই যথার্থ বা সত্যজ্ঞান বলে নির্দেশ করে তাঁদের অখ্যাতিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এ জন্যই পদার্থমাত্রকে যাঁরা অসৎ বলে প্রমাণ করতে চান সেই শূন্যবাদী বৌদ্ধ সিদ্ধান্তকে নির্মমভাবে তাঁরা খণ্ডন করেছেন। শূন্যবাদী বৌদ্ধ নৈয়ায়িকেরা ক্ষণিকবিজ্ঞান ছাড়া বাহ্যবস্তু বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করলে বাহ্যবস্তু মাত্রই অসৎ বা শূন্য। তাঁরা অসত্য বাহ্যবস্তুর কোনো কার্যকারিতা আছে বলেও স্বীকার করেন না। এঁদের মতে, জ্ঞান ছাড়া জ্ঞেয়বস্তু বলে যেমন কিছু নেই, আমি বা জ্ঞাতা বলেও পৃথক তত্ত্ব বা সত্তা নেই। ক্ষণিকবিজ্ঞানই এদের সিদ্ধান্তে একমাত্র তত্ত্ব। প্রতিনিয়ত অবিরাম গতিতে জ্ঞানের উৎপত্তি ও লয় হচ্ছে। আর এভাবেই প্রবাহিত হয়ে চলেছে জ্ঞানের অবিরাম ধারা। এই জ্ঞানপ্রবাহের অন্তর্গত প্রতিটি জ্ঞানই নিজ নিজ পূর্ববর্তী জ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং পূর্বজ্ঞানের স্বভাবের অনুরূপ স্বভাবই লাভ করে। এই পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিষয় আবার পরবর্তী বা উত্তরকালীন জ্ঞানে সংক্রমিত হয়ে চলেছে। আর এভাবেই জ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। প্রচলিত মতে বা ঐতিহ্য অনুযায়ী যাকে 'জ্ঞাতা আমি বিজ্ঞান' বা আলয়বিজ্ঞান এবং জ্ঞেয় বিষয়বিজ্ঞান বলা হয় তার সবই মিথ্যা, সবই অবিদ্যাপ্রসূত, সবই অনাদি বাসনা কল্পিত মাত্র।

ভাবনার দৃঢ়তার কারণে বাসনা সমূলে অপসৃত হলে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতি বুদ্ধি আর অবশিষ্ট থাকে না। এদের তিরোধানে যে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় তা-ই বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রে মহোদয়, মুক্তি বা পরিনির্বাণ বলে বর্ণিত হয়েছে।[৪৬]

এখানে প্রশ্ন ওঠা খুবই প্রাসঙ্গিক যে, জ্ঞেয়বস্তু বলেই যদি আদৌ কিছু না-থাকে, তাহলে জ্ঞান সেই অসৎ অজ্ঞেয়বস্তুকে প্রকাশ করবে কীভাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে শূন্যবাদী বৌদ্ধ নৈয়ায়িকেরা বলেন, জ্ঞানের স্বভাবই এমন যে সে অসৎ বা অসত্য জ্ঞেয়বস্তুকেও প্রকাশ করতে পারে। অসত্য বা মিথ্যা বিষয়কে প্রকাশ করার যে শক্তি জ্ঞানে বিদ্যমান থাকে, তাকে তাঁরা অবিদ্যা নামে আখ্যাত করেন।[৪৭] অসৎখ্যাতিবাদী মাধ্যমিক শূন্যবাদী বৌদ্ধের অসৎখ্যাতিবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে মীমাংসক পণ্ডিত প্রভাকর মিশ্র বলেন যে, পরিদৃশ্যমান বিশ্বভুবনকে অসৎ বা অসত্য প্রমাণ করতে গিয়ে শূন্যবাদী বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বিজ্ঞান বা চেতনার অসৎ বস্তুকে প্রকাশ করার যে শক্তি স্বীকার করে নিলেন, বৌদ্ধোক্ত ক্ষণিকবিজ্ঞানের সেই শক্তি তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নিলেও এর দ্বারা অসদ্‌বস্তুর প্রকাশ কতদূর সম্ভব তা ভেবে দেখা আবশ্যক। ওই শক্তির কি কর্মসাধনের সামর্থ্য আদৌ আছে? এ প্রসঙ্গে তার মূল্যায়ন করাও প্রয়োজন। যদি বলা হয় ওই শক্তির যা কার্য তা-ই অসৎ তাহলে এ ধরনের অসৎ কি কার্যত্ব উপপাদন করার ক্ষমতা রাখে? কারণ যাকে অসৎ বলে সাব্যস্ত করা হবে তা চিরকালই অসৎ থাকবে। সেই অসৎ যেমন কার্য করতে পারে না, তেমনি তার জন্মলাভও অসম্ভব। অসৎ কার্য করতে পারে এ ধরনের বক্তব্য স্ববিরোধী, বৌদ্ধোক্ত ওই অসৎ বস্তুকে জ্ঞেয়বস্তুও বলা যায় না। কারণ তাঁদের মতে, জ্ঞান ছাড়া জ্ঞেয়বস্তু বলে কোনোকিছু নেই। তাই অসতের খ্যাতিও স্বীকার করা যায় না। কিন্তু অসৎখ্যাতিবাদী বৌদ্ধ তো অসতেরই খ্যাতি স্বীকার করে স্ববিরোধিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ফেলেছেন।

এতক্ষণ ভ্রমের স্বরূপ ব্যাখ্যায় শূন্যবাদী বৌদ্ধের যে মত পর্যালোচনা করা হয়েছে, অদ্বৈত বেদান্তের মতে, সেই বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত মানতে গেলে সৎস্বরূপ জ্ঞানের সঙ্গে অসৎ বিষয়ের কী সম্বন্ধ হতে পারে তাও এ প্রসঙ্গে মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে। শূন্যবাদী যদি দাবি করেন যে, প্রকৃতকল্পে বিষয় অসৎ হলেও ওই অসৎ বিষয়ই জ্ঞানকে রূপদান করে থাকে তাহলে প্রশ্ন উঠবে বিষয়বিহীন জ্ঞান কি কখনও কারও নেত্রগোচর হতে পারে? তথাকথিত অসৎ বিষয় স্বীকার না করলে সাকার বিজ্ঞানের স্বরূপও নির্ণয় করা যায় না। আর এখানেই নিহিত রয়েছে সত্যজ্ঞান এবং অসত্য বিষয়ের সম্বন্ধ। এভাবে উত্তরের প্রত্যুত্তরে অখ্যাতিবাদের সমর্থক প্রভাকর মীমাংসকেরা বলেন যে, অসৎ কারণমূলে কখনও কোনো অবস্থায় কোনো ধরনের জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। এহেন অবস্থায় যদি দাবি করা হয় যে, অসতের সাহায্য ছাড়া জ্ঞান আত্মপ্রকাশ লাভ করতে পারে না, তাহলে সেই দাবির কোনো যৌক্তিকতা আমরা খুঁজে পাই না। যে বস্তু স্বরূপগত অসৎ সে অন্যকে সাহায্য করতে পারে, সেটাও এক ধরনের হাস্যকর বক্তব্য বৈকি। সেই শক্তি থাকলে তা সেই শক্তির কল্যাণে অসৎ-ই সৎ হয়ে যেত, তা

আর অসৎ থাকত না। এমতাবস্থায় যদি দাবি করা হয় যে, যে জ্ঞান অসতের প্রকাশক সেই জ্ঞানই অসৎ পদার্থে সেই শক্তির আধান করে থাকে তাহলে প্রতিবাদীরা এ দাবির বিপক্ষে বলবেন যে, শক্তির আধার বলেই তখন অসৎ আর অসৎ থাকে না, সতে পরিণতি লাভ করতে বাধ্য। দৃশ্যমান বিশ্বভুবন, দেহ, ইন্দ্রিয়াদি একেবারে অসৎ হলে, এদের কোনো রূপ সত্যতা না থাকলে এদের সত্য বলে মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারত না। কাজেই জ্ঞানের বিষয় হিসেবে স্বীকৃত সকল বাহ্যবস্তুর সত্যতা অনস্বীকার্য। এ পর্যায়ে ভ্রমের স্বরূপ ব্যাখ্যায় রামানুজ সম্প্রদায়ের সৎখ্যাতিবাদকে অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা কীভাবে পর্যদুস্ত করেন তার একটু মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদের সমর্থক অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা রামানুজ সম্প্রদায়ের সৎখ্যাতিবাদের নিরাস করতে গিয়ে বলেন যে, ভ্রমপ্রক্রিয়ায় রামানুজ সম্প্রদায় সত্যবস্তুর খ্যাতি স্বীকার করে সমস্ত জ্ঞানকে যেভাবে সৎ বা যথার্থ বলে ব্যাখ্যা করতে চান তার মূলে কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। মরুভূমির সৌর কিরণমালায় আমরা যে জলের জ্ঞান পাই তাকে কীভাবে যথার্থ ও অবাধিত বলে গ্রহণ করা যায় তা বোধগম্য নয়। যা প্রকৃতকল্পে জল নয়, যা বস্তুতই সৌর কিরণমালা তাকে যদি 'জল নয়' বলে বুঝা যায় তাহলেই ওই বুদ্ধি সৎ বা যথার্থ বলা চলে। যে সৌরকিরণ মালা আদৌ জল নয়, তাকে জল বলে মনে করা হলে কোনো বুদ্ধিমান দার্শনিকই ওই জ্ঞানকে সত্য বা যথার্থ বলে স্বীকার করতে পারেন না। যে পদার্থ প্রকৃতকল্পে জল নয়, তা কোন মন্ত্রবলে জল হবে? আসলে মরুমরীচিকার জল একটা কল্পিত বিষয়মাত্র। এর কোনো ব্যবহারিক সত্যতা নেই। তবে মরুমরীচিকার জল ইদম্ রূপে সামনে এসে প্রতীতিগোচর হয় বলে ওই জলকে আবার আকাশকুসুমের মতো অসৎ বা অলীক বলেও আখ্যাত করা চলে না। মরুমরীরিচকার জল অধ্যস্ত বা আরোপিত হলেও সত্য জলের মতো সামনে এসে প্রতীতিগোচর হয়। এটি যেমন সত্য জলও নয়, তেমনি আবার পূর্বদৃষ্ট কোনো বস্তুও নয়। এ জন্য অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা এই মরুমরীচিকার জলকে সৎও নয়, অসৎও নয়, সদসৎও নয়, আবার সদসৎ ভিন্নও নয় বলে মনে করেন। আর যা সৎও নয়, অসৎও নয়, সদসৎও নয় এবং সদসৎ ভিন্ন অন্য কিছুও নয়, অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা তাকেই অনির্বচনীয় বা অনৃত বলে সিদ্ধান্ত করেন। এই দৃষ্টিতে পরিদৃশ্যমান বিশ্বভুবন বিশ্বপ্রপঞ্চ, দেহ, ইন্দ্রিয়াদি যা সচ্চিদান্দ পরব্রহ্মে অধ্যস্ত বা আরোপিত বলে কথিত হয়ে থাকে তা সবই অনাদি মিথ্যা অজ্ঞান-সংস্কার-প্রবাহেরই পরিণতি। কাজেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যে স্বরূপত অনৃত, অনির্বচনীয় এবং অধ্যস্ত তা অনস্বীকার্য। প্রমা বা যথার্থজ্ঞানের অরুণালোকেই জ্ঞানান্ধকার নিবৃত্ত হতে পারে।

মূল্যায়ন ও মন্তব্য

ভ্রমের স্বরূপ ব্যাখ্যায় অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা যে অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ উপন্যস্ত করেছেন স্বামী রামানুজ প্রমুখ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এ মতবাদকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। যা সৎও নয়,

অসৎও নয়, আবার সদসৎও নয়, সদসৎ ভিন্নও নয়– অদ্বৈত বৈদান্তিকদের এ ধরনের বক্তব্যকে রামানুজ উপেক্ষণীয় বলে মনে করেন। কারণ প্রতীতি অনুসারে বস্তুর স্বরূপ নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রতিটি বস্তুই হয় সৎ হবে, না হয় অসৎ হবে। সৎ ও অসতের মাঝখানে কোনো বস্তুর স্বভাব নিরূপিত হতে পারে না। সদসৎ বিলক্ষণ কোনো বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এ ধরনের বক্তব্য স্ববিরোধী। কোনো বস্তুকেই একই সময় সৎ এবং অসৎ উভয়ই বলা আর আকাশকুসুম কল্পনা করা একই কথা। কাজেই অদ্বৈত বৈদান্তিকদের বক্তব্য কথার মারপ্যাচ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আচার্য রামানুজের মতে, এ পর্যন্ত যত খ্যাতিবাদ প্রপঞ্চিত হয়েছে তার সবই অযৌক্তিক। ন্যায়শাস্ত্রের স্বাভাবিক বিধিবিধানের পরিপন্থি এসব খ্যাতিবাদ। রামানুজ সৎখ্যাতিবাদী বলে সকল জ্ঞানকেই সৎ বা যথার্থ বলে মনে করেন। অন্যদিকে প্রভাকর মীমাংসক দার্শনিকেরাও অখ্যাতিবাদী হিসেবে কোনো ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করেন না। তাঁরাও মনে করেন, সকল জ্ঞানই যথার্থজ্ঞান। প্রভাকর মীমাংসকদের সঙ্গে রামানুজের এ বিষয়ে মতৈক্য থাকলেও তিনি অখ্যাতিবাদ সমর্থন করেন না। প্রভাকর যেমন 'ইদম্ রজতম্' প্রভৃতি ভ্রম প্রক্রিয়ায় দুটি জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলে মনে করেন, রামানুজের সিদ্ধান্ত কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভিন্ন। রামানুজের মতে, এ ধরনের ক্ষেত্রে আসলে একটি জ্ঞানই উৎপন্ন হয় এবং তা বিশিষ্ট জ্ঞান। আবার ন্যায়-বৈশেষিকের মতের সঙ্গেও রামানুজের মতের পার্থক্য লক্ষণীয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, যা রজতত্ব যুক্ত তাকেই আমরা রজত রূপে দেখে থাকি। কাজেই এটি মিথ্যা হতে পারে না। প্রশ্ন হতে পারে, শুক্তিতে যখন রজতজ্ঞান হয় এমন রজতকেই যে আমরা রজতরূপে দেখি– একথা কীভাবে বলা যায়? এর উত্তরে শ্রীভাষ্যকার রামানুজ বলেন, শুক্তিতেও রজতের অংশ আছে বলে, অর্থাৎ রজতের অবয়ব বিদ্যমান আছে বলে আমরা শুক্তির অন্তর্গত রজতের অবয়বগুলোকে 'ইদম্ রজতম্' এভাবে জেনে থাকি।

প্রকৃতকল্পে ভ্রমের স্বরূপ ব্যাখ্যায় এ পর্যন্ত যে মতবাদগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর স্বরূপ ও নিহিতার্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একদিক থেকে প্রায় সবগুলো মতবাদই অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ থেকে ভিন্ন। আর এ কারণেই শঙ্করাচার্য ছাড়া আর কারও মতেই আরোপের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। কিন্তু বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর আরোপ বা অধ্যস্তের মিথ্যাত্বকেই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করেছেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর তাঁর পূর্ববর্তী প্রচলিত খ্যাতিবাদগুলো স্বীকার করে নিলেন? অবশ্যই না। প্রথমত বৌদ্ধদের আত্মখ্যাতি খণ্ডন করলেন প্রভাকর মিশ্র। প্রভাকর মিশ্রের অখ্যাতি নিরাস হলো ন্যায়-বৈশেষিকদের অন্যথাখ্যাতিবাদের যুক্তিতে। এরপর ন্যায়-বৈশেষিকের অন্যথাখ্যাতিবাদ খণ্ডিত হলো কি? এমন আশঙ্কা অনেকেই করে থাকেন। কিন্তু এ আশঙ্কারও কোনো কারণ নেই। কেননা ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র তাঁর *মরুমরীচিকা* গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, মরীচিকাতে দেখা জল স্পষ্টত অনৃত এবং সে কারণেই তা

অনির্বচনীয়। এ জন্যই ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর বলেছেন যে, যিনি যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন, সর্বভাবেই অর্থাৎ সকল সিদ্ধান্তেই অন্যের অন্যধর্মযুক্তত্ব রূপেই জ্ঞান হয়ে থাকে এবং তার কোনো ব্যতিক্রম আমরা লক্ষ করি না।[৪৮]

আত্মখ্যাতিবাদী বৌদ্ধেরা মনে করেন শুক্তিতে শুক্তিভিন্ন জ্ঞানের ধর্ম রজতের আকারে অধ্যস্ত বা আরোপিত হয় বলেই এক বস্তুতে আমরা অন্যবস্তু প্রত্যক্ষ করে থাকি। ন্যায়-বৈশেষিকের অন্যথাখ্যাতিতে শুক্তিতে শুক্তিত্বধর্মই থাকে, কিন্তু রজতের ধর্ম রজতত্ব নেই অথচ ভ্রমকালে ভ্রান্তধী ব্যক্তি শুক্তিতে রজতের ধর্ম রজতত্বই জানেন, তাঁর কাছে তেমনটিই প্রতীত হয়। এভাবে অখ্যাতিবাদী প্রভাকর মিশ্রের মতেও শুক্তিরজতস্থলে অন্যের অন্যধর্মাবভাসতা প্রদর্শন করা যেতে পারে। ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর অধ্যাস বা ভ্রম প্রসঙ্গো বলেছেন যে, যে দার্শনিক যেমন মতই পোষণ করেন না কেন, ভ্রমপ্রক্রিয়ায় সব মতেই অন্যের অন্যধর্মাবভাসতা হবেই হবে। এর কোনো অন্যথা হতে পারে না। ভাষ্যকারের এ উক্তিতে প্রভাকর মিশ্র যেন বলতে চান যে, আমরা যেহেতু ভ্রমই মানি না, আমাদের মতে সকল জ্ঞানই যেহেতু যথার্থ, সেসব কারণে অধ্যাস বা ভ্রমের যেমন ব্যাখ্যাই শঙ্করাচার্য দিন না কেন, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। এখানে অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদের সমর্থক অদ্বৈত বৈদান্তিক আচার্য শঙ্কর তাঁর সিদ্ধান্তকে অক্ষুণ্ন রাখতে প্রথমে প্রভাকরকে দেখান যে, অখ্যাতিবাদী যদিও 'ইদম্ রজতম্' এভাবে কোনো ভ্রমজ্ঞানকে স্বীকার করেন না, তবু তাঁরা পরোক্ষভাবে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই অধ্যাস বা আরোপের ব্যাপারটি অস্বীকার করতে পারেন না। প্রথমত 'ইদম্' এবং 'রজতম্'-এর সামানাধিকরণ্য বা সমান বিভক্তিযুক্ততার দ্বারা এই 'ইদম্' এবং 'রজতম্' এর অভেদ সিদ্ধ করেন।[৪৯] আবার 'ইদম্ রজতম্' এ ধরনের বাক্য ব্যবহার ছাড়াও অখ্যাতিবাদীও অন্য খ্যাতিবাদীদের মতো অঙ্গুলির দ্বারা শুক্তিকে দেখিয়ে বলতে পারেন এটি রজত। কাজেই শুক্তিকেই তাঁরা রজতত্ববৎ বলে জানছেন। আবার রজতের জ্ঞান হলে শুক্তির দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন।

এমতাবস্থায় মীমাংসক প্রভাকর মিশ্র একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রকৃতকল্পে শুক্তি এবং রজত পরস্পর ভিন্ন হলেও তাদের অভেদজ্ঞান হচ্ছে– এখানে তাঁদের আর অধ্যাস স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।[৫০] কাজেই প্রভাকর-মতেও শুক্তির অন্যধর্ম যুক্তরূপে ভাসমানতা বিদ্যমান। অর্থাৎ প্রভাকরের মতেও শুক্তিতে রজতত্বধর্মের কল্পনা করা হচ্ছে। এভাবে সকল দার্শনিক মতেই অন্যের অন্যধর্ম যুক্তরূপে কল্পনা বা অনির্বচনীয়তা স্বীকৃত হচ্ছে।[৫১] এখন মীমাংসক দার্শনিকেরা বলতে পারেন যে, আমরা যদি অন্যান্য অন্যধর্মাবভাসতা স্বীকার করে নিই, তাহলে ক্ষতি কী? এই প্রশ্নের উত্তরে এখানে বাচস্পতি মিশ্র এককথায় বলে দিলেন যে, অন্যের অন্যধর্মাবভাস হলো অনৃততা বা মিথ্যাত্ব।[৫২] এই বক্তব্যের সমর্থনে বাচস্পতি মিশ্র কোনো যুক্তি দেখাননি। তার কারণ আগেই *মরুমরীচিকা* গ্রন্থে তিনি বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখন সেই তথ্যই এখানে আলোচিত হচ্ছে। মরুভূমির বালুকায়

যখন সৌরকিরণ পতিত হয় তখন ওই সৌরকিরণ প্রকৃতকল্পে জলস্বরূপ না-হলেও আমরা যখন ওই সৌরকিরণকে জলস্বরূপেই সাব্যস্ত করি তখন মরীচিকার এই জলরূপতাকে আমরা কোনো অবস্থাতেই সৎ বলে দাবি করতে পারি না। ওই জলরূপতাকে আবার একেবারে অসৎ বলেও অভিহিত করা যায় না। অসৎ আবার দুভাবে হতে পারে। প্রথমত, একই বস্তু তার নিজ স্বরূপে সৎ, আবার অন্যবস্তুর স্বরূপে সে অসৎ হতে পারে। যেমন : ঘট ঘটরূপে সৎ হলেও পটরূপে অসৎ হতে পারে। এখানে অভাবজ্ঞান এবং ভ্রান্তিজ্ঞানের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা স্মরণ করা যেতে পারে। যাকে আমরা ভ্রান্তিজ্ঞান বলি সেই জ্ঞানে একটি বস্তু অন্য একটি অনুরূপ বস্তুরূপে অধ্যস্ত হয়, কিন্তু অভাবজ্ঞানে একটি বস্তু অসদ্‌রূপে অন্য একটি অনুরূপ বস্তুতে অধ্যস্ত হয়।[৫৩] এ প্রসঙ্গে শ্লোকবর্তিকে বলা হয়েছে যে, রজতাদি ভাবের যে অভাব রূপ হয় তা স্বতন্ত্র নয়, কারণ তা স্বতন্ত্ররূপে নিরূপিত হয় না। তবে অন্য ভাবের তুলনায় তা অভাবরূপে প্রতীত হয়।[৫৪]

এবার দ্বিতীয় প্রকারের অসৎ নিয়ে আলোচনা করা যাক। এ ধরনের অসৎ হলো অলীক, যার কোনো ধরনের জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। যেমন : আকাশকুসুম, শশবিষাণ ইত্যাদি। এখানে যদি আমরা মরীচিকায় অধ্যস্ত জলকে প্রথম ধরনের অসতের অন্তর্ভুক্ত করি, তাহলে প্রশ্ন উঠবে সেই মরীচিকায় অধ্যস্ত জল কি প্রকৃতকল্পে মরীচিকার জল, না-কি গঙ্গাধিগত জল? প্রকৃতকল্পে ওই জল যদি মরীচিকার জলই হতো তাহলে তা মরীচিকা বলেই প্রতীত হতো। কিন্তু তা তো হয় না। আবার ওই জল প্রকৃতকল্পে গঙ্গাধিগত জল হলে 'গঙ্গাতে জল' বলে প্রতীত হতো। কিন্তু তাও হয় না। কাজেই এই জলকে অন্য বস্তুর স্বরূপ অসৎ, অর্থাৎ অসৎ শব্দের প্রথম প্রকারের অর্থে আমরা অসৎ বলে দাবি করতে পারি না।[৫৫] অন্যদিকে আবার এই জলকে অতি অসৎ, নিরুপাদ্য অসৎ বলেও অভিহিত করা যায় না। তা-ই যদি হতো তাহলে জলের কোনো প্রতীতিই হতো না।[৫৬] তাহলে দেখা গেল এই জল যেমন সৎ হতে পারল না, তেমনি আবার অসৎ বলেও প্রতিপন্ন হলো না। তাহলে কি এই জল সদসৎ? এই জল কি সৎ হয়েও অসৎ, আবার অসৎ হয়েও সৎ? কিন্তু সৎ এবং অসৎ পরস্পরবিরোধী বলে একই সময়ে একই বস্তুর ওপর আরোপযোগ্য নয়। তাহলে এই জলকে সদসৎও বলা যাবে না। অনরূপভাবে এই জলকে সদসৎভিন্নও বলা যায় না। এ জন্যই তা অনির্বচনীয়। আর যা অনির্বচনীয় তা অবশ্যই মিথ্যা। এভাবেই অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা প্রবল যুক্তির ভিত্তিতে তাঁদের অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

ভ্রম বিচারের গুরুত্ব ভারতীয় দর্শনের ইতিবৃত্তে অত্যন্ত মৌলিক। ভারতীয় দার্শনিকেরা কেবল জ্ঞান, জ্ঞানের উৎস এবং জ্ঞানের বৈধতা নিয়েই আলোচনা করেননি। সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাজ্ঞান কাকে বলে, মিথ্যাজ্ঞানের স্বরূপ কী, অধ্যাস কেন হয় এবং কী-প্রকারে হয়, ভ্রমজ্ঞান কাকে বলে, এসবের আলোচনায়ও মৌলিক প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছেন। তাই দেখা যায়, প্রচলিত ভারতীয় দর্শনের প্রায় প্রতিটি প্রস্থানেরই মূলতত্ত্ব অন্তত বহুলাংশে এই ভ্রমব্যাখ্যার ওপর

প্রতিষ্ঠিত। আচার্য ফণীভূষণ তর্কবাগীশ যথার্থই বলেছেন : 'এই ভ্রমজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় দার্শনিক সমাজে নানারূপ সূক্ষ্মবিচারের ফলে সম্প্রদায় ভেদে নানা মতবাদ হইয়াছিল এবং এই সমস্ত মতকেই সম্প্রদায়ভেদে বিভিন্ন মত স্থাপনের মূলভিত্তি হইয়াছিল'।[৫৭] বস্তুত ভ্রমবিচার সংক্রান্ত ভারতীয় দার্শনিকদের এই জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ভারতীয় দার্শনিক প্রস্থানগুলোকে মৌলিকতার এক অনন্য আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে সন্দেহাতীতভাবে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় দর্শনে ভ্রমের চরম বিচার হয়েছে—এ জাতীয় কোনো দাবি করবার কারণ না থাকলেও প্রকৃত লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ভ্রমের সমস্যা নিয়ে ভাববাদ ও বাহ্যবস্তুবাদ এ দুটি মূল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিস্তৃত, গভীর এবং সূক্ষ্ম আলোচনা হয়েছে'।[৫৮] বস্তুতই তাই। বিশ্ব দর্শনের ইতিহাসে এমন কোনো দার্শনিক প্রস্থান খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার মধ্যে ভ্রমবিচারে ভারতীয় দার্শনিকদের সমান্তরাল কোনো মৌলিক, সূক্ষ্ম এবং যুক্তিনির্ভর আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। অন্য অনেক প্রাসঙ্গিক দার্শনিক সমস্যার আলোচনার মতো ভ্রমিবচারেও ভারতীয় দার্শনিক ও নৈয়ায়িকেরা এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. 'ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈচ – ব্রহ্ম সূত্র্যতে – সূচ্যতে' – শ্রীধর স্বামী।

২. বদরে – বদরিকাশ্রমে অয়নং – বাসো মস্য সঃ বাদরায়ণঃ।।

৩. *শারীরকভাষ্য* গ্রন্থ প্রণয়নের পর শঙ্করাচার্য ঈশোপনিষদ, কেনোপনিষদ, কঠোপনিষদ, প্রশ্নোপনিষদ, মুণ্ডকোপনিষদ, মাণ্ডূক্যোপনিষদ, ঐতরেয়োপনিষদ, তৈতিরীয়োপনিষদ, বৃহদারণ্যকোপনিষদ এবং ছান্দোগ্যোপনিষদ– এই দশটি উপনিষদের ওপরও ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গীতার ওপরও আলাদা একটি ভাষ্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

৪. রাজা রামমোহন রায়, *বেদান্তগ্রন্থ*, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পর্ষৎ।

৫. এ কারণেই কার্যকারণ বিষয়ে সাংখ্যমত সৎকার্যবাদ নামে পরিচিত। এর বিপরীত মত অসৎকার্যবাদ সমর্থন করেন ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা।

৬. ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোস্য ন বিদ্যতে। এতদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে।। *গৌড়পাদকারিকা।*

৭. মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য অহমিদ মবেদমিতি জায়তে নৈসর্গিকো লোক-ব্যবহারঃ ।। *অধ্যাসভাষ্য।*

৮. স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ।

৯. অবসন্নোবসতো বা ভাসঃ অবভাসঃ। প্রত্যয়ান্তরবাধশ্চাস্যবসাদ্দোহসোনোবা।

১০. যৌক্তিকতিরস্কার ইচ্ছাপ্রবৃত্ত্যাদি কার্য্যাক্ষমত্বাপাদনম্। *কল্পতরু পরিমল।*

১১. অবভাসপদমতসমীচীনে বুদ্ধিপ্রত্যয়ে প্রসিদ্ধম্। যথা নীলস্যাবভাসঃ পীতস্যাবভাস ইত্যতে আহ স্মৃতিরূপ ইতি। *ভামতী : অধ্যাসভাষ্য।*

১২. দেখুন : G. Misrha : *Srimanta Pratap Seth Vedanta Lecture* : Utkal University Analytical Studies in Indian Philosophical Problems, 1969, p. 139

১৩. দেখুন : S. K. Chattpadhaya : *Sankara's Concept of Adhyasa : A Texual Interpretation*, Indian Philosophical Quarterly, Vol. III, No 4, S. S. Barlingay and Rajendraprasad (eds.), University of Poona, July, 1976, p. 493

১৪. **পূর্বোক্ত**, পৃ. ৪৮৩

১৫. যৌক্তিক দৃষ্টবাদী, প্রচলিত ভাষা দার্শনিক, নব্যবাস্তববাদী, অবভাসবাদী এবং নিরীশ্বর অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা বিশুদ্ধ আত্মার ধারণাকে স্বীকার করেন না। ভারতীয় দর্শনে চার্বাক এবং বৌদ্ধ প্রস্থানও দ্রব্যাত্মক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

১৬. ভ্রম বিষয়ে আচার্য শঙ্কর তাঁর *অধ্যাসভাষ্য*-এ দুটি লক্ষণ প্রপঞ্চিত করেছেন। একটি সামান্য লক্ষণ, অন্যটি বিশেষ লক্ষণ। ভ্রমস্বরূপ অধ্যাসের সামান্য লক্ষণ 'অতস্মিংস্তদ্ বুদ্ধিঃ', আর বিশেষ লক্ষণ 'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ'।

১৭. অবশ্য বীর শৈব সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা আরও একটি খ্যাতিবাদ প্রপঞ্চিত করেছেন। এর নাম অলৌকিক খ্যাতিবাদ। কাশ্মীরি শৈব সম্প্রদায়ের একটি গ্রন্থে অপূর্ণ খ্যাতিবাদ নামে আরও একটি খ্যাতিবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের বর্তমান আলোচনায় এ দুটি খ্যাতিবাদের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই।

১৮. বৌদ্ধশাস্ত্রে ও দর্শনে দুটি শব্দ অত্যন্ত প্রচলিত – হীনযান এবং মহাযান। হীনযান মানে নিচুমার্গ বা নিকৃষ্ট মার্গ। আর মহাযান মানে উন্নত মার্গ বা উৎকৃষ্ট মার্গ। যাঁরা কেবল নিজের নির্বাণ লাভেই তৎপর তাঁরাই হীনযান মার্গের বৌদ্ধ। আর যাঁরা সকল জীবের নির্বাণ লাভ কামনা করেন এবং সেজন্য সচেষ্ট থাকেন তাঁরাই মহাযান মার্গের বৌদ্ধ।

১৯. সহোপলম্ভনিয়মাদ্ ভেদো নীল তদ্ধিয়োঃ। ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিদ্যার্নৈদৃশ্যে বেন্দাবিবাদ্বয়ে ॥

২০. দেখুন : S. N. Dasgupta : *A History of Indian Philosophy*, Vol.-1, Cambridge: Cambridge University Press, 1922, p. 127

২১. তৎ স্যাদালয় বিজ্ঞানং যদ্ ভবেদহমাস্পদম্। তৎ স্যাৎ প্রবৃত্তি বিজ্ঞানং ষন্নীলাদিকমুল্লিমেৎ ।।

২২. দেখুন : S. N. Dasgupta : Ibid, p. 146

২৩. বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষের ভ্রমমূলে জ্ঞানের আকার মনোময় রজত প্রভৃতি বহিস্থ 'ইদম্' পদার্থে অধ্যস্ত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানবাদী বিজ্ঞান ব্যতীত বাহ্য পদার্থর অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও, জ্ঞানের আকার রজত প্রভৃতিই যে বাহ্য 'ইদম্' বস্তুতে অধ্যস্ত হয়ে ভ্রম উৎপাদন করে থাকে তা স্বীকার করেন। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, বিজ্ঞানবাদীর মতে বাহ্যবস্তু কল্পিত, অলীক আর সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতে বাহ্যবস্তু বাস্তব। শূন্যবাদী মাধ্যমিক ভ্রমের ব্যাখ্যায় অসৎ খ্যাতিবাদী হলেও ব্যবহারিক ভ্রমপ্রক্রিয়ায় শূন্যবাদী যে আত্মখ্যাতিবাদ অনুমোদন করেন তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ শূন্যবাদীর মতে, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব যেমন কল্পিত, জ্ঞানের অস্তিত্বও তেমনি কল্পিত। এ মতে, জ্ঞেয়বস্তুও নেই, জ্ঞাতাও নেই। কেবল কল্পিত বাহ্যবস্তুতে ভ্রমপ্রক্রিয়ায় কল্পিত জ্ঞানের আকার অধ্যস্ত হয়ে থাকে। অসৎ খ্যাতিবাদের অর্থ হলো, ভ্রান্ত রজত এবং 'ইদম্' বস্তু উভয়ই অসৎ, উভয়ই অলীকমাত্র।

২৪. যত্র যদধ্যাসঃ তস্যৈব বিপরীতধর্মত্বকল্পনা।

২৫. মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ : *ন্যায়দর্শন*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম পর্ষদ সংস্করণ, ২০০১, পৃ. ৪–৫

২৬. অদ্বৈত বৈদান্তিকদের উদ্দেশ্য করে শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা এ বক্তব্য প্রপঞ্চনা করেন। এ কারণেই তাঁরা মনে করেন যে, অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা অনির্বচনীয় খ্যাতির লক্ষণে যে 'পরত্র' শব্দের উল্লেখ করেন তা সর্বাংশে অর্থহীন।

২৭. নিরূপপত্তিকোয়ং পক্ষঃ। নহি নিরধিষ্ঠামোধ্যাসো দৃষ্টপূর্বঃ সংভবীবা। *পঞ্চপাদিকা বিবরণ :* মহামহোপাদ্যায় শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পা.) : *ব্রহ্মসূত্র : শঙ্করভাষ্য*, প্রথমভাগ, কলকাতা : বসুমতী সংস্করণ ১৩৬৯, পৃ. ২৪০

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০-২৪৫

২৯. স্বামী রামানুজ : *ব্রহ্মসূত্র : শ্রীভাষ্য*, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ (সম্পা.), কলকাতা : বসুমতী সংস্করণ ১৩৭৬, পৃ. ১৯৫

৩০. রূপ্যাদিসদৃশ্চায়ং শুভ্যাদিরূপং লভ্যতে। অতস্তস্যাত্র সদ্ভাবঃ প্রতীতেরচি নিশ্চিতঃ।। কদাচিচ্চক্ষুরাদেস্তু দোষাচ্ছুক্তাংশবর্জিতঃ রজতাংশো গৃহীতোতো রজতার্থী প্রবর্ততে ॥

৩১. অবশ্য লোকায়ত চার্বাক মতে, যাবতীয় জড়বস্তুর মূলে আছে চারটি উপাদান। যথা : ক্ষিতি, অপঃ, তেজঃ ও মরুৎ। সেজন্য লোকায়ত চার্বাকরা ভূতচতুষ্টয়বাদী হিসেবে সমধিক পরিচিত।

৩২. ন তত্র রথা ন রথযোগান্ পনুনোভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে ম হি কর্তা। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ* : ৪/৩/১০

৩৩. ভামতীকায় বাচস্পতি মিশ্র সৎখ্যাতিবাদকে ব্যাপকার্থে গ্রহণ করে এর মধ্যে যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের আত্মখ্যাতিবাদ, ন্যায়-বৈশেষিকের অন্যথাখ্যাতিবাদ এবং প্রভাকর মীমাংসকদের অখ্যাতিবাদকেও অন্তর্ভুক্ত করে দেখেছেন। তাঁর মতে, সৎখ্যাতিবাদকে একটু ব্যাপক বা উদার অর্থে নিলে এর মধ্যে উল্লিখিত তিনটি খ্যাতিবাদকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া যায়। ন্যায়-বৈশেষিকেরা তাঁদের অন্যথাখ্যাতিবাদে ভ্রমের স্বরূপ ব্যাখ্যায় ভাসমান বস্তুকে দেশান্তরে সৎ বলেই সাব্যস্ত করেন। এ কারণে তাঁদের অন্যথাখ্যাতিবাদকে সৎখ্যাতিবাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের আত্মখ্যাতিবাদও বস্তুত সৎখ্যাতিবাদ। বাচস্পতি মিশ্রের মতে, আত্মখ্যাতিবাদী বৌদ্ধেরা সর্বত্রই বাহ্য পদার্থে জ্ঞানাকারের অধ্যাস হয় বলে মনে করেন। শুক্তিতে রজতজ্ঞান অধ্যস্ত হওয়ায় আত্মখ্যাতি বৌদ্ধ ভ্রমে ভাসমান বস্তু জ্ঞানস্বরূপে বিদ্যমান বা সৎ বলে দাবি করায় তাঁদের অসৎখ্যাতিবাদকেও সৎ খ্যাতিবাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া যেতে পারে। প্রভাকর মীমাংসক ভ্রম স্বীকার না করলেও শুক্তি রজতের ভ্রমে দুটি জ্ঞান হয় বলে মনে করেন। একটি শুক্তি আর অন্যটি রজত। শুক্তি হলো প্রত্যক্ষ, আর রজত হলো স্মরণ। কাজেই ভাসমান রজত স্মৃতিতে, অর্থাৎ দেশ ও কালান্তরে সৎ হওয়ায় তাঁদের অখ্যাতিবাদকেও সৎখ্যাতিবাদের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

৩৪. সদ্ সৎখ্যাতির্বাধরাধাৎ ।। বিজ্ঞান ভিক্ষু : *সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য* ।। সূত্র : ৫/৫৩

৩৫. এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, ভামতী টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র তাঁর ভাষ্যের উল্লিখিত অধ্যাস বা ভ্রমের লক্ষণটিকে অন্যথাখ্যাতিবাদীর মতের ভ্রমের লক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আচার্য শঙ্কর বাচস্পতি মিশ্রের অনেক পূর্বেই উল্লিখিত লক্ষণটিকে তাঁর অধ্যাসভাষ্যে অন্যথাখ্যাতিবাদীর ভ্রমবিষয়ক মতের লক্ষণ বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু শঙ্করভাষ্যের ভাষ্য রত্নপ্রভার টীকাকার পণ্ডিত গোবিন্দানন্দ আলোচ্য লক্ষণটিকে মাধ্যমিক শূন্যবাদীর অসৎখ্যাতিবাদের ভ্রমের লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। গোবিন্দানন্দ লক্ষণের বিপরীত ধর্ম শব্দে সৎ বস্তুর সত্তারূপ ধর্মের বিপরীত ধর্ম তথা অসত্তাকে গ্রহণ করে একে শূন্যবাদীর অভিপ্রেত লক্ষণ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র বিপরীত ধর্ম পদে অন্যবস্তুর ধর্মকে লক্ষ করেছেন। গোবিন্দানন্দ বিপরীত শব্দের বিরুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করেছেন। পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র তা করেননি। সেজন্য উক্ত দু-প্রকার ভ্রমব্যাখ্যায় পার্থক্য ধরা পড়েছে।

৩৬. যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীতধর্মত্বকল্পনামাচক্ষতে।। শঙ্করাচার্য : *অধ্যাসভাষ্য*।

৩৭. এই সন্নিকর্ষ ছয়ভাবে হতে পারে। যেমন: ১. সংযোগ, ২. সংযুক্ত সমবায়, ৩. সংযুক্ত সমবেত সমবায়, ৪. সমবায়, ৫. সমবেত সমবায় এবং ৬. বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব।

৩৮. যত্র সদধ্যাসস্তদ্ বিবেকাগ্রহনিবন্ধনো ভ্রম ইতি।। শঙ্করাচার্য : *অধ্যাসভাষ্য*।

৩৯. বাচস্পতি মিশ্র : *ভামতী*, নির্ণয় সাগর সংস্করণ, ১৯৩৮, পৃ. ২৭

৪০. 'সর্বং জ্ঞানং সমীচীন মতস্থেয়ম্'। *ভামতী : অধ্যাসভাষ্য*।

৪১. বাচস্পতি মিশ্র : *ভামতী : অধ্যাসভাষ্য*, নির্ণয় সাগর সংস্করণ, ১৯৩৮, পৃ. ২৬-২৭

৪২. প্রথম স্তরে সত্য 'ইদম্ রজতম্' এই জ্ঞানের সঙ্গে ইদম্ রজতম্ এই ভ্রমজ্ঞানের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে 'ইদম্ রজতম্' এ ধরনের ভ্রমের স্থলে অখ্যাতিবাদীর সিদ্ধান্তে যে ধরনের ভেদজ্ঞানের অভাব রয়েছে, সত্য ইদম্ রজত জ্ঞানেও সে ধরনের ভেদবুদ্ধির অভাব রয়েছে– এভাবে সত্য ও মিথ্যার সাযুজ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভ্রম প্রক্রিয়ায় ইদমের প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি– এ দুটি জ্ঞান একত্রে 'ইদম্' রজতম্' এই সত্যজ্ঞানের সদৃশ, এ ধরনের সাদৃশ্যবোধের দ্বারাও রজতার্থীর ব্যবহার, চেষ্টা প্রভৃতির উপপাদন করা যায় না। অনুরূপভাবে ইদমের প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্মৃতি, এ দুটি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও যে ভেদজ্ঞান রয়েছে, তার দ্বারাও রজতার্থীর ব্যবহার, চেষ্টা প্রভৃতিকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

৪৩. পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র 'অবভাস' শব্দটির অর্থ করেছেন অবসন্ন অর্থাৎ প্রত্যয়ন্তর বাধ্য। অর্থাৎ কর্মাক্ষমতার কারণে অবহেলাযোগ্য ভাস-প্রতিভাস। দেখুন : *ব্রহ্মসূত্র : শঙ্করভাষ্য : বেদান্ত দর্শন*, প্রথম ভাগ, *ভামতী*, পৃ. ৭৬

৪৪. রত্নপ্রভা টীকাকার রামানন্দের মতে শঙ্করাচার্যকৃত ভ্রমের বিশেষ লক্ষণে কেবল 'অবভাস' পদটি নয়, 'পরত্র অবভাসঃ' মূল লক্ষণ স্থিরীকৃত হয়েছে। দেখুন : পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

৪৫. স্বরূপপররূপাভ্যাং নিত্যং সদসদাত্মকে। বস্তুনি জ্ঞায়তে বৈগশ্চিদরূপং কিঞ্চিৎ কদাচন।। *মীমাংসা শ্লোক-বর্তিক* : অভাবপরিচ্ছেদঃ শ্লোকঃ ১২

৪৬. ভাবনাপ্রচয়বলান্নিখিলবাসনোচ্ছেদবিগলিতবিবিধবিষয়াকারো পল্লববিশুদ্ধবিজ্ঞানোদায়ামহোদয় ইতি। মাধবাচার্য : *সর্বদর্শন সংগ্রহ : বৌদ্ধদর্শন*।

৪৭. তস্মাৎ সৎপ্রকাশনশক্তিরে অবিদ্যোতি সাম্প্রত্যয়। *ভামতী : অধ্যাসভাষ্য*।।

৪৮. সর্বথাপি তু অন্যস্য অন্যধর্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি।

৪৯. 'অয়ম্ ঘটঃ'– এ ধরনের বাক্যে 'অয়ম্' এবং 'ঘটঃ' উভয়েই প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হওয়ায় বা সমানাধিকরণ উভয়ের অভিন্নতা সূচিত হয়। কিন্তু 'ঘটে জলম্' বললে একটিতে সপ্তমী এবং অন্যটিতে প্রথমা বিভক্তি থাকায় তাদের সামানাধিকরণ্য হয়নি বা বৈয়বিকরণ্য হয়েছে। কাজেই এ বাক্যে ঘট এবং জলের ভেদ সূচিত হয়। এভাবে দরিদ্রায় ধনম্' বললে একটিতে চতুর্থী এবং অন্যটিতে প্রথমা বিভক্তি থাকায় সামান্যধিকরণ্যের অভাবে উভয়ের ভেদই সূচিত হয়, অভেদ সূচিত হয় না।

৫০. অখ্যাতিবাদিভিরকিমৈরপি সামাধিকরণ্যব্যপদেশপ্রবৃত্তিনিয়মাস্নেহাদ ইদমভ্যাপয়ম ইতি ভাবঃ, *ভামতী*, পৃ. ৩৪

৫১. তেন সর্বেষামেব পরীক্ষকাণাং মতেন্যস্যান্যধর্মকলনাহনির্বচনীয়তা অবশ্যম্ভাবিনী ইতি অনির্বচনীয়তা সর্বতন্ত্রাবিরুদ্ধোর্থ ইত্যর্থ ঃ। *ভামতী*, পৃ. ৩৪

৫২. অনস্যান্যধর্মকল্পনাহ নৃততা, সা চানির্বচনীয়তা ইতাধস্তাদুপপাদিতম্। *ভামতী*, পৃ. ৩২-৩৪

৫৩. নাপ্যসৎ বস্তুন্তরমেব হি বস্তুন্তর স্যাসত্ব মাস্থীয়তে ভাবান্তরমভাবোন্যো ন কশ্চিদ্ ত্রিরূপণাৎ ইতি বদন্তিঃ। *ভামতী*, পৃ. ২৩

৫৪. ভাবান্তরমভাবোন্যে। ন কশ্চিৎ নিরূপণাৎ। *শ্লোকবার্তিক : ঔৎপত্তিসূত্র : নিরালম্বনবাদ*, কারিকা : ১১৮

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৫৭. মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ : *ন্যায়দর্শন*, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম পর্ষদ সংস্করণ, ১৯৮১, পৃ. ১৭১

৫৮. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : *ভারতীয় দর্শন*, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম প্রকাশ ২০০৩, পৃ. ৩২৪

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ছত্রিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/জুন ২০১৮

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের গান

শাহনাজ নাসরীন ইলা*

সারসংক্ষেপ

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা যে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সচেতনতার মুখেই ১৯৫৮ সালে প্রহসনমূলক গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়ে সামরিক আইন চালু হয়। আইয়ুব খান রাজনীতির মতো সংস্কৃতিচিন্তাতেও ফ্যাসিবাদী আদর্শ চালু করতে চাইলেন। এক জাতি, এক ধর্ম, এক সংস্কৃতি, এক ভাষা ও একই আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টি হলো সে আদর্শের মূলনীতি। আইয়ুব খানের ভাষায় আধুনিক মনে, ভাবে ও ভাষায় ইসলামের আদর্শ প্রচার করা। ভাষার ব্যাপারে চেষ্টা হলো উর্দু ও বাংলাকে মিশ্রিত করে রোমান হরফের মাধ্যমে পাকিস্তানি ভাষা উদ্ভাবন করার। পরবর্তী দীর্ঘ দশ বছর ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে আইয়ুবশাহী সরকার পতনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এই দীর্ঘ এক দশকে বাংলায় নানামুখী প্রতিবাদী সংগীত রচিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে এ সকল গানের ভাষা ও সুরের বৈশিষ্ট্য এবং উপযোগিতা আলোচিত হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা যে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই সচেতনতার মুখেই ১৯৫৮ সালে প্রহসনমূলক গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়ে সামরিক আইন চালু হয়। সামরিক শাসক আইয়ুব খান রাজনীতির মতো সংস্কৃতিচিন্তাতেও ফ্যাসিবাদী আদর্শ চালু করতে চাইলেন। এক জাতি, এক ধর্ম, এক সংস্কৃতি, এক ভাষা ও একইভাবের আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টি হলো সে- আদর্শের মূলনীতি। ভাষার ব্যাপারে চেষ্টা হলো উর্দু ও বাংলাকে মিশ্রিত করে রোমান হরফের মাধ্যমে পাকিস্তানি ভাষা উদ্ভাবন করার। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এক দশক যাকে 'ডিকেড অব রিফর্মস' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে– সে সময় বি.এন.আর. এবং ব্যাসিক ডেমোক্র্যাসির নামে সমাজের অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে সরকারি দালালি করতে দেখা গেছে। বিপরীতে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও সম্প্রসারণ লক্ষ করা যায়। ১৯৬২ সালে ছাত্র বিক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় আন্দোলনই আরো জোরদার হয়। সে-সময় গুরুসদয় দত্ত রচিত ব্রতচারীর একটি গান ছিল–

মানুষ হ মানুষ হ
আবার তোরা মানুষ হ
অনুকরণ খোলস ভেদি কায়মনে বাঙালি হ।

---

* অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এই কালখণ্ডে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পহেলা বৈশাখ, পঁচিশে বৈশাখ, এগারোই জ্যৈষ্ঠ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব পালিত হয়ে জাতীয় উৎসবের মর্যাদা পেল। লোকসাহিত্যের কদর বেড়ে গেল। লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র 'রূপবান' পেল অবিশ্বাস্য ব্যবসায়িক সাফল্য। এ প্রসঙ্গে সাইদ-উর রহমান জানাচ্ছেন – সাহিত্যের উপকরণের জন্য লেখকেরা দৃষ্টি ফেরালেন লোকজ জীবনের দিকে। স্থান, দোকানপাট, শিশুদের নামকরণে বাংলা শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যবহার শুরু হলো। সিনেমা হলের নাম হল বলাকা, মধুমিতা, জোনাকি; উপশহরের নাম হল বনানী, বারিধারা, শ্যামলী, উত্তরা; দোকানের নাম পেলাম সাগরিকা, সাগর থেকে ফেরা, সাগরসম্ভার।[১]

দুই বছরের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার আন্দোলন ঘনীভূত হতে থাকে। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের ফলে আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হলেও ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন তীব্র হতে থাকে। অর্থাৎ দীর্ঘ ১০ বছর পর আইয়ুবশাহী সরকার পতনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এই দীর্ঘ এক দশকে বাংলায় নানামুখী প্রতিবাদী সংগীত রচিত হয়। সেইসব গানে দেশপ্রেম, ভাষা অধিকার ও ৫২-র স্মৃতি প্রতিধ্বনিত হয় এবং স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতার স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার কথা উঠে আসে।

এসময় বেশকিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে এবং সংগীত রচনা ও পরিবেশন করে জনগণকে সচেতন করে তোলে। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো ছায়ানট। প্রখ্যাত গণসংগীত এবং নজরুলসংগীত শিল্পী শেখ লুতফর রহমান এবং নজরুলসংগীত বিশেষজ্ঞ ও খ্যাতিমান স্বরলিপিকার সুধীন দাসের নেতৃত্বে নজরুল একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ সালে, কিন্তু এর গঠনতন্ত্র প্রণীত হয় ১৯৬৭ সালে। সাংস্কৃতিক সক্রিয়তাবাদী কামাল লোহানীর উদ্যোগে ১৯৬৭ সালে স্থাপিত হয় ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী। সামরিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবাদস্বরূপ এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই সংগঠনের আয়োজনে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত সংগীতের অনুষ্ঠান সে-সময় জনমনে প্রচণ্ড আলোড়ন ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। এই সংগঠন আইপিটিএ-র গান ছাড়াও সংগঠনের গীতিকারদের দ্বারা রচিত গণসংগীত পরিবেশন করত। গীতিকারদের মধ্যে আবুবকর সিদ্দিক, নাজিম মাহমুদ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৮ সালের ২৯শে অক্টোবর গীতিকার, সুরকার, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক এবং সমাজতান্ত্রিক সক্রিয়তাবাদী সত্যেন সেনের উদ্যোগে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তায় প্রগতিশীল আদর্শ-চেতনাশ্রয়ী সংগঠনটির কর্মকাণ্ড অচিরেই দেশব্যাপী পরিব্যাপ্ত হয় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। সামরিক শাসনবিরোধী গণআন্দোলনে উদীচীর ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। উদীচীর শিল্পীগণ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। শুরু থেকেই উদীচীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী মহলের প্রথম সারির অনেকেই, যেমন : আবুল ফজল, রণেশ

দাশগুপ্ত, শহীদুল্লা কায়সার, জহির রায়হান, আবু জাফর শামসুদ্দীন, সুফিয়া কামাল, কবীর চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, সনজিদা খাতুন, সুখেন্দু চক্রবর্তী, অজিত রায়, জিতেন ঘোষ, জ্ঞান চক্রবর্তী, শেখ লুতফর রহমান, আলতাফ মাহমুদ, আবদুল লতিফ, জাহেদুর রহিম, অনিমা সিংহ, পান্না কায়সার প্রমুখ।[২] এ সময়ে নিজামুল হকের নেতৃত্বে 'গণশিল্পী গোষ্ঠী' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এটি গণঅভ্যুত্থানের সময় বিভিন্ন সভা-সমিতিতে গণআন্দোলনমুখী গান গেয়ে বাঙালির সংগ্রামী চেতনাকে শানিত করে। এ সময় আরো কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। যেমন– সৃজনী, উন্মেষ, গণফৌজ ইত্যাদি। সাহিত্য, নাটক, সংগীত ছিল সৃজনী ও উন্মেষের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র। গণফৌজ বিপ্লবী চেতনাশ্রয়ী নাটক মঞ্চস্থ করত। তাদের কর্মপ্রয়াস শুধু শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না, গ্রামাঞ্চলেও তারা নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করে। এ ছাড়াও সংগঠনটি বেশকিছু গণসংগীত রচনা করেছিল। সৃজনীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো সরকারি অনুমতি ছাড়াই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে উপলক্ষ করে প্রথম নাটক উপস্থাপন করে শহীদ মিনারে। ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা', 'বিপ্লবের টুকরো ছবি' ও জন রিডের 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন' ছাড়াও 'আলোর পথযাত্রী', 'মানচিত্র', 'কালিন্দী', 'অনুবর্তন' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়।[৩]

সেকালের উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫)-এর লেখা ও শেখ লুতফর রহমানের সুর-করা নিম্নোক্ত গানটি উল্লেখযোগ্য :

জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই।

সত্যেন সেন রচনা করেন :

এ আগুন নিভাইবো কে রে
এ আগুন নেভে নেভে না।

সাধন ঘোষের 'বাংলার কমরেড বন্ধু, এইবার তুলে নাও হাতিয়ার' ইত্যাদি গান বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান

১৯৫৮ সালে পাকিস্তান সরকার সমগ্র পাকিস্তানে গণতন্ত্রচর্চা নস্যাৎ করতে সামরিক আইন চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। জেনারেল আইয়ুব খান রাষ্ট্রপ্রধান হন। ১৯৫৮ অনেকেই এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। বহির্চক্ষু দিয়ে সাধারণ মানুষ শুধু আইনের কঠোর শাসন দেখল। তবে মাত্র ৪ বছর পরই সামরিক সরকারের আসল চেহারা পরিষ্কার হয়ে উঠল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়তে থাকল হু হু করে, বাঙালির কোনো অধিকার নাই, চাকরি

নাই। সে সময়ই শুরু হলো অগ্নিঝরা সংগ্রাম। দাবি জানানোর স্থান না পেয়ে, রাস্তায় নামল মানুষ। ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে জেনারেল আইয়ুব খানের পতন সুনিশ্চিত হয়। এর মধ্যেই আগরতলা মামলা'য় ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বন্দি করা হলো। ফুঁসে উঠল বাঙালি, ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রবল বিদ্রোহে। অবশেষে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে লৌহমানব খ্যাত আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটাল।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের গান

১৯৬৯ সাল বাঙালি জাতির ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা সুনির্দিষ্ট, সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের দাবি জোরালো হয়ে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের পতন ঘটায়। স্বায়ত্তশাসনের দাবি হয়ে উঠেছিল বাঙালির সর্বজনীন দাবি। নৃশংসতা ও হত্যা, মৃত্যুর মিছিলে এদেশকে রক্তের বন্যায় ভাসতে হয়েছে। তবে রক্ত দেবার সাহসেও বাঙালি ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। ১৯৭১ সালে যে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তার সাহস, ক্ষিপ্রতা, তীব্রতা ও উদ্দীপনার শিক্ষা '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে রক্তদানের কাছ থেকেই শেখা। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে বাংলার আপামর জনগণের অংশগ্রহণ ছিল এবং সকলেই কমবেশি জেল-জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে এ সময়ের আন্দোলন রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আন্দোলনের সূত্রে ধরে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আসে ভিন্ন মাত্রার জোয়ার এবং প্রতিষ্ঠিত হয় প্রগতিশীল কিছু সংগঠন। তখন সভায় মিছিলে অনুষ্ঠানে বিপ্লবী গান পরিবেশনা, প্রচারণা ও রচনার ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করা যায়। সময়ের দাবি অনুযায়ী গানের কথাতেও প্রেক্ষাপটের উত্তালতা পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের গান কোরাসে বিভিন্ন সভা-জমায়েতে গাওয়া হতে থাকে। যেমন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা', 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের, 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা', কাজী নজরুল ইসলামের 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' ইত্যাদি গান পরিবেশিত হতো। চল্লিশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শিল্পীদের গাওয়া সলিল চৌধুরী ও ভূপেন হাজারিকার লেখা ও সুরারোপিত অনেক গান এ সময় গীত হয়।

ষাটের দশক ছিল আন্দোলনের দশক। ওই সময় ইউরোপ জুড়ে চলে ছাত্র আন্দোলন, সারাবিশ্বে এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। লেখা হচ্ছিল যুদ্ধবিরোধী বা শান্তির পক্ষের গান। ছাত্র ইউনিয়ন, সংস্কৃতি সংসদ, সত্যেন সেন প্রতিষ্ঠিত উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। জোন বেজের গাওয়া 'উই শ্যাল ওভারকাম'–এর বাংলা ভাষ্যটি ইংরেজি সুরেই সেই সময় গাওয়া হতো। গাওয়া হতো 'ইন্টারন্যাশনাল'-এর বাংলা ভাষ্য। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিরাজমান স্থবিরতা কাটাতে প্রথমে এগিয়ে আসেন

সাংস্কৃতিক কর্মীরা। এ সময় একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর অনুষ্ঠানে সংগ্রামী গান পরিবেশিত হতো। সরকারি দমনপীড়ন সত্ত্বেও '৬১-তে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠান অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাফল্য ছাত্রদের আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে উদ্দীপ্ত করে। তীব্র ছাত্র আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খান রাজনৈতিক দলগুলোর পুনরুজ্জীবনে বাধ্য হন। ক্রমে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি সোচ্চার হতে থাকে। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা এবং শেখ মুজিবকে আগরতলা মামলায় গ্রেফতারের ঘটনায় ঐক্যবদ্ধ বাঙালি ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলে। গণআন্দোলন অবশেষে রূপ নেয় '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে এবং পরিণতি স্বরূপ আইয়ুব খানের পতন ঘটে। প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, গণতন্ত্রকামী সংস্কৃতিকর্মীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে গান, নাটক প্রভৃতি কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন, জাগ্রত করেছে এবং লক্ষ্য অর্জনে প্রেরণা যুগিয়েছে। বাণী ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে '৬৯-এর গানকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়–

ক) গণআন্দোলনমুখী গান
খ) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গান
গ) দেশাত্মবোধক গান

ক) **গণআন্দোলনমুখী গান**

তৎকালীন গণজাগরণের গানগুলো আগের গান থেকে আলাদা। এতে রয়েছে ফুঁসে ওঠা, গর্জে ওঠা অথচ মুমূর্ষু কাতরতায় ঘেরা শুধু রক্ত আর মৃত্যুর চিত্রকলা। গানগুলোর ভিতরে 'রক্ত', 'মৃত্যু', 'বিপ্লব', 'সংগ্রাম' এই শব্দগুলো জমাট বেঁধে ছিল। সুরে ছিল একই উদ্দামতা, eastern বা western melody-তে না গিয়ে অনেকখানি স্বাধীনভাবে সুরারোপ লক্ষ করা যায়, যাতে উত্তাল সময়ের উদ্দামতা আরো বেশি প্রতিফলিত হয়। ১৯৬৭ সালে সিকান্দার আবু জাফরের লেখা ও শেখ লুতফর রহমানের সুরে গাওয়া 'জনতার সংগ্রাম চলবে' গানটি ছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে। শেখ লুতফর রহমানের কণ্ঠে গাওয়া গানটি বাংলাদেশের গণআন্দোলনে অসামান্য ভূমিকা পালন করে। মধ্য-ষাট থেকে আমাদের মুক্তিসংগ্রাম পর্যন্ত গীত গানগুলোর মধ্যে এটি ছিল অন্যতম প্রধান :

জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই।।
হতমানে অপমানে নয়, সুখ-সম্মানে
বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাস্যের নির্মোক ছাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই।[৪]

গানটিতে প্রতারণা প্রলোভনে না ভুলে অগণিত সঙ্গী-সাথী করে প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে বাধা দূর করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করা হয়েছে।

এ সময় সত্যেন সেনের লেখা ও শেখ লুতফর রহমানের সুরে গাওয়া আরেকটি গান সাড়া জাগিয়েছিল–

এ আগুন নিভাইবো কেরে
এ আগুন নেভে না নেভে না।।
এ আগুন জ্বলে দ্বিগুণ
জ্বলবে দ্বিগুণ
চাপা দিলেও নিভবে না।।
ঘরে ঘরে জ্বলে আগুন
আগুন জ্বলে মনে মনে
এ যে তুষের জ্বালের আগুন জ্বলে
নিভাইবি কেমনে
হায় হায় নিভাইবি কেমনে
আইলোরে ঐ ঝড়ের হাওয়া
ছাই চাপা রবে নারে।।[৫]

সত্যেন সেনের লেখা অজিত রায়ের সুরে গাওয়া আরো একটি সংগ্রামী গান–

আজি সপ্ত সাগর উঠে উচ্ছলিয়া
তোরা শুনতে কি পাস
দিকে দিকে জাগে বিদ্রোহী জনতা
উন্মাদ গর্জনে প্রাণোল্লাস।।
শোষণের জুলুমের জিঞ্জির
ভেঙে পড়ে বন্দিনী পৃথিবীর
উদ্ধত প্রহরণ জাগে ওই জনগণ
দিগন্তে দিগন্তে অরুণ আভাস।।[৬]

১৯৬৯–এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে আবুবকর সিদ্দিক বেশকিছু জ্বালাময়ী, ঝাঁঝালো ও তেজোদীপ্ত গান রচনা করেন। এ সময়ে তাঁর গান বহুল প্রচারিত ছিল। বিভিন্ন সভা মিছিলে এসব গান গাওয়া হতো। শেখ লুতফর রহমানের সুরে –

পায়রার পাখনা বারুদের বহ্নিতে জ্বলছে
শান্তির পতাকা অজগর নিঃশ্বাসে টলছে।।
বুলেটের দানা বেঁধা পাখনায়
পারাবত ওড়ে তবু নীলিমায়
দুশমনি পাঞ্জায় প্রাণ যায়
পতাকার পদাতিক
পথ কেটে কেটে চলছে।।[৭]

আবুবকর সিদ্দিক ভয়ংকর উপমার মাধ্যমে শোষক শ্রেণির নিপীড়নের বীভৎস চিত্র বর্ণনা করেছেন। সাধন সরকারের সুরে তাঁর একটি গান –

ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল
পাকে পাকে তড়পায় সমকাল
মারি ভয় সংশয় ত্রাসে
অতিকায় অজগর গ্রাসে
মানুষের কলিজা ছেঁড়েখোঁড়ে খাবলায় খাবলায় নরপাল।।[৮]

অথবা –

বাংলার ঘরে ঘরে সংগ্রামী জান কি
বাংলার গাছে গাছে বিদ্রোহ জ্বলন্ত তুমি জান কি।।

নাজিম মাহমুদের কথা ও সাধন সরকারের সুরে–

শান্তি না সংগ্রাম– সংগ্রাম, সংগ্রাম
আমাদের সংগ্রাম চলবেই
জাগ্রত জনতা প্রতিজ্ঞা খুরধার
লাখো লাখো চোখ শুধু জ্বলবেই।।
আপস না প্রতিশোধ– প্রতিশোধ, প্রতিশোধ
রক্তের প্রতিশোধ রক্তে
জাগো ওঠো দুর্বার ভেঙে কর চুরমার
লাথি মার জালেমের তখতে
জালেমের হুকুমত টলবেই।।[৯]

আবুবকর সিদ্দিক সাধন সরকার সুরারোপিত তাঁর রচিত গানগুলোকে চার শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে গণআন্দোলনমুখী গানগুলো হলো– ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল, ড্রাগনের বহ্নিবিষ হুঙ্কায়, আমরা ক'জন আধা আধা আধুনিক নাগরিক, বাংলার ঘরে ঘরে সংগ্রাম জ্বলন্ত-জানো কি, আমাদের সংগ্রাম চলবে-থামবে না, সংগ্রাম সংগ্রাম, বাংলার মাটি অতি দুর্জয় বীর্যের সন্তান সেনানীতে পূর্ণ, চাই চাই চাই চাই রাজবন্দিদের মুক্তি চাই, শোনেন শোনেন ভাইগণে ইত্যাদি।[১০] অনেক ক্ষেত্রে এ সময়পর্বে রচিত গানে সমসাময়িক আন্দোলনের যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে শোষকের অগ্নিচক্ষু যত অগ্নিবর্ষণ করেছে বাঙালি তত খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছে স্বাধীন দেশের জন্য, মাতৃভূমির জন্য, মাতৃভাষার জন্য। ভাষাশহীদের রক্ত আর এ সময়ে আন্দোলনের বিপ্লবীদের রক্ত মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। তাই এ সময়ের গানে রক্তের এত প্রাবল্য। ১৯৬৭-৬৮ সালের দিকে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা গান সেই সাক্ষ্য বহন করে :

রক্ত শুধু রক্ত
রক্ত ছড়িয়ে আছে রাজপথে ঘাটে আজি রে।
রক্ত জমাট সিক্ত পিছল

রাজপথ-ঘাট ভাইরে
মায়ের ভাষায় হানছে আঘাত
কেউ কি তোরা নাইরে।।...
রিক্ত বুকের হাড় পাঁজরে
রাখবে এ ঝড় আড়াল করে
ডাক এল আজ, ওরে তোরা সাজ
সময় যে আর নাইরে।।...[১১]

১৯৬৯এ আসাদ ও ড. জোহার মৃত্যুসংবাদে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কারফিউ, সেনাবাহিনীর গুলির ভয় বাঙালির থাকল না। মৃত্যুভয়ে তারা আর ভীত নয়। শহিদ আসাদ ও ড. শামসুজ্জোহাকে স্মরণ করে গীতিকার নিজামুল হক লিখলেন–

আসাদ জোহা আর যত শহীদের
রক্তে নিশান দেখেছি
তাইতো মোরা সবকিছু ভুলে
এক মিছিলে মিলেছি।
যত শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না
না না দেব না।
আজ সংগ্রাম শুধু সংগ্রাম
আজ বিপ্লব শুধু বিপ্লব
হাতে মোদের দীপ্ত মশাল
মোরা বজ্র শপথে চলেছি।।[১২]

খ) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গান

বাঙালির সংগ্রামের ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ। আর্যদের থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে যুদ্ধ করে সংগ্রাম করে বাঙালির অধিকার আদায়ের ইতিহাস রয়েছে। বিভিন্ন সংগ্রামে সেই ইতিহাস থেকেই প্রেরণা আসে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলবার, অদম্য শক্তিতে এগিয়ে চলার। এ ধারার গানগুলোতে তেমনি, গানের কথায় আছে লাখো প্রাণ, মান দেয়ার কথা, আছে ধ্বংসের কথা, সেই ধংস থেকে ঘুরে দাঁড়ানো, পাঁজর ভেঙে আগুন জ্বালানো, আশার কথাও আছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা ও শেখ লুতফর রহমানের সুরে এরকম একটি গান। এসব গানের উত্তেজনা দেশবাসীর চিত্তে উন্মাদনা জাগিয়েছে –

ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
(আজ) কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।।
চিমনির মুখে শোনা সাইরেন-শঙ্খ
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য জীবনকে চায় ভালোবাসতে।[১৩]

সলিল চৌধুরী পাশ্চাত্য হার্মনি-প্রধান সুরের সঙ্গে দেশীয় মেলডি-প্রধান সুর মিশ্রিত করে বিস্ময়কর সব গান রচনা করেছেন। এসব গানের বাণী যেমন বলিষ্ঠ, সুরও তেমনি সুসংবদ্ধ। সলিল চৌধুরী ওয়েস্টার্ন সুরের বিভিন্ন পদ্ধতি বাংলা গানে প্রয়োগ করে বাংলা গানে বিশেষ করে সংগ্রামী গান, বিপ্লবী গানের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন। সলিল চৌধুরীর কথা ও সুরে একটি গান–

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা
তোমার গুলির তোমার ফাঁসির
তোমার কারাগারে পেষণ শুধবে তারা ও জনতা
এই জনতা।।
তোমার সভায় আমীর যারা ফাঁসির কাঠে ঝুলবে তারা
তোমার রাজা মহারাজা করজোড়ে মাগবে বিচার
ঠিক জেনো তা এই জনতা।।[১৪]

গত শতকের পঞ্চাশের দশকে সলিল চৌধুরীর কথা ও সুরে এই প্রতিবাদী গানটি সভা-মিছিলে বহুল প্রচারিত ছিল–

আমার প্রতিবাদের ভাষা
আমার প্রতিরোধের আগুন
দ্বিগুণ জ্বলে যেন দ্বিগুণ
দারুণ প্রতিশোধে
করে চূর্ণ, ছিন্নভিন্ন শত ষড়যন্ত্রের জাল যেন
আনে মুক্তির আলো আনে
আনে লক্ষ শত প্রাণে, শত লক্ষ কোটি প্রাণে।।[১৫]

তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত সলিল চৌধুরীর এই গানটি সে সময় হাটে-মাঠে-কলে-কারখানায় গাওয়া হত–

হেই সামালো, হেই সামালো ধান হো
কাস্তেটা দাও শান হো
জান কবুল আর মান কবুল
আর দেবো না আর দেবো না
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো।
চিনি তোমায় চিনি গো
জানি তোমায় জানি গো
সাদা হাতির কালা মাহুত তুমিই না।।[১৬]

সুকান্ত ভট্টাচার্যের অবিস্মরণীয় কথা ও সলিল চৌধুরীর বৈচিত্র্যে ভরা সুরে রচিত এই গানটি স্বাধীনতা পিয়াসী সংগ্রামীদের প্রভূত প্রেরণা যুগিয়েছে–

হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে
সে কোলাহলের রুদ্ধ স্বরে আমি পাই উদ্দেশ
জল ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।।
হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ
সে কোলাহলের রুদ্ধ স্বরে আমি পাই উদ্দেশ
জল ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।।[১৭]

পরাধীনতার রাজনৈতিক অবিচার ও সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মুকুন্দ দাসের সংগ্রামী ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। জাতীয় উন্নয়ন, আত্মশক্তির উদ্বোধন, নৈতিক উন্নতির কথা মুকুন্দ দাসের গানে যেমন আছে, তেমনি স্বদেশ-প্রেমকে কার্যে রূপান্তরিত করার কর্মসূচিও তাঁর গানে বিধৃত। এখানেই মুকুন্দ দাসের যাত্রা ও গানের বৈশিষ্ট্য।

মুকুন্দ দাসের মাতৃপূজা 'যাত্রাপালা' যুব মহলে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই পালারই অন্তর্ভুক্ত 'ধান গোলায় ভরা/শ্বেত ইঁদুরে করল সারা'– গানটির জন্য তিনি তিন বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন এবং জরিমানা প্রদানের জন্য পৈতৃক মুদি দোকানটিও বিক্রয় করেন।[১৮] গ্রামে গ্রামে দেশাত্মবোধক গান গাওয়া আর স্বদেশী যাত্রাভিনয়ে জনচিত্তকে উদ্বোধিত করার জন্য মুকুন্দ দাসকে বাংলার জনগণ 'চারণকবি'রূপে আখ্যায়িত করেন। মুকুন্দ দাসের কথা ও সুরে প্রেরণাদায়ী গান –

ভয় কী মরণে, রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমররঙ্গে
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমি দ্রিমি দং দং
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।।[১৯]

লোকসংগীতকে ভিত্তি করে বিপ্লবী সংগীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অবদান অবিস্মরণীয়। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান–

বাঁচবো বাঁচবোরে আমরা বাঁচবো বাঁচবো
ভাঙা বুকের পাজর দিয়া
নয়া বাংলা গড়বো।
বিভেদ গাঙের বাঁধবো দুই কূল
বাঁধবো আবার মিলনের পুল
যত বাস্তুহারা সর্বহারা সুখের গৃহ গড়বো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা পেশ কারার পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা তুঙ্গে ওঠে। এরই সাথে বামপন্থি দল ও সংস্কৃতিকর্মীদের সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-উপনিবেশবাদবিরোধী চেতনা মূর্ত হয়ে ওঠে। ফেরদৌস হোসেন ভুঁইয়ার লেখা এবং সুখেন্দু চক্রবর্তী সুরারোপিত গানটিতে এই চেতনা ধরা পড়ে –

ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাঘডাসে
শুনছনি ভাই শুনছনি
বুঝছনি ভাই বুঝছনি
আসল কথা বুঝছনি ?
এক গেরামের গরিব চাষী
কালা মিয়া নাম
সবার পেটে ভাত জোগাইতে
খেতে ঝরায় ঘাম।
ও তার ছাওয়াল কান্দে ক্ষুধার জ্বালায়
মহাজনরা হাসে।।...
আন্ধার রাইতে সূত্যা কিন্যা
তাঁতী বোনে শাড়ি
আর ভদ্রলোকে কিনে
উলি সিফনের বাহারী
ও ভাই দেশী শিল্পের বাজার গেল
বিদেশী বিলাসে।[২০]

এবং ১৯৬৯-এ লেখা আর একটি গানে দেখি সমকালীন প্রসঙ্গ :

ও বিলাই
রুই মাছের মাথা খাইও না
শেখের হাতে শক্ত লাঠি থাবা আর বাড়াইও না।।[২১]

গ) দেশাত্মবোধক গান

১৯৭১ সালে আমাদের যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ তার সাহস তার প্রেরণা ছিল '৬৯-এর গণআন্দোলন। ১৯৬৯-এ এসে পরিষ্কার হয়ে যায়, পাকিস্তানের অধীনে আর পরাধীন থাকা, শোষিত হওয়া সম্ভব নয়, আমরা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, আমাদের লক্ষ্য হলো আমাদের স্বাধীন ভূখণ্ড বাংলাদেশ। এই বোধ থেকেই '৬৯-এ গণঅভ্যুত্থানের সময় গাওয়া হতো কিছু দেশাত্মবোধক গান। সবুজ শ্যামল বাংলা মায়ের প্রতিচ্ছবি ছিল বাণীর উপজীব্য। এই গানগুলিতে স্বদেশ সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে, অন্তিম লক্ষ্য হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে স্বদেশের সবুজ শ্যামলিমা নিসর্গে মৃত্যুর ইচ্ছাও। এরকম কিছু গান :

আমার দেশের মাটির গন্ধে
ভরে আছে সারা মন
শ্যামল কোমল পরশ ছাড়ায়ে

নেই কিছু প্রয়োজন।।
প্রাণে প্রাণে যেন তাই এই সুর শুধু পাই
দিগন্ত জুড়ে সোনা রং ছবি
এঁকে যাই সারাক্ষণ।।[২২]
(মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান)

বাংলাদেশের বহুল খ্যাত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় আবদুল লতিফের লেখা ও সুরে জনপ্রিয় এই গানটি–

সোনা সোনা সোনা
লোকে বলে সোনা
সোনা নয় তত খাঁটি
বল যত খাঁটি তারও চেয়ে খাঁটি
বাংলাদেশের মাটি
(আমার) বাংলাদেশের মাটি।।
ধন ধন ধন যত ধন দুনিয়াতে
হয় কি তুলনা বাংলার কারো সাথে
কত মা'র ধন মানিক রতন
কত জ্ঞানী-গুণী কত মহাজন
এনেছে আলোয় সূর্য এখানে
আঁধারের পথ কাটি।।[২৩]

উনসত্তরের গণআন্দোলন ছিল প্রকৃতই বিক্ষোভ, বিপ্লব, সংগ্রাম আর বিদ্রোহ। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির যে স্বাধিকার আন্দোলনের সূত্রপাত মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্‌কালে এ যেন তারই মহাপ্রস্তুতি। সংগীতের ক্ষেত্রে বাঁধভাঙা জোয়ার এসেছিল এ সময়। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি/ তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী, বাংলার মাটি বাংলার জল, ও আমার দেশের মাটি/ তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা, সার্থক জনম আমার/ জন্মেছি এই দেশে, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো, বাঁধ ভেঙে দাও/ বাঁধ ভেঙে দাও-ভাঙো, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ধন-ধান্য পুষ্পভরা/ আমাদের এই বসুন্ধরা, বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ, রজনীকান্ত সেনের মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, অতুলপ্রসাদ সেনের মোদের গরব মোদের আশা আ'মরি বাংলা ভাষা, কাজী নজরুল ইসলামের এই শিকল পরা ছল, মোদের এই শিকল পরা ছল, কারার ঐ লৌহ কপাট, দুর্গম গিরি কান্তার মরু, চল্ চল্ চল্ / ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি/ আমার দেশের মাটি প্রভৃতি প্রেরণাদায়ী, সংগ্রামী, দেশমাতৃকার প্রতি নিবেদিত গান ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই বিভিন্ন সভা-সমিতি, মিটিং, মিছিলে গাওয়া হতো।

মুকুন্দ দাস, সলিল চৌধুরী, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সত্যেন সেন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সিকান্দার আবু জাফর, শেখ লুতফর রহমান, আবদুল লতিফ, আবুবকর সিদ্দিক, নাজিম মাহমুদ প্রমুখের অগ্নিঝরা গানে তখন পূর্ববাংলা উত্তাল ছিল। এসব গান উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে মানুষের চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তথ্যনির্দেশ

১. সাইদ-উর-রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৬৮
২. আবদুশ শাকুর, *বাঙালির মুক্তির গান*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১২৯
৩. কামাল লোহানী, 'প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট', লতিফ ও সায়েন জীবন-স্মারক বক্তব্য, সমাজ চেতনা, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৯
৪. *জাগরণের গান*, সংকলন ও সম্পাদনা : মোস্তফা তৌহিদ খান ও অন্যান্য, জাগরণ সংস্কৃতচর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র, ২০১১, পৃ. ৮১
৫. *জাগরণের গান*, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ২৩
৬. *জাগরণের গান*, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ২৭
৭. কামান লোহানী, *লড়াইয়ের গান*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৭৮
৮. *জাগরণের গান*, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ১২২
৯. *জাগরণের গান*, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ৭৫
১০. আবুবকর সিদ্দিক, 'গণসংগীতের রূপকার সাধন সরকারের স্মৃতিচিত্র', সাজ্জাদুর রহমান (সম্পাদিত), *সাধন সরকার স্মারকগ্রন্থ*, ২০০৫, পৃ. ৯
১১. ইকবাল করিম হাসনু (সম্পা.), *বাংলা জার্নাল*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৯৯, পৃ. ৭৩
১২. বাংলা জার্নাল, পূর্বোক্ত, ১৯৯৯, পৃ. ৭৩
১৩. *জাগরণের গান*, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ১১৫
১৪. *জাগরণের গান*, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ১২৪
১৫. *জাগরণের গান*, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ২৮
১৬. *জাগরণের গান*, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ১৬৩
১৭. *জাগরণের গান*, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ১৬৪
১৮. আবদুশ শাকুর, *বাঙালির মুক্তির গান*, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৮
১৯. *জাগরণের গান*, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ১২৬
২০. *লড়াইয়ের গান*, কামান লোহানী, ২০০৮, পৃ. ২২৭
২১. শামসুজ্জামান খান, *বাংলার গণসংগীত*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৬১
২২. *ভাষা ও দেশের গান*, মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী, (সম্পাদিত), অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১০৪
২৩. *জাগরণের গান*, পূর্বোক্ত, ২০১১, পৃ. ১৫৮

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ছত্রিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/জুন ২০১৮

মনোগত তত্ত্ব ও বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুর 'ভ্রান্ত ধারণা' পর্যবেক্ষণ দক্ষতা বিশ্লেষণ

সালমা নাসরিন*

সারসংক্ষেপ

মনোগত তত্ত্ব (theory of mind) শিশুর ভাষিক বিকাশে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তেমনি চারপাশের নিত্য ব্যবহার্য বস্তু ও পদার্থ শনাক্তকরণেও সহায়তা করে। অন্যদিকে, মনোগত ঘাটতি তার এসব বস্তু শিখন প্রক্রিয়ায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আর এ বিষয়টি সারা বিশ্বেই 'ভ্রান্ত ধারণা' শনাক্তকরণ শীর্ষক পরীক্ষণের মাধ্যমে অবহিত হওয়া যায়। উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে বর্তমান প্রবন্ধে একটি 'ভ্রান্ত ধারণা' (false belief) পরীক্ষণ সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুর মনোগত দক্ষতা যাচাই করার পাশাপাশি তাদের পরিপার্শ্বের ব্যবহার্য ৪টি ফল ও সবজি শনাক্তকরণ ও শিখনের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই পরীক্ষণের ফলাফলে দেখা গেছে যে, বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুর যথাযথ মনোগত দক্ষতা না থাকার কারণে ৪টি ব্যবহার্য বস্তুর প্রতীকী নাম বলার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার পরিমাপ ছিল যেখানে ৭০%, সেখানে একই বস্তু প্রকৃত না ভ্রান্ত তা শনাক্তকরণের পরিমাপ ছিল ৬০%। অর্থাৎ, এই পরীক্ষণে ৪টি বস্তু শনাক্তকরণ ও শিখন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুর মনোগত তত্ত্বের ঘাটতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

চাবি শব্দ : মনোগত তত্ত্ব; 'ভ্রান্ত ধারণা'; বস্তু শনাক্তকরণ; নিম্ন-দক্ষ ও উচ্চ-দক্ষ অটিস্টিক শিশু

অটিস্টিক শিশু চারপাশের বিভিন্ন বস্তু ও পদার্থ অনুধাবন ও শনাক্তকরণে নানারকম ঘাটতি প্রদর্শন করে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, অটিস্টিক শিশুর বস্তুজগৎ ও ভাব– সম্পর্কিত জ্ঞানগত প্রক্রিয়া প্রচলিত অর্থে একজন স্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিশুর (typically developing child) মতো সুসংগঠিত, প্রক্রিয়াঋদ্ধ ও কার্যকর নয়। কারণ, এসব বস্তু ও ভাবের অনুধাবন ও ধারণায়নে তারা সঠিক মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। আর এই ঘাটতির কারণে নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন বস্তু ও পদার্থ শনাক্তকরণে এক ধরনের বৈকল্য দেখিয়ে থাকে। ফলে এসব বস্তু শিখন প্রক্রিয়ায়ও তাদের এক ধরনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবন্ধে একটি বিশেষ পরীক্ষণের মাধ্যমে বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুর বস্তু শনাক্তকরণ ও শিখন প্রক্রিয়া–বিষয়ক মনোগত ঘাটতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে (টীকা দেখুন)।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. স্বাভাবিক শিশু ও মনোগত তত্ত্ব

মনোগত তত্ত্ব হলো, স্বাভাবিক মানুষের একটি মনো-সংবেদনগত দক্ষতা, যার মাধ্যমে অন্য মানুষের বিভিন্ন সংবেদন বা আবেগকে উপলব্ধি করা যায়। মনোগত তত্ত্ব বিষয়ে মিলার বলেন :

> Theory of Mind refers to an understanding of mental states–such as belief, desire, and knowledge–that enables us to explain and predict others behavior.[১]

মিলারের উপরিউক্ত ধারণাকে সমর্থন করে আবু-আকেল[২] মনোগত তত্ত্বকে শিশুর মানসিকীকরণের সামর্থ্য (mentalizing capacity) হিসাবে অভিহিত করেছেন।

একজন স্বাভাবিক শিশু তার সহজাত ক্ষমতার অংশ হিসেবে নিজের মধ্যে যেমন বিভিন্ন আবেগকে ধারণ করে, ঠিক তেমনি অন্যেরও যে একই ধরনের আবেগ বা সংবেদন রয়েছে তা সে বুঝতে পারার ক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন করে। আর এই মনোগত তত্ত্ব শিশুর মনোবিকাশ, ভাষিক বিকাশ ও পরিবৃদ্ধি বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায়, শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির সাথে মনোগত তত্ত্ব বিকাশের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ঠিক কোন বয়স থেকে একটি শিশুর মনোগত বিকাশের ধারাটি শুরু হয়? অর্থাৎ কখন থেকে একটি শিশু অন্যের বিভিন্ন মানসিক অবস্থা বুঝতে শুরু করে? এ বিষয়ে মিলার[৩] প্রথম শিশুর শারীরিক বয়স (chronological age)-এর সাথে মনোগত অবস্থার বিকাশের একটি ছক উপস্থাপন করেন। নিচে এটি উল্লেখ করা হলো :

বয়স	বিভিন্ন মানসিক অবস্থাসমূহ
৬-১২ মাস	যৌথ মনোযোগ (তাকানো ও অঙ্গুলি নির্দেশসহ)
১৩-২৪ মাস	ক. অন্যের অভিপ্রায়কে উপলব্ধি করা ও শব্দের সাহায্যে তা প্রকাশ করা। খ. একটি বিষয় সম্পর্কে অন্য মানুষের যে প্রত্যাশা, যা নিজ থেকে ভিন্ন, তা বুঝতে পারা। গ. প্রারম্ভিক প্রতীকী বা ছলনাধর্মী খেলা বুঝতে সক্ষম হওয়া।
৩০-৩৬ মাস	ক. বিভিন্ন মানসিক অবস্থা ও এ বিষয়ক শব্দাবলি, যেমন–আনন্দ, বিরক্তি, বেদনা ইত্যাদি ব্যবহার করতে শুরু করা। খ. উন্নত ধরনের ছলনাযুক্ত খেলা বুঝতে পারা। গ. এ সময় তাদের বাক্যিক ধারণার জন্ম হয়।
৩৭-৪৮ মাস	নির্দিষ্ট একটি বিষয় সম্পর্কিত ধারণা নিজের চেয়ে অন্যের ভিন্ন হতে পারে তা উপলব্ধি করা।
৪৯-৬০ মাস	বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণার ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অবহিত হওয়া।

চিত্র ১ : শিশুর মনোগত তত্ত্ব বিকাশের বয়সক্রম [উৎস : Miller, 2006 : 143]

ডান ও তাঁর সহকর্মীরা[৪] বলেন, ৪০ মাস বয়সে শিশুর মনোগত তত্ত্ব বিকশিত হয়। ৩-৪ বছর বয়সে শিশুর ভাষা এবং মনোগত তত্ত্ব একই সঙ্গে একটি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নাটকীয়ভাবে বিকশিত হয়। ফলে এই বয়সের স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রাপ্ত শিশুরা নিজের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারার পাশপাশি অন্যেরও যে অভিন্ন রকমের মানসিক অবস্থা বর্তমান রয়েছে, তা অনুধাবন করতে পারে।

২. অটিস্টিক শিশুর মনোগত তত্ত্ব

২.১ অটিজম কী

অটিস্টিক শিশুর স্নায়ু-মনোবিকলনগত অবস্থার ফলে তার বুদ্ধিগত, আচরণগত ও ভাষিক প্রকাশে অসংগতি বা বৈকল্য লক্ষণীয়। একটি শিশুর শৈশব তথা জীবনের শুরুতেই অর্থাৎ, এক থেকে তিন বছরের মধ্যেই অটিজমের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত The National Society for Children and Adults with Autism অটিজম-এর সংজ্ঞার্থ প্রসঙ্গে বলে যে, এটি একটি জৈবিক উপসর্গ যা সাধারণত শিশুর ৩০ মাস বয়সের আগেই শুরু হয়। আর এই বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোবিকলনগত অবস্থা একটি অটিস্টিক শিশু সারাজীবনই বহন করে চলে। অটিজমের কারণে শিশুর মানসিক বিকাশ, ভাষার বিকাশ, বৌদ্ধিক বিকাশ, স্নায়বিক সংগঠন, বাচনশক্তি এবং সেই সঙ্গে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়[৫]। উল্লিখিত সংজ্ঞার্থ ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, অটিজম একটি শিশুর সার্বিক জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে তার বুদ্ধিগত বিকাশ রহিত হওয়ার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বৈকল্যসহ ভাষিক প্রকাশেও বহুমাত্রিক অপারগতা দেখা যায়। বর্তমানে সারাবিশ্বে একটি বিকাশজনিত বৈকল্য হিসেবে অটিজম–আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে অটিজমে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা প্রতি হাজারে ১.৫৫ জন[৬]। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ সংখ্যা প্রতি হাজারে ৬৮ জন[৭]।

২.২ অটিস্টিক শিশুর মনোগত ঘাটতি

একটি স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় অটিস্টিক শিশুর তাৎপর্যপূর্ণ মনোগত ঘাটতি রয়েছে। অর্থাৎ, অটিস্টিক শিশু নিজের মানসিক অবস্থা মোটামুটি বুঝতে পারলেও অন্যের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে সে অপারগ হয়। কারণ অটিস্টিক শিশুরা যদিও কিছু পেতে, সীমিত পর্যায়ে জানতে এবং চিন্তা ও কল্পনা করা ও স্বপ্ন দেখতে চাইলেও উল্লিখিত মানসিক ও আবেগগত অবস্থাসমূহ যে তাদের মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনসহ পৃথিবীর সকল মানুষেরই রয়েছে, তা তারা বুঝতে পারে না। এ ব্যাপারটিকে অটিস্টিক শিশুর মনোগত তত্ত্বের ঘাটতি বলা হয়[৮]।

অটিস্টিক শিশুদের মনোগত ঘাটতির এই বিষয়টিকে প্রথম তুলে ধরেন ব্যারন-কোহেন ও তাঁর সহকর্মীরা[৯] তাঁদের প্রকাশিত 'Does the Autistic Child have a theory of mind'

নামক একটি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তাঁরা বলেন, যেসব অটিস্টিক শিশু স্বাভাবিক বাচন ও মনোগত অবস্থার অধিকারী তারাও অন্যের মনোগত অবস্থা বুঝতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

৩. মনোগত তত্ত্ব ও ভাষিক বিকাশ

টমাসেলো এবং ফারার[১০], টাগের-ফ্লুসবার্গ ও জোসেফ[১১], ফারার ও মাগ[১২] বলেন, শিশুর ভাষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে মনোগত তত্ত্বের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। টাগের-ফ্লুসবার্গ ও জোসেফ[১৩] মনোগত তত্ত্বের সাথে ভাষার বিকাশকে সম্পর্কিত করে বলেন, মনোগত তত্ত্বের মাধ্যমে একদিকে যেমন স্বাভাবিক শিশুর আবেগগত শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে, তেমনি অন্য মানুষের এই তত্ত্বগত ধারণাকে বোঝার পূর্বশর্ত হলো, ভাষা তথা বাক্যগত দক্ষতা অর্জন। মূলত মনোগত তত্ত্ব অনুধাবন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে শিশুর বাক্যিক স্তর (syntactic level) ভালো থাকতে হয়। কোনো শিশুর বাক্যিক স্তরের বিকাশ ঘটলেই সে নিজের এবং অন্যের মনোগত তত্ত্ব বুঝতে সক্ষম হয়। তাই বাক্যিক স্তর বিকাশের ওপর মনোগত তত্ত্ব অনুধাবনের ক্ষমতা নির্ভর করে। কারণ মনোগত তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত 'ভ্রান্ত ধারণা' (false belief) এবং অন্যান্য মানসিকসূচক অবস্থা উপলব্ধির ক্ষেত্রে বাক্যিক সংগঠনে দক্ষ হওয়া দরকার। এছাড়া মনোগত তত্ত্বের সঙ্গে প্রায়োগার্থিক দক্ষতা, প্রতীকী খেলা, ছলনা, কৌতুক বা ভান–সম্পর্কিত ধারণা, কথোপকথন দক্ষতা, যৌথ মনোযোগ, যৌথ অনুকরণ ইত্যাদি বিষয় জড়িত। সুতরাং, একজন শিশুর মনোগত তত্ত্ব উন্নতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তার সার্বিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অটিস্টিক শিশুর মনোগত অবস্থার ঘাটতি থাকে এবং এই ঘাটতির কারণেই তারা ভাষাসহ অন্যান্য বিষয়ে নানারকম বৈকল্য প্রদর্শন করে।

৩.১ মনোগত তত্ত্ব ও বাক্যিক সংগঠন বিকাশে 'ভ্রান্ত ধারণা' পরীক্ষণ

বিভিন্ন গবেষক অটিস্টিক শিশুর মনোগত তত্ত্বের প্রকৃতি ও বাক্যিক সংগঠনের ভেতরগত রূপ জানার জন্য 'ভ্রান্ত ধারণা' (false belief) শিরোনামে যেসব পরীক্ষা করেছেন, তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভ্রান্ত ধারণা পরীক্ষণের জন্য অটিস্টিক শিশুকে দু–ধরনের অভীক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। এ দুটি অভীক্ষা হলো :

১. ১ম পর্যায়ের ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কিত কাজ (first order false belief task) এবং
২. ২য় পর্যায়ের ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কিত কাজ (2nd order false belief task)

১ম পর্যায়ের ভ্রান্ত ধারণা–সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ সাধারণত চিরায়ত বা নিম্ন-দক্ষ অটিস্টিক শিশুকে দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। আর ২য় পর্যায়ের ভ্রান্ত ধারণা–সম্পর্কিত কাজগুলো উচ্চ-দক্ষ শিশুকে দিয়ে করানো হয়। কারণ ২য় ক্রমের কাজগুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন, অর্থাৎ, এ ধরনের পরীক্ষা বুঝতে গেলে যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও যৌক্তিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সাধারণত উচ্চ-দক্ষ অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে তা অনেকটাই লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে, চিরায়ত বা নিম্ন-দক্ষ অটিস্টিক শিশুর এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক, জ্ঞানবৃত্তিক ও যৌক্তিক ধারণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। গবেষকেরা মনে করে থাকেন, যেহেতু উচ্চ-দক্ষ শিশুদের বুদ্ধাঙ্ক স্বাভাবিক শিশুদের কাছাকাছি, সেজন্য তাদের মধ্যে মনোগত ধারণা ভালো থাকে এবং এসব পরীক্ষায় তারা দক্ষতার পরিচয় দেয়। তাঁরা আরও বলেন, মনোগত তত্ত্বের আলোকে ১ম ক্রমের ভ্রান্ত ধারণা–সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষা প্রকৃত অর্থে নিম্ন-দক্ষ অটিস্টিক শিশুর দ্বারা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ব্যারন-কোহেন[১৪] অটিস্টিক শিশুদের ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে জানার জন্য Little Red Riding Hood গল্পের মিথ চরিত্রকে রূপায়ণ করেন। মিথ চরিত্রের ক্ষেত্রে কোনো প্রাণী নানারূপ ধারণ করতে পারে। এই পরীক্ষণে একটি নেকড়ে দাদির রূপ ধারণ করেছিল। গল্পের চরিত্রগুলো সম্পর্কে শিশুদের পূর্বেই ধারণা দেয়া হয়। খাটে যে দাদির ছদ্মবেশ ধারণ করে শুয়েছিল সে আসলে দাদি নয়, নেকড়ে ছিল। চার বছরের স্বাভাবিক শিশুকে জিজ্ঞেস করা হয় বিছানায় 'কে শুয়ে আছে'? এবং সে সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হয়। কারণ বর্ণনামূলক এই আখ্যানটি বলার পর এই চিত্রায়ণটি তার সামনে প্রদর্শন করলে গল্পের চরিত্রটি যে পৌরাণিক, তা সে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু অটিস্টিক শিশুকে জিজ্ঞেস করা হলে সে তা বলতে সমর্থ হয়নি। একই পরিস্থিতির যে ভিন্ন অবস্থান থাকতে পারে এবং সেটি যে একটি পৌরাণিক গল্পের মাধ্যমে রূপায়িত হতে পারে অটিস্টিক শিশুরা তা অনুধাবনে অপারগ হয়।

১৯৮৫ সালে ব্যারন-কোহেন ও তাঁর সহকর্মীরা[১৫] 'Does the Autistic Child have a theory of mind' নামক প্রবন্ধে মনোগত তত্ত্ব–সম্পর্কিত একটি পরীক্ষণ করেন, যার নাম দেন 'Sally Anne false belief task'। এই পরীক্ষণ সম্পাদনের জন্য অংশগ্রহণকারীদের একটি চিত্রাত্মক-গল্প দেখানো হয়, যেখানে পর পর ৪টি দৃশ্য ছিল। গল্পটি ছিল এ রকম-'শেলির একটি ঝুড়ি এবং অ্যানের একটি বাক্স ছিল। ১ম দৃশ্যে শেলি তার ঝুড়িতে একটি মার্বেল রাখে। ২য় দৃশ্যে সে সেখান থেকে বের হয়ে যায়। ৩য় দৃশ্যে কিছুক্ষণ পর অ্যানে এসে ঝুড়ি থেকে মার্বেলটি তুলে তার বাক্সে রেখে দেয়। ৪র্থ দৃশ্যে শেলি সেখানে পুনরায় প্রবেশ করে। শিশুদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, শেলি বলটি কোথায় খুঁজবে? শিশুদের তিনটি দলে ভাগ করা হয়েছিল। দলগুলো ছিল এ-রকম : স্বাভাবিক শিশু (normally developing children), অটিস্টিক শিশু (autistic children) এবং ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশু (Down syndrome children)। উল্লিখিত ঘটনাটি তিনটি দলকে জিজ্ঞেস করার পর ১ম দলটির সর্বমোট ২৭ জন শিশুর মধ্যে ২৩ জন সঠিক উত্তর দিয়েছিল এবং ৪ জন সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। ২য় দলটির সর্বমোট ২০ জন শিশুর মধ্যে ৪ জন সঠিক উত্তর দিয়েছিল এবং বাকি ১৬ জন সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি। ৩য় দলটির সর্বমোট ১৪ জন শিশুর মধ্যে ১২ জন সঠিক উত্তর দিয়েছিল এবং ২ জন সঠিক

উত্তর দিতে দিতে পারেনি। এখানে লক্ষ করা যাচ্ছে, উল্লিখিত পরীক্ষণে ৩টি দলের মধ্যে অটিস্টিক শিশুরা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি প্রদর্শন করেছে।

উপরিউক্ত সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, স্বাভাবিক শিশুরা মনোগত তত্ত্বের স্বাভাবিক বিকাশের ফলস্বরূপ প্রাত্যহিক জীবনের কথোপকথনে কিছু আবেগসূচক শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে তারা খেলাধুলার ক্ষেত্রে কিছু প্রতীকী খেলা, ছলনাপূর্ণ খেলা করে থাকে। এছাড়া স্বাভাবিক শিশুদের কথোপকথনে কখনো কখনো কোনো বিষয় নিয়ে ভান করা, ভ্রান্ত ধারণা ইত্যাদি বিষয়গুলোও যুক্ত থাকে। এসব বিষয় মনোগত তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত যা অধিকাংশ অটিস্টিক শিশু করতে ব্যর্থ হয়।

উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে বিভিন্ন বস্তু অনুধাবন ও শনাক্ত করে এবং সেগুলো বাস্তব জীবনে ব্যবহার করতে গিয়ে তারা কী ধরনের আচরণগত ও ভাষিক সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে থাকে, তা বর্তমান পরীক্ষণে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমান প্রবন্ধে সম্পাদিত পরীক্ষণটি ছিল ১ম পর্যায়ের 'ভ্রান্ত ধারণা' সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণকারী শিশুর মনোগত দক্ষতা যাচাই করা। এছাড়া নিচের বিষয়গুলোও এই পরীক্ষণের আওতাভুক্ত ছিল।

ক. বয়স, বুদ্ধিমত্তা, আচরণ এগুলোর সঙ্গে মনোগত তত্ত্বের সম্পর্ক আছে কিনা।

খ. যারা উচ্চ-দক্ষ অটিস্টিক শিশু এবং যারা নিম্ন-দক্ষ অটিস্টিক শিশু, তাদের মধ্যে বস্তু শনাক্তকরণসহ এগুলো আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে কিনা।

সর্বোপরি, উপরিউক্ত সম্ভাব্য পর্যবেক্ষণের আলোকে বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুর মনোগত তত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত গুণগত পদ্ধতি (qualitative method)-এ এককালীন শ্রেণি-প্রতিনিধিত্বমূলক (cross-sectional) প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হয়েছে। যেহেতু এতে বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুদের মনোগত তত্ত্ব তথা ভ্রান্ত ধারণার স্বরূপ অন্বেষণ করা হয়েছে, তাই সংখ্যাগত পদ্ধতি (quantitative method) অনুসরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফল দিয়ে তার মূল্যায়ন করা যৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়নি, বরং এখানে ভ্রান্ত ধারণার প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই এই গবেষণার ক্ষেত্রে গুণগত পদ্ধতিই অধিকতর যৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়।

৪.১ অংশগ্রহণকারী অটিস্টিক শিশু

মোট ১০ জন অটিস্টিক শিশুকে এই পরীক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়। প্রতিনিধিত্বশীল এসব শিশু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অংশগ্রহণকারী শিশুদের

সেসব বৈশিষ্ট্যকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যেসব বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত উপাত্ত অন্বেষণ করা এবং ফল বের করা সহজ হয়। অর্থাৎ যারা বাচনিক (verbal) ও অবাচনিক (nonverbal) যোগাযোগে অপেক্ষাকৃত দক্ষ, যাদের বয়সের পরিপক্বতা আছে ও নিয়মিতভাবে স্কুলে আসা যাওয়া করে এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিষেধনমূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে—এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এদের মধ্যে ৪ জন নিম্ন-দক্ষ (low functioning) অটিস্টিক শিশু এবং ৬ জন উচ্চ-দক্ষ (high functioning) রয়েছে। ডিএসএম-৪[১৬] অনুসরণ করে মনোচিকিৎসদের দ্বারা শনাক্তকৃত শিশুদেরই এই গবেষণাকর্মে নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উচ্চ-দক্ষ অটিস্টিক শিশু বলতে সে ধরনের শিশুকেই বুঝানো হচ্ছে, যেসব শিশুর বুদ্ধাঙ্ক ৭০-এর ওপরে এবং যারা সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত দক্ষ। অন্যদিকে, যাদের বুদ্ধাঙ্ক ৭০-এর নিচে এবং বিভিন্ন জ্ঞানমূলক কর্মকাণ্ডে যারা উচ্চ-দক্ষদের তুলনায় অধিকতর বৈকল্য দেখায় তাদের নিম্ন-দক্ষ বলা হয়। এই দুই বর্গেই যেহেতু অটিজম–আক্রান্ত মেয়ের সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় কম অর্থাৎ ১ : ৪, সেহেতু এই পরীক্ষণে মোট ১০ জন অংশগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে মেয়ে শিশুর সংখ্যা ৩ জন ছিল। গবেষণার ফল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে শিশুদের নাম উল্লেখের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষার অংশ হিসেবে তাদের প্রকৃত নামের প্রথম বর্ণ দিয়ে তৈরি ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

৪.২ গবেষণা নমুনায়ন

এই গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (purposive sampling) ও কোটা নমুনায়ন (quota sampling) কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ক্ষেত্রে সময় এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপাদানকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, কোটা নমুনায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে, যেমন—বয়স, লিঙ্গ, উচ্চ ও নিম্ন-দক্ষতাসম্পন্ন শিশু ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, এই গবেষণাকর্মে উপাত্ত সংগ্রহের পূর্বে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি অটিস্টিক শিশুর অভিভাবক ও স্কুল প্রধানের কাছে গবেষকের স্বাক্ষরসহ সম্মতিপত্র প্রদান করা হয়। এতে গবেষকের নৈতিক অবস্থান, গোপনীয়তার প্রক্রিয়া এবং গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে দিকনির্দেশনা ছিল, তা তাদের অবহিত করা হয়। অভিভাবক ও শিক্ষকদের শর্ত দেয়া হয় যে, এসব শিশুর কাছ থেকে যেসব উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে, তা কেবল গবেষক তাঁর কাজে ব্যবহার করবেন, অন্য কোথাও ব্যবহার করবেন না। অর্থাৎ, অংশগ্রহণকারী ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে সংগৃহীত সমস্ত উপাত্ত ও নাম গোপন রাখার বিষয়টি অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিশ্চিত করা হয়। ফলে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজটি অধিকতর সহজ হয়।

৪.৩ ব্যবহৃত উদ্দীপক ও পরীক্ষণ

অটিস্টিক শিশুর চিন্তা প্রধানত ইন্দ্রিয়প্রধান চিন্তা। সে কারণে তাদের অনুধাবন (perception) আক্ষরিক অনুধাবনের (literal perception) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে[১৭], সেটি

কখনও ধারণায়ন (conception) পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না। যেহেতু তারা ধারণায়ন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, তাই তারা স্বাভাবিক শিশুর মতো চারপাশ থেকে দ্রুত উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে অপারগ হয়। অটিস্টিক শিশুদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এই গবেষণায় এমন ভ্রান্ত ধারণা–বিষয়ক উদ্দীপক ব্যবহার করা হয়েছে। এসব উদ্দীপকের মাধ্যমে তারা কী প্রতিক্রিয়া করে এবং তারই ফলস্বরূপ কীভাবে তারা সেগুলোর প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে, তা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যা তারা প্রাত্যহিক জীবনে সবসময় দেখে থাকে বা ব্যবহার করে থাকে, উদ্দীপক হিসেবে এমন উপাদানই নির্বাচন করা হয়েছে।

এই পরীক্ষণে ৪টি মাটির তৈরি অবিকল আকৃতির ফল ও সবজি নির্বাচন করা হয়। ফল ও সবজিগুলোর রঙ প্রকৃত ফল ও সবজির অবিকল (দেখুন পরিশিষ্ট–১)। এছাড়া এদের আকৃতিও সমান নেওয়া হয়েছে এবং তারা এগুলো চিহ্নিতকরণে বিভ্রান্ত হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

৪.৪ সাক্ষাৎকার ও উপাত্ত সংগ্রহ প্রক্রিয়া

উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রতিটি শিশুর আলাদা সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। একসঙ্গে দুজন সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে বাছাই করা হয়নি। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর কাছে প্রশ্ন করার প্রক্রিয়াটি একই রকম রাখা হয় এবং উত্তরগুলো যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ ও ভিডিও করা হয়। অর্থাৎ সাক্ষাৎকার গ্রহণে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার জন্য একটা অভিন্ন নিয়ম মেনে চলা হয়। বর্তমান গবেষণাকর্মে অংশগ্রহণকারীরা সবাই যেহেতু অটিস্টিক শিশু, তাই তাদের ক্ষেত্রে নিবিড় সাক্ষাৎকার (indepth interview) গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ এতে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য অটিস্টিক শিশুদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন করার পর তাদের কাছ থেকে অনেক সময়ই পরিপূর্ণ উত্তর যেমন পাওয়া যায়নি, তেমনি এ সংক্রান্ত তাদের কোনো নিজস্ব মতামতও পাওয়া সম্ভবপর হয়নি। পাশাপাশি, সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় প্রশ্নকর্তা ও অংশগ্রহণকারীর মধ্যে যেমন একটি দ্বিপাক্ষিক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ক্ষণিকের জন্য হলেও তৈরি হয়, এক্ষেত্রে তা ঘটেনি। উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন করার পর শুধু প্রত্যাশিত উত্তর প্রাপ্তির জন্য যা করা দরকার তা-ই করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অনেকক্ষেত্রেই তাদের অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও কিছু সহায়ক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে উত্তর পেতে হয়েছে। কেননা, অটিস্টিক শিশু সুস্থ ও স্বাভাবিক মননের অধিকারী না হওয়ার ফলে এমনটি ঘটেছে। ফলে, এ গবেষণাকর্মে সম্পাদিত সাক্ষাৎকারকে 'নিবিড় সাক্ষাৎকার' না বলে শুধু 'সাক্ষাৎকার' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

একটি পরিচিত নীরব কক্ষে বিপরীতপাশে বসে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য, এই পরীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রধান শনাক্তকরণ পরীক্ষার পূর্বে অনুশীলন পরীক্ষা করা হয়। দুটি পর্বের মধ্যে ১মটি অনুশীলনমূলক পরীক্ষা ছিল এবং ২য়টি প্রধান পরীক্ষা ছিল।

অনুশীলন পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হয়েছিল তাদের নির্বাচন করা হয়নি। তাদের প্রত্যেককে ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়। এই পরীক্ষণটি করার জন্য। অটিস্টিক শিশুদের সামনে আলাদাভাবে ফল ও সবজিগুলো উপস্থাপন করা হয় এবং নিচের দুটি প্রশ্ন করা হয়।

১. এগুলোর নাম কী? এবং

২. এগুলো আসল ফল ও সবজি কিনা।

৫. ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

(নিচের সারণিতে ১, ২, ৩, ৪ দিয়ে যথাক্রমে কমলা, ডালিম, করলা ও কাঁচকলাকে নির্দেশ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তরে কী ধরনের সাড়া প্রদান করেছে তা নিচের টিকচিহ্ন (√) ও ক্রসচিহ্ন (X) দিয়ে বোঝানো হয়েছে, যেখানে প্রথমটি ১নং প্রশ্নের উত্তর ও ২য়টি ২নং প্রশ্নের উত্তর নির্দেশ করা হয়েছে।)

(সঙ্কেত : উদ : উচ্চ-দক্ষ, নিদ : নিম্ন-দক্ষ)

অংশগ্রহণকারী	১ (কমলা)	২ (ডালিম)	৩ (করলা)	৪ (কাঁচকলা)
১. নস (উদ)	√/√	X/√	√/√	√/√
২. সজ (উদ)	√/X	X/X	X/√	√/√
৩. মর (উদ)	√/ X	X/X	√/X	√/X
৪. আউ (উদ)	√/X	√/X	√/X	X/X
৫. মহ (উদ)	√/√	√/X	√/√	√/√
৬. শভ (উদ)	√/√	√/√	X/√	√/√
৭. ইফ (নিদ)	√/√	X/√	X/√	√/√
৮. শব (নিদ)	X/√	X/√	√/X	√/X
৯. সন (নিদ)	√/X	√/X	X/X	X/√
১০. অয় (নিদ)	√/√	√/√	√/√	√/√

সারণি-১: উচ্চ ও নিম্ন-দক্ষ শিশুদের দক্ষতার পরিমাপ

ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে অটিস্টিক শিশুর মানসিক সামর্থ্য কেমন—সেটি পরিমাপ করার জন্য ব্যারন-কোহেন[১৮] একটি মিথ চরিত্রকে নির্বাচন করেন। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় ভ্রান্ত

উপলব্ধি–সম্পর্কিত যে পরীক্ষণটি করা হয়েছে, সেটি আসলে পৌরাণিক বা মিথ চরিত্রের কোনো ঘটনাপ্রবাহ নয়। এই পরীক্ষণটি করা হয়েছে একজন শিশুর বাস্তব জীবনের কিছু উপকরণ নিয়ে, যা সে প্রতিদিন দেখে। অর্থাৎ, এই সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা আছে। শিশুরা এগুলো খায় এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে, যাকে শারীরিক মূর্তকরণ (embodiment) বলা হয়ে থাকে। একই বস্তু যে অভিন্নভাবে নির্মাণ করা যায়, কিন্তু অবিকলভাবে নির্মাণ করা গেলেও সেগুলো যে প্রকৃত বস্তু নয়, তা অটিস্টিক শিশুরা কতটুকু বুঝতে সমর্থ, তা জানতে চাওয়া হয়। উল্লিখিত পরীক্ষণের মাধ্যমে যে ফলাফল উপস্থাপন করা হয় তাতে লক্ষ করা যায়, অটিস্টিক শিশুরা এসব বস্তুর সঙ্গে পরিচিত থাকা সত্ত্বেও অনেকেই তা বুঝতে অসমর্থ হয়েছে। এই সারণি থেকে দেখা যায়, মোট ১০ জন অটিস্টিক শিশুর প্রত্যেককে মোট ৪টি ফল ও সবজি দেখানো হয়। সে অর্থে এই পরীক্ষণে ব্যবহৃত মোট প্রদর্শনের সংখ্যা হচ্ছে ৪০। এই ৪০টি উদ্দীপকের মধ্যে তারা মাত্র ২৮টি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে, শতকরা হিসেবে এর দক্ষতার হার মাত্র ৭০%। বাকি ১২টি প্রদর্শিত উদ্দীপকের নাম বলতে তারা ব্যর্থতা দেখিয়েছে। ভ্রান্ত উদ্দীপকের নাম শনাক্তকরণে শিশুদের দক্ষতার পরিমাপ নিচের গ্রাফচিত্রে দেখানো হলো :

চিত্র-১ : ভ্রান্ত উদ্দীপকের নাম শনাক্তকরণে অটিস্টিক শিশুদের দক্ষতার পরিমাপ

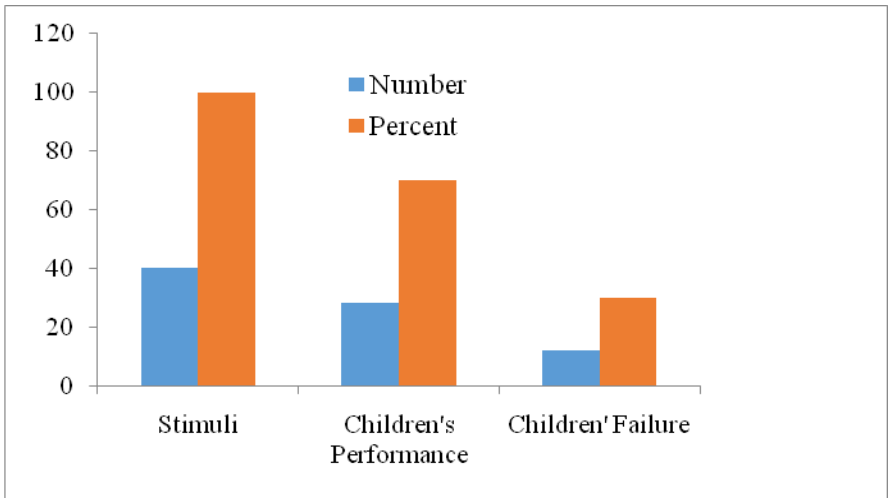

এই পরীক্ষণে ২ নম্বর প্রশ্নটি তুলনামূলকভাবে কঠিন ছিল। অর্থাৎ ফল এবং সবজিগুলো আসল না নকল তা পরীক্ষা করা। এক্ষেত্রে উচ্চ-দক্ষ ও নিম্ন-দক্ষ উভয় ধরনের অটিস্টিক শিশুই ফল ও সবজির নাম শনাক্তকরণের তুলনায় বেশি ব্যর্থতা দেখিয়েছে। উচ্চ-দক্ষ শিশুদের দক্ষতার পরিমাণ ছিল ৬০%। নিচের গ্রাফচিত্রে (দেখুন চিত্র-২) তা রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

চিত্র-২ : ভ্রান্ত উদ্দীপক শনাক্তকরণে অটিস্টিক শিশুদের দক্ষতার পরিমাপ

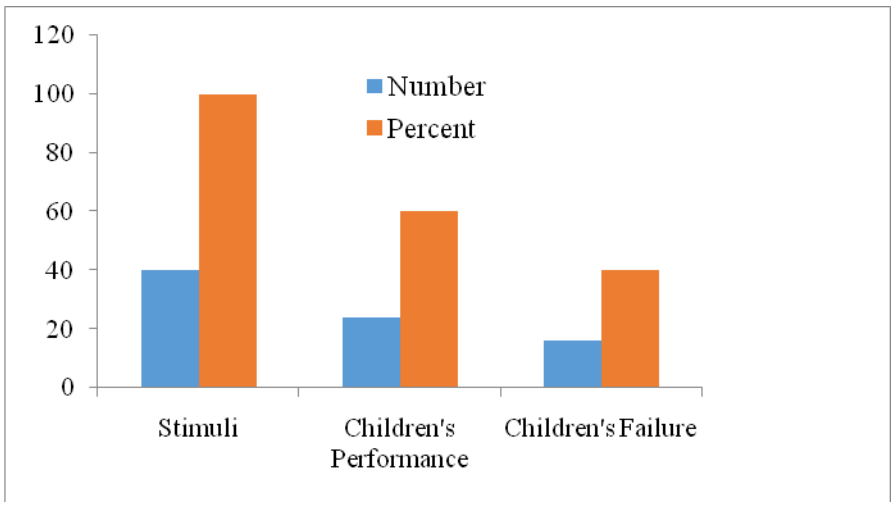

এই পরীক্ষণে আরও দেখা যায় যে, উচ্চ-দক্ষ অটিস্টিক শিশু প্রতিমাচিহ্ন (iconic sign) বা বস্তু শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা দেখিয়েছে। কিন্তু ফলগুলোর নাম তারা সঠিকভাবে বলতে সক্ষম হলেও সেগুলো আসল না কৃত্রিম তা বলতে তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, উভয় পরীক্ষায় ছেলে শিশুর চাইতে মেয়ে শিশুরা অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। তাদের ব্যর্থতার কারণ হিসাবে বলা যায় যে, এই বস্তুগুলো যে ভ্রান্ত তা শনাক্তকরণের জন্য তাদের যে জ্ঞানমূলক উপলব্ধি (cognitive ability) দরকার, সেটি তাদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি। এছাড়া এসব শিশুর মনোগত তত্ত্বের ঘাটতি রয়েছে এবং এই ঘাটতি থাকার কারণে তারা তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। এই পরীক্ষণের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়েছে।

৬. ফলাফল পর্যালোচনা

একই বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে আমরা যা উপলব্ধি করি, অটিস্টিক শিশুরা সেই বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে কী উপলব্ধি করে— সেটি জানার জন্যই মূলত এই পরীক্ষণটি করা হয়। পাশাপাশি, একই বস্তু বা পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা যে আলাদাভাবে চিন্তা করি এবং অটিস্টিক শিশুরা কীভাবে সেগুলোকে দেখে থাকে এবং সেগুলো ভাবনার জন্য যে মনোগত তত্ত্ব বা মানসিক সামর্থ্য প্রয়োজন, অটিস্টিক শিশুর মধ্যে তা আছে কিনা সেটি যাচাই করা হয়। অটিস্টিক শিশুর ভাবনা কি স্বাভাবিক শিশুর থেকে আলাদা? সেই আলাদা ভাবনার স্বরূপটি কেমন? সে তার জগৎ থেকে কীভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে? এছাড়া তাদের যাঁরা ভাষা শিখাতে সহায়তা করেছেন তাঁরা এসব শিশুকে কী শিখিয়েছেন? উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে ভ্রান্ত ধারণার পরীক্ষণটি করা হয়।

যে কোনো পরীক্ষণের জন্য উদ্দীপক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অটিস্টিক শিশুদের ক্ষেত্রে সেসব উদ্দীপক বাছাই করা হয়, যেগুলো এসব শিশু প্রাত্যহিক জীবনে সবসময় দেখে থাকে এবং যা খুবই সাধারণ। একটি জিনিসের বহু রূপ থাকতে পারে। প্রকৃত বস্তুকে আমরা যেমন দেখি, ঠিক তেমনিভাবে সেই বস্তুগুলোকে বিভিন্ন উপাদান ও রং দিয়ে অবিকলভাবে তৈরি করতেও পারি। কারণ আমাদের মস্তিষ্কের বুদ্ধিমত্তার একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে। সে ক্ষমতা দিয়ে আমরা এই কৃত্রিম বস্তুগুলোকে প্রথমে না চিনতে পারলেও পরে যখন সেই বস্তুগুলোতে হাত দিয়ে স্পর্শ করি তখন আমরা বুঝতে পারি। আমাদের যে ৫টি ইন্দ্রিয় (কান, নাক, চোখ, ত্বক, জিহ্বা) আছে সেসবের মাধ্যমে আমরা আলাদাভাবে তা অনুভব করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, পরিচিত কোনো ব্যক্তির কথা যদি দীর্ঘদিন পরেও শুনি তাহলে আমরা তা বুঝতে পারি। কারণ আমাদের কানের একটি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, যা অন্য শব্দ থেকে আলাদাভাবে শুনতে সাহায্য করে। যে শব্দগুলো আমরা সবচেয়ে বেশি শুনি সেগুলো আমাদের সংবেদনে দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ হয় এবং পরবর্তীকালে সেটি স্থায়ী হয়ে যায়। অন্যদিকে, চোখ দিয়ে বেশি বেশি দেখার কারণে মস্তিষ্কে যে সংবেদন স্নায়ু আছে, যেখানে তা স্থায়ী হয়ে যায়। চোখ, নাক বা কান আমাদের বিভ্রান্ত করলেও ত্বক দ্বারা আমরা বিভ্রান্ত হই না। কারণ চোখ দিয়ে আমরা কিছু ভুল দেখতে পারি, কান দিয়ে ভুল শুনতে পারি, নাক দিয়ে ভুল গন্ধ অনুভব করতে পারি। কিন্তু ত্বক দিয়ে আমরা কোনো বস্তু আসল না নকল, তা সঠিকভাবে অনুভব করতে পারি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ৫টি ইন্দ্রিয় আমাদের নতুন একটি জিনিস চেনাতে এবং পরে তা মস্তিষ্কে ছাপ তৈরি করতে সাহায্য করে। পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতা দিয়ে কোনো বস্তু বা ঘটনা যথার্থ কিনা তা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে। কিন্তু অটিস্টিক শিশুদের মনোগত তত্ত্বের তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি থাকার কারণে চারপাশের বস্তু ও অবস্থা সম্পর্কে উপরিউক্ত স্বাভাবিক বোধ, অনুভূতি এবং এগুলোর শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে কাজ করে না। তাই তারা বস্তু–সম্পর্কিত উল্লিখিত 'ভ্রান্ত ধারণা' পরীক্ষণে শতভাগ সফলতা দেখাতে পারেনি।

এই পরীক্ষণে একই আকৃতির যে ৪টি উদ্দীপক নির্বাচন করা হয়েছে যেগুলো প্রকৃত ফল ও সবজি নয়। এই ফল ও সবজিগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, দেখলে মনে হবে সেগুলো যেন প্রকৃত ফল ও সবজি। তাই এগুলো দেখে যে কেউ বিভ্রান্ত হতে পারে। তবে এসব উদ্দীপকের যে গঠনগত অবস্থা, তা যে কেউ স্পর্শ করে বুঝতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, কমলার যে গঠনগত অবস্থা অর্থাৎ ফলটি পাকলে একটু নরম হয়, যা আমাদের পূর্বের তথ্যকে নতুন তথ্যের সঙ্গে মেলাতে সাহায্য করে এবং তা চেনাতে সঙ্কেত দেয়। অর্থাৎ একজন ৩/৪ বছরের স্বাভাবিক শিশু প্রথমে দেখে না বুঝতে পারলেও হাত দিয়ে স্পর্শ করে বুঝতে পারে এটি প্রকৃত কমলা না। একজন শিশুর ৪ বছর বয়স খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। চার বছরে তার চিন্তা-চেতনা বিকশিত হয়, তার পঞ্চেন্দ্রিয় এবং সমস্ত জ্ঞানভিত্তিক সামর্থ্য পূর্ণ হয়। ফলে ৪ বছরের পর একজন স্বাভাবিক শিশু একটি জিনিস আসল না নকল, তা সে বুঝতে পারে এবং

আলাদা করতে পারে। যেহেতু মনোগত তত্ত্বের ঘাটতির কারণে অটিস্টিক শিশুর জ্ঞানগত প্রক্রিয়া স্বাভাবিক শিশুর মতো সুসংগঠিত নয়, সেহেতু তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুর ভ্রান্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণে তারা ঘাটতি দেখিয়েছে।

সব মিলিয়ে, ওপরের পরীক্ষণের পরিচিত বস্তুর ভ্রান্তরূপ প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুদের মনোগত সামর্থ্যের পরিমাপ করা হয়েছে। জগতের প্রতিটি বস্তুই চিহ্ন। বিশেষ করে বস্তু আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে শিশুরা চিহ্ন হিসেবেই তাদের জ্ঞানক্ষেত্রে তা ধারণ করে। অটিস্টিক শিশুরা এক্ষেত্রে প্রতিমা চিহ্ন বা ছবি দ্রুত আয়ত্ত করতে পারলেও প্রতীকী চিহ্ন তথা শব্দ অর্জন বা শেখার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি দেখিয়েছে। আবার একই বস্তুর যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হতে পারে অর্থাৎ (ভ্রান্ত উদ্দীপক) ফল ও সবজিগুলো যে স্বাভাবিক ফল ও সবজি নয়, তা তারা বুঝতে পারেনি। এক্ষেত্রে তাদের মনোগত বিকাশ যে স্বাভাবিক শিশুদের মত নয়, এই পরীক্ষণে তা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ ১৫-১৬ বছরের স্বাভাবিক শিশুরা এই পরীক্ষণে ৯০ থেকে ১০০ ভাগ সফল হতো, এটি সহজেই অনুমেয়। এছাড়া এই পরীক্ষণের মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুর মানসিক পরিপক্বতা কেমন তা যাচাই করা হয়। যেহেতু জগতের প্রতিটি বস্তু এক একটি চিহ্ন, সে কারণে প্রতিটি বস্তুকে এক একটি চিহ্ন হিসাবে দেখতে হয়। এক্ষেত্রে অটিস্টিক শিশু প্রতিমাচিহ্ন দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে, কারণ সবসময় তারা সেগুলো দেখে থাকে। অন্যদিকে, প্রতীকীচিহ্ন আয়ত্তীকরণে তারা ঘাটতি প্রদর্শন করে। কারণ চিহ্ন এবং নির্দেশিত বস্তু (referent)-র মধ্যে সাদৃশ্য নেই। সে কারণে উভয় ধরনের অটিস্টিক শিশু তা আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি দেখিয়েছে। এই ভ্রান্ত উপলব্ধি পরীক্ষণের ক্ষেত্রে সেটিই পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণ করা হয়।

৭. উপসংহার

বস্তুত চিন্তার উপাদানই হলো ধারণা। কোনো মূর্ত বা বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে যে ধারণা বা প্রত্যয় হয়, তা থাকে মানুষের মনে। সেই ধারণাগত জ্ঞান বা প্রত্যয় অন্যের কাছে কথা বলার মধ্য দিয়ে অর্থপূর্ণ করতে হয়[১৯]। জগৎ সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে ধারণার জন্য কেবল অনুধাবনই যথেষ্ট নয়, অনুধাবনের সঙ্গে প্রয়োজন ধারণায়ন, যা মানুষ বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বিচার করার সামর্থ্য রাখে। অটিস্টিক শিশুর মধ্যে উল্লিখিত মনোগত অবস্থাসমূহের ঘাটতির কারণে তারা জগৎ সম্পর্কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় এবং অন্যরা কীভাবে উপলব্ধি করে সেটিও তারা সম্পূর্ণরূপে অনুধাবনে ও প্রকাশে অপারগ হয়। সে কারণে ব্যারন-কোহেন[২০] বলেন, অটিস্টিক শিশুদের মন বিষয়ে অন্ধতা (mind blindness) আছে। মনের এই অন্ধতার জন্য অধিকাংশ অটিস্টিক শিশুর বস্তুজগৎ ও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত ধারণা–সম্পর্কিত জ্ঞানগত প্রক্রিয়া স্বাভাবিক শিশুর মতো সুসংবদ্ধ ও কার্যকর নয়, যার প্রতিফলন তাদের বস্তু শিখন প্রক্রিয়া ও ভাষিক প্রকাশেও লক্ষ করা যায়।

টীকা

ক. উল্লেখ্য যে, এই প্রবন্ধে প্রচলিত অর্থে 'স্বাভাবিক শিশু' বলতে তাদের বোঝানো হয়েছে, যারা সুস্থ মনের অধিকারী। যেহেতু অটিস্টিক শিশুরা সম্পূর্ণভাবে সুস্থ মনের অধিকারী নয়, সেজন্য স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় মানসিক অবস্থার দিক দিয়ে তারা কতটা দূরবর্তী সেটিই এ প্রবন্ধে বোঝানো হয়েছে। এখানে সুস্থ মনের অধিকারী শিশুদের প্রচলিত অর্থে 'স্বাভাবিক শিশু' বলা হলেও অটিস্টিক শিশুদের 'অস্বাভাবিক' বোঝানো হয়নি।

খ. এই প্রবন্ধে বাংলাভাষী অটিস্টিক শিশুর প্রকাশমূলক ভাষা (expressive language)-র মাধ্যমেই মনোগত তত্ত্বের প্রকৃতি জানা সম্ভব হয়েছে। যেহেতু এই প্রবন্ধে অটিস্টিক শিশুর 'ভ্রান্ত ধারণা' (false belief) পর্যবেক্ষণ দক্ষতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেহেতু ভাষিক দক্ষতার দিকসমূহের তুলনায় মনোগত তত্ত্বের দিকটি অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

তথ্যপঞ্জি

১. Miller, C. A. (2006). 'Developmental Relationships between Language and Theory of Mind', *American Journal of Speech-Language Pathology*, Vol.15, pp. 142-154

২. Abu-Akel, A. (2003). 'A neurobiological mapping of theory of mind', *Brain Research Reviews*, Vol. 43, pp. 29-40

৩. Miller, C. A. *Ibid*, pp. 142-154

৪. Dunn, J., Brown, J., Slomkowski, C., Tesla, C., & Youngblade, L. (1991). 'Young children's understanding of other people's feelings and beliefs : Individual differences and their antecedents', *Child Development*, Vol. 62, 1352–1366

৫. দেবনাথ, দেবব্রত ও দেবনাথ, আশিষকুমার, *ব্যতিক্রমধর্মী শিশু ও তার শিক্ষা*, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৯৫

৬. Zaman, N. et al, (2013). 'Survey of Autism and Neurodevelopmental Disorders in Bangladesh', http://www.hsmdghs-bd.org/SKB-0403%20Survey%20of%20 Autism%20and%20Neuro-developmental%20Disorders_Autism%20Survey.htm, 10

৭. *Global Autism – Bangladesh (2011)*, U.S. Department of Health and Human Services: NIH Pubication No. 11-5511

৮. আরিফ, হাকিম ও নাসরীন, সালমা, *আমাদের অটিস্টিক শিশু ও তাদের ভাষা*, ঢাকা, ২০১৩ পৃ. ৪৩

৯. Baron-Cohen, S. (2000). 'Autism and "theory of mind": An introduction and review,' Communication, Summer, pp. 9–12

১০. Tomasello, M., & Farrar, M. J. (1986). 'Joint attention and early language', *Child Development*, p. 57, 1454–1463

১১. Tager-Flusberg, H., & Joseph, R. (2001, April). What are the relationships between performance on false belief tasks and executive functions in children with neurodevelopmental disorders? In meeting of the Society for Research in Child Development, Minneapolis, MN.

১২. Farrar, M. J., & Maag, L. (2002). 'Early language development and the emergence of a theory of mind'. *First Language*, p. 22, 197–213

১৩. Tager-Flusberg, H., & Joseph, R. *Ibid*.

১৪. Baron-Cohen, S. *Ibid*. 9–12

১৫. Baron-Cohen, S., Leslie, A..M. & Frith, U. (1985). 'Does the autistic child have a "theory of mind"?' *Cognition*, Vol. 21. pp. 37-46

১৬. American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed, DSM-IV.). Washington, DC: America

১৭. Bogdashina, O. (2005). *Communication Issues in Autism and Asperger Syndrome Do We speak the same language?*, London and Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers. p. 44

১৮. Baron-Cohen, S. *Ibid*, 9–12

১৯. মুহিত, মোঃ আব্দুল, *ভাষা ও দর্শন*, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৫

২০. Baron-Cohen, S. *Ibid*, 9–12

পরিশিষ্ট–১

ভ্রান্ত বিশ্বাস–সম্পর্কিত পরীক্ষণ–বিষয়ক উদ্দীপক

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ছত্রিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/জুন ২০১৮

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প : প্রকৃতির পটে অন্তর্লোকের উন্মোচন

শামীমা সুলতানা*

সারসংক্ষেপ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৩) বিশ শতকের চল্লিশের দশকের লেখক। তিনি যখন সাহিত্য অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করেন তখন মূলত পালাবদলের কাল। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, বিদেশি শক্তির শোষণ, দেশভাগজনিত আঘাত– ফলে কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের ভেঙে পড়া মূল্যবোধ, সমাজের অবক্ষয়, অসুস্থতা, অস্তিত্বের সংকট ইত্যাদি থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে কলম হাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নির্জনতাপ্রিয় অন্তর্মুখী শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আত্মমগ্ন হয়ে দিনরাত চুপ করে বসে ভাবতে ভালোবাসতেন। পঞ্চাশ বছর ধরে লিখেছেন কিন্তু কোনো গোষ্ঠীতে তিনি অন্তর্ভুক্ত হননি। তিনি কোনো সমাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হননি। তাই সাহিত্যকে সমাজ বিশুদ্ধকরণের একমাত্র ব্যবস্থাপত্র মনে করেননি। আশৈশব প্রকৃতিসংলগ্নতা তাঁকে আজীবন প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে আদ্যন্ত বিমোহিত করে রেখেছিল– যা তাঁকে পরবর্তী জীবনে সাহিত্যসৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। প্রকৃতিকে পটভূমিতে রেখে তিনি নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়নের পাশাপাশি মানবসত্তার অন্তর্লোকের উন্মোচন করেছেন বারবার। তাঁর গল্পের অবয়বে আদ্যন্ত জড়ানো রয়েছে প্রকৃতির আবরণ, তবে তার পাশাপশি মানবপ্রকৃতি, মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অস্তিত্ব, মানবমনের অন্তর্লোকের সংকট– কিছুই বাদ পড়েনি। মানবমনের অনুসন্ধানে কোথাও কোথাও প্রকৃতি নিজেরই চরিত্র হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক বিন্যাস নানান তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চৈতন্যের সমন্বয় ঘটিয়ে এক অন্যতর জগতে নিয়ে যান জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। এভাবে গল্পকার হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী হয়ে উঠেছেন বিশিষ্ট আর স্বতন্ত্র।

বাংলা ছোটগল্প ধারায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সৌন্দর্যপিয়াসী অন্তর্মুখী শিল্পী। সৌন্দর্যসন্ধান তাঁর গল্প সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিশ শতকের চল্লিশের দশকের লেখক। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে বাংলার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মহিমার অবসান, নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের ভেঙে–পড়া মূল্যবোধ, সমাজের অবক্ষয়, অস্তিস্তের সংকট, বিপর্যয়, ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি– এ সব থেকে মুখ ফিরিয়ে অর্থাৎ বাস্তব দৃশ্য ছাড়িয়ে ব্যক্তিজীবনে ও সাহিত্যজীবনে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অন্তর্লোকে উত্তরণ। শ্রেণিভুক্ত মানুষ অপেক্ষা ব্যক্তি-মানুষের স্বভাব, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের প্রয়াস, সাফল্য, স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা, ব্যর্থতা,

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

নিজস্ব সম্পূর্ণতায় বিশিষ্ট মানুষকেই তিনি দেখতে ও দেখাতে চান। সৌন্দর্যের সামগ্রিকতা ও ব্যক্তি নিরপেক্ষতায় তাঁর আগ্রহ। তবে প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তিনি কোনো সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারেন না। তাঁর শিল্পচেতনায় নারীর শরীর ভোগের সামগ্রী নয়, সৌন্দর্যের আধার। সৌন্দর্যসন্ধানী এই শিল্পী গভীর সহানুভূতি থেকে তাঁর গল্পে প্রকৃতিকেন্দ্রিক অসংখ্য চিত্রকল্প এঁকেছেন। প্রকৃতির প্রতি মোহগ্রস্ততা থেকে তাঁর গল্পে উঠে আসে নানা গাছ-গাছালি, পোকা-মাকড়, পাখ-পাখালি, সমুদ্র-নদী, ফুল-ফল, বৃষ্টির রং। প্রকৃতি যে তার সর্বগ্রাসী ছায়া বিস্তার করে নর-নারীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে পারে, তেমনি প্রকৃতি তার বিশাল অস্তিত্ব নিয়ে নর-নারীর অস্তিত্বকে বিপন্ন ও অসহায়ও করে তোলে, তা তাঁর গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। কখনো বা প্রকৃতির পটে বিন্যস্ত চরিত্রগুলোর সৌন্দর্যের অনুপুঙ্খ বর্ণনার পাশাপাশি নারীর অন্তর্মহলে বিচ্ছিন্নতাজনিত অপ্রাপ্তি, আত্মরতি অথবা রতিবিলাস এবং প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে নারী-পুরুষ ও শিশুর অন্তর্লোকের জটিল মনস্তত্ত্ব উন্মোচন করেছেন গল্প-পরম্পরায়। বলাবাহুল্য, পরিবেশ-বর্ণনা ও পটভূমি-চিত্রণের জন্য প্রকৃতির বর্ণনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সাহিত্যেও তা লক্ষণীয়। তবে প্রয়োগ-দর্শনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন, সাহিত্যে প্রকৃতির প্রভাব থাকা অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ। এর কারণ সম্পর্কে তাঁর মত হলো, সভ্যতার জন্মলগ্নেই অরণ্য-প্রকৃতির পরিবেশে লালিত হয়েছে বলে স্বভাবত মানুষের জীবনের নানা ব্যাপারে প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। প্রকৃতি ও মানুষের যোগাযোগ ব্যক্তি প্রচেষ্টার ফল নয়। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকেই যুগে যুগে সাহিত্য ও জীবনাচরণে প্রকৃতি ও মানুষ মন একাকার হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতি মানুষের আত্মীয়। আত্মীয় সকল ক্ষেত্রেই মানুষের প্রিয়জন হবে তা নাও হতে পারে। বরং মানুষের জীবনে প্রকৃতি সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রকৃতির অবস্থান উল্লেখ করতে গিয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন,

> রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মানবজীবন কত বিচিত্ররূপে প্রকৃতির টানাপোড়েনে বোনা হয়ে গেছে। মানবজীবনের মধ্যে প্রকৃতি জগতের লীলাকে যেন রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন। অথবা বলা যায়, মানুষের হাসি-কান্নার বহুবিচিত্র অভিব্যক্তিকে কবি লক্ষ্য করেছেন প্রকৃতির নানা পরিবর্তন, আলোড়ন ও আন্দোলনের, তার নানাবিধ রূপ-রস-গন্ধ ও শব্দ তরঙ্গের মধ্যে। তাঁর ছোটগল্প মানুষ প্রকৃতির দিকে প্রসারিত। পক্ষান্তরে, বহুস্থানে প্রকৃতিকেও মানবীয় গুণে বিভূষিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে দেখি।[১]

রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি', 'একরাত্রি', 'মহামায়া' প্রভৃতি গল্প পুরোপুরিভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশের ঐক্যে সৃষ্টি। এ সকল গল্পে প্রকৃতি মূল চালক, সংগঠক, পরিণামদায়ী শক্তি। প্রকৃতির হাত দিয়েই গল্পগুলোর অন্তরচিত্রণ ও পরিণতি।[২]

গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতিতে শহুরে মানুষের কৃত্রিম ভোগবিলাসের ও অর্থনৈতিক সাচ্ছল্যের ঊর্ধ্বে এক বিশুদ্ধ ইঙ্গিত আনন্দানুভূতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বিভূতিভূষণের গল্পে দেখা যায়। তাঁর 'নদীর ধারে বাড়ি', 'সীতানাথের বাড়ি ফেরা', 'বুধীর বাড়ি ফেরা', 'দ্রবময়ীর কাশীবাস', 'বংশলতিকার

সন্ধানে' ইত্যাদি গল্পে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে জ্যোতিরিন্দ্রের প্রকৃতি যেভাবে মানুষের সাথে কথা বলে সে-রকম সম্পর্ক বিভূতিভূষণের গল্পে দেখা যায় না। উজ্জলকুমার মজুমদার বলেন,

> প্রকৃতি মানুষের মতোই দ্রষ্টা, ভোক্তা এবং সাধারণভাবে সংবেদনশীল। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ যেমন নিজেকে উন্মুক্ত করে, প্রকৃতিও তেমনি মানুষকে দেখে– তার উন্মোচন দেখে– মুগ্ধ হয়, বিস্মিত হয়, বিমর্ষ বা দুঃখিত হয়। প্রকৃতিকে এইভাবে মানবিক করে তোলা ঠিক বিভূতিভূষণে নেই। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি এক জীবন্ত অস্তিত্ব ঠিকই। কিন্তু সে প্রকৃতির বেশির ভাগটাই মানুষের দিক থেকে দেখা...মানুষ ও প্রকৃতি এক হয়ে উভয়েই উভয়ের কাছে আস্বাদ্য হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে।[৩]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রায় দুবছর আগে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে। সংগতকারণেই ঘটে যাওয়া দুটি বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, নাগরিক সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন মানুষের চেতনা বা মূল্যবোধের অবক্ষয়, নিঃসঙ্গতাবোধ, প্রেম-অপ্রেম-যৌনতার সমাজবাস্তবতাজাত অভিজ্ঞতা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে বিধৃত হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যচর্চার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র অবস্থা থেকেই স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় আবৃত্তিতে অংশ নেন এবং পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর ভাষ্যমতে–

> কে জানে, সেই থেকে আমার সাহিত্য প্রীতি, শিল্পকলার দিকে ঝোঁক আরম্ভ হলো কিনা! আস্তে আস্তে পরীক্ষা দিয়ে ওপর ক্লাসে উঠছি। প্রতি বছর পুরস্কার-বিতরণী সভায় আবৃত্তি করে করে অনেক কবিতা মুখস্থ করা হলো। রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস রায়, কুমুদ মল্লিক, সুকুমার রায়, কামিনী রায়–এঁদের কবিতার সঙ্গে ভালো করেই আমার পরিচয় হয়ে গেল। তখন নিজে নিজেই আমার ছোট খাতায় কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছি। সেই আমার সাহিত্যচর্চার হাতে খড়ি।
>
> একবার পুরস্কার বিতরণী সভায় আবৃত্তি করে রবীন্দ্রনাথের একখণ্ড গল্পগুচ্ছ উপহার পেলাম। পড়তে গিয়ে বিস্ময়ে কৌতূহলে আনন্দে প্রাণ পূর্ণ হয়ে উঠলো। মনে হলো, এই জিনিস আমি শৈশব থেকে খুঁজছিলাম– ছোটগল্প। তারপর থেকে লেগে গেলাম ছোটগল্প লিখতে। গেল কবিতা– প্রথম গদ্যের স্বাদ পেলাম আমি যখন অষ্টম মানের ছাত্র।[৪]

ঢাকার সাহিত্যের কাগজ *সোনার বাঙলা*, *বাঙলার বাণী* তারপর প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত কলকাতার *সংবাদ* ও *নবশক্তি* কাগজে একটার পর একটা লিখতে থাকেন তিনি। এছাড়া পূর্বাশা, চতুরঙ্গ, দেশ প্রভৃতি কাগজে নিয়মিত লিখতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে ১৯৩৮ সালে পরিচয় ত্রৈমাসিক পত্রিকায় 'নদী ও নারী' গল্পটি লিখে কলকাতার বৃহত্তর সাহিত্য সমাজে *পরিচিতি* লাভ করেন। তাঁর সমসাময়িক লেখক বিমল মিত্র (১৯১২-১৯৯১), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭-১৯৭৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৭-১৯৭০), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫) প্রমুখ। তাঁরা কোন দলভুক্ত বা গোষ্ঠীভুক্ত না হয়ে নিজ নিজ সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে গিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মন্তব্য :

> ওই সময় আমাদের মধ্যে ঈর্ষা হিংসা বলে কিছু ছিল না। কল্লোলযুগের পরবর্তী এই চার-পাঁচজন লেখক আমরা কোনোরকম দল না করে যে যার মতোন করে লিখে গেছি। ওটাই একটা নব্য সাহিত্য আন্দোলনে রূপ নেয়। সুতরাং, দল বেঁধে বা গোষ্ঠী করে সাহিত্য না করেও সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়– আমরা হয়তো তার কিছুটা প্রমাণ রাখতে পেরেছি।[৫]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর উপন্যাস-গল্প নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সাহিত্য রচনার প্রথম থেকেই ছিলেন প্রসঙ্গ ও প্রকরণ– উভয় ক্ষেত্রেই একজন নিষ্ঠাবান, সচেতন পরীক্ষক ও নিরীক্ষক। একজন লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই লেখেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও তাঁর অভিজ্ঞতা অর্থাৎ তাঁর জীবন-যাপন, মেলামেশা, শিক্ষা, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দেশজ রূপ, ঐতিহ্য সেই সঙ্গে কল্পনা ও দূরদৃষ্টিকে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর সৃষ্টি সম্ভারে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অভিজ্ঞতানির্ভর লেখক; তাঁর গল্পে চরিত্রগুলোকে প্রত্যক্ষ বস্তুজগৎ থেকে সংগ্রহ করে তাঁর দর্শন, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সৌন্দর্যচেতনা দিয়ে তাদের নিজস্ব শিল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রতিটি গল্প-উপন্যাসেই আদ্যন্ত জড়িয়ে আছে প্রকৃতি। প্রকৃতি ও মানবমন ওতপ্রোতোভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে তাঁর লেখায়। তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলোর উপান্তে চমকসৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায়। এ ধারার গল্পের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'নদী ও নারী'।

পদ্মার বিস্তৃত পটভূমি, অগাধ আকাশ, ছায়ানিবিড় শ্যামল সমতল তট, জল আর স্থলের সংযোগস্থলে গল্পটির সূচনা ও সম্প্রসারণ। সুরপতি-নির্মলা স্বামী-স্ত্রী, পদ্মার বুকে বেড়াতে বেড়াতে যে ছায়াস্নিগ্ধ তীরে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের গুঁড়িতে নৌকো বাঁধে তার অদূরে আগে থেকেই একটি সুদৃশ্য সাদা বোট দাঁড়িয়েছিল। বোটের ভিতর এক রহস্যময়ী। গতানুগতিক সংস্কার না মেনে বিবাহিত হয়েও মাথায় কাপড় না দিয়ে শাড়ি পরে, সম্রাজ্ঞীর মতো বোটের ছাদ আলো করে বঁড়শি ফেলে মাছ ধরতে বসে, 'বব্‌ডকাটা' চুলের মেমসাহেবটি। পচা ডিমের জন্য ডিমওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে। রাতে সস্তা থিয়েটারি গলায় গান ধরে। সুরপতি-নির্মলা কৌতূহল নিয়ে দূর থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করে। কখনো 'ফ্যাশানের ফানুস', 'ফাঁপা বেলুন', বব্‌ডকাটা চুল 'যেন কচি খুকী', 'রণরঙ্গিণী', 'উড়নচণ্ডী', আবার থিয়েটারি গলা শুনে ভেবে-চিন্তে স্বস্তি পায় না – 'এ কোন জাতের মেয়েমানুষ'। গান থেমে গেলেও গানের রেশটা কুৎসিত সরীসৃপের মতো নির্মলার কানের কাছে কিলবিল করে। মোট কথা, তার চালচলন দেখে সুরপতি-নির্মলা শিউরে ওঠে, নোংরা ইঙ্গিত করে।

কোমরে আট করে জড়ানো আঁচল, হলদে ছোঁপ দেওয়া শাড়িতে মেয়েটাকে দেখাচ্ছিল একটা চিতাবাঘের মতন। মেয়েটির সঙ্গে তাদের আলাপ হলো চরে বেড়াতে গিয়ে। রাইফেল হাতে পাখি শিকারের চেষ্টা করা মেয়েটি নিজেই এসে আলাপ করলো সুরপতি-নির্মলা দম্পতির সঙ্গে। নিজের বোটে নিমন্ত্রণ জানাল। একটি নারীর অবয়বগত কাঠামো জানিয়ে দিয়েছে তার চারিত্রিক গঠন। লেখক জানান দেন :

> দীর্ঘছন্দ নিটোল নিভাঁজ গড়ন, 'চিবুক দু-দিকে ঈষৎ চাপা', 'পুরুষের মতন, একটু ধারালো, শক্ত'। মধ্যাহ্নের আকাশের মতন স্বচ্ছ প্রখর চাউনি। শিস দিতে দিতে বালির উপর দিয়ে তরতর করে সে চরের ওদিকটায় নেমে গেল। ছোট ডিঙি, কেউ নেই সঙ্গে, নিজের হাতে বৈঠা ফেলে দেখতে দেখতে মাঝ নদীতে ভেসে পড়ল।[৬]

তা দেখে নির্মলা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে কারণ মাঝনদী পেরোতে নির্মলার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল দুজন পুরুষসঙ্গী পাশে থাকা সত্ত্বেও।

সুরপতি-নির্মলা মেয়েটির ব্যাপারে যতই বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণা পোষণ করুক, বোটের ভিতরে একবার উঁকি না দিয়ে তারা পারল না। বোটের ভিতরের সংসার পরিপাটি করে সাজানো। একটি খাট, সেখানে শুয়ে এক পঙ্গু স্বামী যার একটি হাত নেই, তার মুখেই প্রথম মেয়েটির নাম আমরা জানতে পারি– নীলিমা। মেয়েটির স্বামী চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন; বিয়ের প্রথম বছরেই একটি ক্রেনে কাটা পড়ে তিনি পঙ্গু, অসহায়, বুকেও দোষ এবং নার্ভে চোট লেগে অন্ধ চলৎশক্তিহীন। ডাক্তারের আদেশে তিন বছর ধরে জলে জলে ভেসে বেড়ায়। এই স্বামীর সঙ্গে বাঁধা নীলিমার জীবন, তার স্বপ্নের সীমারেখা যেন এখানেই টেনে দেয়া হয়েছে। তবুও কোনো দুঃখবিলাস নেই, অজস্র প্রাণশক্তিতে উচ্ছল নীলিমা জীবনের তীরে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছে।

ত্যাগের তিতিক্ষায় অজয়া নীলিমা, গতানুগতিক সমাজব্যবস্থায় যে নারীকে আমরা দেখি তা থেকে স্বতন্ত্র, মহীয়সী এক নারী। প্রকৃতির পটে নিজেকে দাঁড় করিয়ে, শামুকের মতো শক্ত আবরণের ভিতরে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত অপেক্ষা করছে স্বামীকে সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা তার স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দিনাতিপাত করেছে, নানা প্রতিকূলতা বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে জলে যাত্রা করেছিল। তেমনি প্রচণ্ড মনোবলের অধিকারী-অপরাজেয় ব্যক্তিত্বশালী নীলিমা আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসুস্থ স্বামীকে সুস্থ করার জন্য পদ্মার বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নীলিমার রূপকে 'বাঘিনী'র প্রতীকে দেখলেও 'নদী ও নারী' গল্পে নীলিমা চরিত্রটি ভারতীয় নারীর চিরন্তন ঐতিহ্যবাহী রূপকে মনে করিয়ে দেয়। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, বেহুলারই আধুনিক সংস্করণ তথা পরিবর্ধিত রূপই নীলিমা। যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে নারীদের আত্মত্যাগের কাহিনিরই নবরূপায়ণ 'নদী ও নারী' গল্পটি।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পের ভুবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে প্রকৃতি। প্রকৃতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, গ্রামের উন্মুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠা, সৌন্দর্যপিয়াসী শিল্পীমানস– প্রকৃতির পটে নিরন্তর আত্মানুসন্ধানী মনের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রকট। সর্বোপরি অন্তর্মুখীপ্রখর অনুভবশক্তি গড়ে তুলেছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের নিজস্ব পরিমণ্ডল। প্রকৃতি-নির্ভর গল্প রচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ভূমিকা তুলনারহিত। তিনি তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রকৃতির রূপ-রস-স্বাদ-গন্ধ উপভোগ করে মানবচরিত্রের উপর প্রকৃতির প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

করেছেন। প্রকৃতি মানবমনের সংকট নিরসনে যেমন সহায়ক ভূমিকা পালন করে, তেমনি প্রকৃতি তার সর্বগ্রাসী ছায়া বিস্তার করে মানব চরিত্রের অস্তিত্বকে আর্ত-বিপন্ন-নিঃস্ব ও অসহায়ও করে তোলে। তাঁর ছোটগল্পে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক সেরকম বহুমাত্রিক তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। প্রকৃতি কীভাবে মানুষকে মনোবিকারগ্রস্ত করে তোলে–তার গল্প 'সমুদ্র'। সমুদ্রের কাছে গিয়ে প্রেম, দাম্পত্য, যৌনতা সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। জীবনের প্রথমবার পুরীতে যাওয়ার নিজস্ব অভিজ্ঞতা লেখক উত্তম পুরুষের জবানিতে উপস্থাপন করেছেন এই গল্পে। সৌন্দর্যের তৃষ্ণা যে ভেতরে ভেতরে কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, সেই বোধ থেকে মানুষ আত্মমগ্ন হয়ে ক্রমশ চেনা পরিবেশ, প্রিয় মুখ, নিত্য-ভাবনা সবকিছু থেকে সরে যেতে থাকে। তাই গল্পকথকের কাছে মনে হয় 'দেহ-সমুদ্র দেহ-সমুদ্র'! তার সমগ্র চেতনা জুড়ে সমুদ্র রহস্যময় বিশালতা নিয়ে হাজির হয়। পুরীর সমুদ্রে স্ত্রী হেনাকে নিয়ে আসা এবং হেনার উপস্থিতি তার (গল্পকথক) কাছে পীড়াদায়ক মনে হয়। ফলে ঘুমন্ত হেনাকে তার কাছে কখনো ঘুমন্ত খরগোশ, কখনো কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা একটা নরম তুলতুলে শরীর মনে হয়। আবার কখনো হেনাকে তার কাছে এক মায়াবিনী ডাইনি মনে হয়। হেনাকে সে শুধু মানসিক আঘাত করেই ক্ষান্ত হয় না, শারীরিক আঘাতও করে বসে– 'হেনার পায়ে নরম মাংসল ডিমটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছিলাম, যেন কতটা নরম নখ দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, ঘুমের মধ্যেই যন্ত্রণায় ও উঃ করে উঠেছিল।'[৭]

সমুদ্রপ্রীতির সর্বনাশা নেশায় তাড়িত হয়ে একসময় সমুদ্রের সঙ্গে একাকার হয়ে ওঠে চরিত্রটি। এই একাকার হয়ে যাওয়ার পিছনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে এক বিচিত্রচরিত্র মামা। যে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সমুদ্র দেখতে এসে কুড়িটি বছর অতিবাহিত করে। এই মামাই কথককে শেখায়, সমুদ্র পাথরের দেবতা বা মাটির ঠাকুর নন– সমুদ্র 'সাংঘাতিক জীবন্ত একজন কেউ'। মামার আশ্চর্য সম্মোহনী শক্তি কথককে মোহাচ্ছন্ন করতে থাকে। লোকে দেবতাজ্ঞানে ধানদূর্বা, ফুল, বেলপাতা, কচি ডাব, পেয়ারা সমুদ্রের জলে দিলে তাদের সে মূর্খ, পাগল জ্ঞান করে। মামা সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে দেয় মাছ ভাজা, সিঙ্গাড়া, কেক, ডিমের বড়া, পাউরুটি। একসময় ভাগ্নে বীরেনের শখের কুকুরটিকেও বিসর্জন দিয়েছিল; এমনকি নিজের স্ত্রী পর্যন্ত রেহাই পায়নি। এই বিচিত্র উদ্ভট চরিত্রটি তার আশ্চর্য সম্মোহনী শক্তি দিয়ে কথককে মোহাচ্ছন্ন করেছিল। কথক নিজেই স্বীকার করে যে, রোগা মানুষটা তার রক্তের মধ্যে কি যেন সংক্রামিত করে দিয়েছিল। ফলে তার সমগ্র সত্তা ধীরে ধীরে সমুদ্র এবং তার রহস্যময় ভয়ংকর সুন্দরের বিশালতায় আচ্ছন্ন হতে থাকে। সমুদ্রের বিশালতায় সম্মোহিত হয়ে ঝামাপুকুরের ফ্লাটের বদ্ধ সংকীর্ণ জীবন থেকে, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে, এমনকি সমস্ত বন্ধন থেকে, সে মুক্তি চাইছিল। *রামায়ণ* প্রসঙ্গ অর্থাৎ এক পৌরাণিক বিষয়ের অবতারণা করে লেখক দেখাতে চেয়েছেন, জৈব প্রকৃতির তাড়নায় প্রকৃতিকে উপেক্ষা করলে পার্থিব জীবনে বীভৎসতাকে আহ্বান করা হয়। কথকের ভাষ্য অনুযায়ী–

> মনে পড়ল, এই সেই অশান্ত উদ্দাম–স্ত্রীকে উদ্ধার করতে যেতে রামচন্দ্র নিষ্ঠুর তীর মেরে একে শাসন করতে চেয়েছিল। সীতা-উদ্ধার হয়েছিল। কিন্তু শান্তি পেয়েছিল কি শ্রীরাম? কেন পায়নি, কোথা থেকে অভিশাপ এসে লাগল সেদিনের সেই দাম্পত্য-জীবনে? বার বার মনে হতে লাগল প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছিল, সমুদ্র ক্ষমা করতে পারেনি ওদের।[৮]

রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করেন, শাসন করেন, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সীতাকে পেয়েও স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে হয়েছিল, শান্তি পাননি কোনোদিন। প্রকৃতির এক অভিশাপ যেন এসে লাগল তাদের সেদিনের সেই দাম্পত্য-জীবনে। বার বার মনে হতে লাগল প্রকৃতি (সমুদ্র) প্রতিশোধ নিয়েছিল, সমুদ্র ক্ষমা করতে পারেনি ওদের। প্রতীকায়িত বাক্য চয়নের মধ্যে দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'আমি'কে পৌঁছে দেন পার্থিব জগৎমুক্ত এক ঠিকানায়। সমুদ্রকে একাত্ম করে নিজের মতো করে পাওয়ার তাড়নায় মামাকেন্দ্রিক তথা নিসর্গকেন্দ্রিক জগতের প্রভাবে জগৎ-সংসার-দাম্পত্যসম্পর্ক সবকিছুই তার কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল। ফলে এক সময় স্ত্রী হেনাকে সমুদ্রে ঠেলে দিতে চায়। সমুদ্রের প্রতি তার অন্তর্লোকের অনুভব পাঠক হৃদয়েও এক ধরনের সম্মোহন সৃষ্টি করে। লেখক প্রতীক-চিত্রকল্পের সাহায্যে পরাবাস্তব জগতে 'আমি'র পরিভ্রমণের পর তার সংক্রমিত চৈতন্যের জাগরণকে এই গল্পের শেষ দিকে দেখিয়েছেন। সাক্ষীগোপাল স্টেশনে এসে তাকে স্বাভাবিক এবং সহজ হতে দেখি। হেনার হাতে মিষ্টির ঠোঙাটা তুলে দিয়ে বলে–

> 'কিন্তু তুমি আমায় বলতে পারতে, জানিয়ে দিতে পারতে লোকটা এমন ভয়ংকর নিষ্ঠুর– স্ত্রীকে সমুদ্রে ঠেলে দিয়েছিল।' হেনা হঠাৎ উত্তর করল না, জানালার বাইরে অন্ধকার দেখল, তারপর আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে মৃদু হাসল : 'বলিনি–বলতে ভয় করছিল– কি জানি যদি ওর রোগের ছোঁয়াচ তোমাকে পেয়ে বসে–' একটু থেমে পরে ও বলল, 'সমুদ্র দেখে এমন পাগল হয়ে উঠেছিলে!'[৯]

গল্পকথকের নিজেকে আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই 'সমুদ্র' গল্পটির সমাপ্তি ঘটে। কথক নিজেই উপলব্ধি করে, 'অস্বীকার করব কেমন করে। সত্যি কি আমার মধ্যে একটা কিছুর সংক্রমণ আরম্ভ হয়েছিল না।'[১০] সৌন্দর্যতৃষ্ণা ভেতরে ভেতরে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে, এক অসহ্য বোধ থেকে মানুষ আত্মমগ্ন হয়ে যেতে পারে। সেই বোধ থেকে কোনো মানুষ ক্রমশ সরে যেতে পারে তার চেনা মুখ, পরিবার, পরিবেশ, ঘটনা এমনকি প্রিয় মানুষের কাছ থেকেও। তেমনি সমুদ্র এক বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে, প্রবল সর্বগ্রাসী তন্ময়তায় গল্পকথকের অন্তর্লোকে এক বোধের সঞ্চার ঘটায়। ফলে গল্পকথকের এক গূঢ়-গাঢ় আত্মোপলব্ধি ঘটে– সমুদ্র তার সমস্ত অতীতকে তুচ্ছ করে দিয়ে ভয়ংকর সুন্দরের বিশালতা দিয়ে তাকে গ্রাস করে। সমুদ্রের কাছে গিয়ে তার প্রেম, দাম্পত্য, যৌনতা সমস্ত কিছু কীভাবে তুচ্ছ হয়ে যায়, সমুদ্র কীভাবে তাকে মনোবিকারগ্রস্ত করে তোলে– সে সম্পর্কিত সামাজিক অবক্ষয়ের যে চিত্র নন্দী এঁকেছেন সে প্রসঙ্গে মল্লিক বলেন :

> মানব প্রকৃতির জাগ্রত চৈতন্য নিসর্গ প্রকৃতির সংস্পর্শে কিভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, কিভাবে নিসর্গের নিগূঢ়, নীরব সংক্রমণ মানুষের জাগ্রত চৈতন্যকে বিলুপ্তির পথে, ক্রমশ ঠেলে দিতে পারে 'সমুদ্র' গল্পটি তারই একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত। জ্যোতিরিন্দ্র শিল্পীসত্তার মৌলিকতায় গল্পটিকে মাল্টিডাইমেনশন্যাল করে

> তুলেছেন। এক নিবিড় ইন্দ্রিয়ঘন পরিবেশে, নিসর্গ ও জৈব প্রকৃতির সঙ্গে যৌনতা ও মধ্যবিত্ত জীবনের সীমাবদ্ধতা এবং তার অবক্ষয়ের ছবিকে একসঙ্গে এখানে এঁকেছেন।[১১]

গল্পটিতে সমুদ্র নিজেই একটি চরিত্র হয়ে দেখা দেয়– অন্তত 'সমুদ্র' গল্পের কথকের কাছে। পাশাপাশি পাঠকহৃদয়েও তাৎক্ষণিক আলোড়ন তৈরি করে। তবে গল্পের শেষটুকু পাঠকহৃদয়ে স্বস্তি এনে দেয়। সমুদ্রমত্ততায় গল্পকথক ধীরে ধীরে গ্রাসের শিকার, পরিচিত জগৎ, চেনা মানুষদের কাছ থেকে সরে যেতে থাকলেও শেষ পর্যন্ত সে তার সম্বিৎ ফিরে পায়– আপন জগতে ফিরে আসে।

'গিরগিটি' জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বহুল আলোচিত এবং পাঠকপ্রিয় একটি গল্প। প্রকৃতি ঘেরা শহরতলির ছোট বাড়িতে মায়া, প্রণব ও ভুবন সকারের বসবাস। স্বামী প্রণব চাকুরে, সাতসকালে দু-বালতি জল মাথায় ঢেলে, খেয়ে অফিসে বেরিয়ে যায় আর ফেরে বিকেল পাঁচটায়। অন্যদিকে উঠান পার হয়ে বাঁ দিকের একটা দেয়াল ঘেঁষে ডুমুর আর পেঁপে জঙ্গলের আড়াল করা নিচু একচালা একটি খুপরিতে ভাড়াটে বুড়ো ভুবন সরকার থাকলেও ওর থাকা না থাকা সমান কথা। সারাদিনের মধ্যে কাশির এক-আধবার শব্দ বা যন্ত্রপাতি চালাবার টুংটাং আওয়াজ কানে আসে– আসে না। দিনরাত বুড়ো ভুবন সরকার কী করে তা দেখবার তিলমাত্র ইচ্ছা বা কৌতূহলও মায়ার নেই। মায়া যেন নিজেতে নিজে মগ্ন। গল্পের শুরুতেই লেখক মায়ার এই আত্মমগ্নতার চিত্র এঁকেছেন এভাবে :

> যদি কেউ এখন মায়ার ঘরে উঁকি দেয় তো দেখতে পাবে দেওয়ালে টাঙানো একটা বড় আরশির সামনে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে ও নিজেকে দেখছে। দেখছে আর যেন আনন্দের আতিশয্যে মৃদু শিস দেওয়ার মতন একটা গানের সুর জিহ্বা ও ঠোঁটের মাথায় জড়িয়ে রেখে তারপর একসময় নিজের নিঃশ্বাসের সঙ্গে বার করে সেটা ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে।[১২]

সৌন্দর্যতৃষ্ণার অসাধারণ গল্প 'গিরগিটি'। এই গল্পের নায়িকা মায়া আত্মসুখী, তার চেয়ে বেশি আত্মমুগ্ধ (নার্সিসিস্ট)। নিজ ভুবনে একা থাকতে থাকতে ক্লান্ত মানুষ আত্ম-দর্শনে সুখ খুঁজে পাবে, প্রকৃতির নির্জনতায় নিজেকে মুক্ত করে দিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করবে, আত্মতৃপ্তি পাবে বেচেঁ থাকার, এটাই অনেক সময় স্বাভাবিক পথ – যা গল্পের মূল চরিত্র মায়ার ক্ষেত্রে ঘটেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার প্রতিবেশি বুড়ো ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ভুবন সরকারের স্তুতি। তার কচি পেয়ারার মতো ছোট্ট সুগোল মসৃণ থুতনি, চোখ, নাক, গাল স্বামীর খুব প্রিয়। দু-বছরের দাম্পত্যজীবনে স্বামীর মুখে রাতদিন তার রূপযৌবনের অঢেল লাবণ্যের গতানুগতিক প্রশংসা শুনে শুনে মায়া ক্লান্ত–বিরক্ত। গতানুগতিক একঘেয়ে দাম্পত্যে ক্লান্ত নারী-পুরুষের বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য। তাই দাম্পত্যের পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্ত মায়া নিজেই অবলোকন করে শরীরী বৈভবের প্রতিটি ভাঁজ– কখনো আয়নায়, কখনো কুয়োর জলে। নিজের দেহসৌন্দর্যে নিজেই রোমাঞ্চিত হয়। কুয়োতলায় নগ্নস্নানে সে বিমোহিত। প্রকৃতিকে উৎসর্গ করে সেই স্নানদৃশ্য। জলের আয়নায় নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায়। কুয়োর জলে নিজের সৌন্দর্য দর্শনে যখন মগ্ন

ঠিক সেই সময় পেছনে কার যেন শব্দ শোনা যায়। প্রচণ্ড চমকে মায়া কোনোরকমে বুকে আঁচল চাপা দেয়। দেখে, হাঁড়ি হাতে করে প্রতিবেশি বুড়ো ভুবন অদূরে পেয়ারা চারাটার গুঁড়ি ঘেঁষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। শীর্ণ দেহ, ফ্যাকাশে চোখের এই বুড়োকে মায়ার মনেই হয় না লোকটা একজন মানুষ, একজন পুরুষ। মায়ার চোখে– ক্ষীণ হাত-পা, নিষ্প্রাণ চাউনি, মন্থর গতির এই মানুষটি যেন ডুমুর তলার ওধারের পুরানো ভাঙা পাঁচিল বা পাশের মৃত নিষ্প্রাণ হাজারক্ষত চিহ্নযুক্ত মাদারগাছ ভিন্ন আর কিছু নয়। কিন্তু তিন বউ হারানো বুড়ো ভুবনের জরাজীর্ণ বুকে এখনো জেগে আছে তীব্র সৌন্দর্যতৃষ্ণা। এই পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সমালোচকের বিশ্লেষণ :

> 'গিরগিটি' গল্পে বুড়োটা ভাড়াটে বাড়ির বৌটির স্নানের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ। কুয়োর ঠাণ্ডা জলে নিরাবরণ হয়ে ঐ যুবতী বৌটি স্নান করছে। বুড়োর দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটা একটি পরিপূর্ণ প্রকৃতি-সংলগ্ন ছবি– নিরাবরণ যুবতীর একাকিত্ব ও তার রূপ, নির্জন কুয়োতলায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে– তার গায়ের মসৃণ চামড়ার উপর শুভ্র সাবানের ফেনার সৌন্দর্য দেখে বুড়োটা মুগ্ধ। এই মুগ্ধতার অন্তরালে যৌনবাসনা ক্রিয়াশীল নয়, সৌন্দর্যদৃষ্টি ক্রিয়াশীল। আর ঐ যুবতী বৌটিও দেখে কুয়োতলার নির্জনতা, শ্যাওলা, রোদ, কচুগাছ, জলের ধারা, একটা প্রজাপতি, একটা গিরগিটি। সবটা মিলিয়ে পরিপূর্ণ ছবি।[১৩]

বৃদ্ধ ভুবনের ফ্যাকাশে হলদে চোখ দিয়ে দেখা মায়ার ভেজা নগ্ন শরীর তার রক্তে ঢেউ তোলে। ভুবন তার সৌন্দর্যরসিক চোখ দুটোকে কিছুতেই অস্বচ্ছ হতে দেয়নি। মায়াকে সে যতবার দেখে ততবারই মুগ্ধ হয়। তার শরীরী বিভঙ্গের সঙ্গে কিসের তুলনা করবে প্রতিনিয়ত তা ভেবেই ভুবন সরকার অস্থির। অন্যদিকে সৌন্দর্যপিপাসী মায়ার চোখে বিশ্বপ্রকৃতি যেমন সুন্দর, সে নিজেকেও সেই সৌন্দর্যের সঙ্গে একাকার করে দিতে চায়। স্বামীর গতানুগতিক সৌন্দর্যস্তুতিতে সে সন্তুষ্ট হয় না, স্বামীর লুব্ধ দৃষ্টির সামনে নিজেকে অনাবৃত করতেও কুণ্ঠাবোধ করে। মায়া বুঝতে পারে যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো ইন্দ্রিয় শক্তি প্রণবের মধ্যে নেই। প্রাণবন্ত নিসর্গ-প্রকৃতির পটভূমিতে ভুবন সরকারকে দাঁড় করিয়ে গল্পকার মায়াকে, তার দৈহিক সৌন্দর্যকে, আয়নায় তার প্রকৃতি দর্শনকে দেখিয়েছেন– যেন জৈব প্রকৃতিকেই উপস্থাপন করেছেন লেখক। মায়ার দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনায় প্রকৃতি থেকে উপমা সংগ্রহ করে করে গল্পকার যেন জৈবপ্রকৃতি ও নিসর্গপ্রকৃতিকে একাকার করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপভোগ করার শক্তি প্রণবের নেই। পাখির কিচিরমিচির, পাখির ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকানোর শব্দ, শিশিরের বা পাতার শব্দ শোনার মতো শ্রবণেন্দ্রিয়ের পারঙ্গমতা প্রণবের মধ্যে অনুপস্থিত। কিন্তু প্রকৃতির সবুজ সমারোহে বৃদ্ধ ভুবনের প্রাণবন্ত উপস্থিতি নিসর্গ-প্রকৃতির রূপময়তার প্রতীক মায়াকে আবিষ্কারের পাশাপাশি স্পর্শও করে ফেলে। ভুবন নিজের জৈব প্রকৃতিকে মায়ার সামনে একসময় তুলে ধরে এভাবে :

> বুড়ো হয়ে গায়ের বল গেছে বটে, কিন্তু ভেতরে রসের বাল্‌ব জ্বেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মতো ঝকঝকে করে রেখেছি, ছানি পড়তে দিইনি, দিদির কি এখনো বুঝতে বাকি।[১৪]

তিন বউ হারানো বৃদ্ধ ভুবনের জরাজীর্ণ বুকে, ফ্যাকাশে চোখে এখনো জেগে আছে তীব্র সৌন্দর্যপিপাসা। জরাগ্রস্ত কিন্তু সৌন্দর্যপিপাসু চোখটাকে সে কিছুতেই অস্বচ্ছ হতে দেয়নি। মায়াকে সে যতই দেখে ততই মুগ্ধ হয়। মায়ার শরীর বিভঙ্গের সঙ্গে কিসের তুলনা করবে তা ভেবেই বৃদ্ধ ভুবন সরকার অস্থির। কখনো মায়াকে 'ডালিম চারা', কখনো তার চোখের মায়াকে 'রাজহংসীর গতিভঙ্গি', জংলা ছিটের ছায়াকে 'চিতাবাঘিনী' ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে। আবার কখনো 'দোপাটি ফুলের মালায়' সাজিয়ে নিসর্গ প্রকৃতির রূপময়তার প্রতীক মায়াকে শুধু আবিষ্কারই করেনি, জয়ও করে নিয়েছে। তাই বৃদ্ধ ভুবনের ফ্যাকাশে চোখই হয়ে ওঠে মায়ার আয়না। রাত্রিবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে সেই আয়নায় মায়া নিজেকে আবিষ্কার করে প্রকৃতির মধ্যে। জরাহীন উষ্ণ কোমল হাতটা মরা শুকনো কাঠের গায়ে তুলে দেয় অবলীলায়। পরম বিশ্বাসে সেই আয়নায় নিজেকে মেলে ধরে।

ভুবনের সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনে উঠে এসেছে মায়ার সুপ্ত কামনার স্রোতধারা যা ভুবনের ভগ্ন শরীর কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অতৃপ্ত কামনা বাসনার পাশাপাশি, এও বুঝতে পারে যে ভুবনের মধ্যেই রয়েছে সেই সৌন্দর্যকে দেখার জৈব বাসনা। শরীর দিয়ে নয়, চোখ দিয়েই সেই সৌন্দর্য প্রতিমাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছে বৃদ্ধ ভুবন। সেই সুন্দরের আয়নায় নিসর্গ আর জৈব অস্তিত্ব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। নিসর্গ আর নারীকে একাকার করে সৃষ্টি করেছে প্রতিমার অবয়ব।

জ্যোতিরিন্দ্র ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বনির্ভর কাহিনিগুলিতে মানব-মানবীর সংগুপ্ত যৌবনবাসনার চিত্রায়ণ করেছেন। লেখক বিশ্বাস করেন, মানব মনের অন্য প্রবৃত্তিগুলির মতো যৌন প্রবৃত্তিও এক স্বাভাবিক ক্রিয়া। কিন্তু সচেতন শিক্ষার অভাবে, নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে অসংযত চিত্তের বিকার যখন দেখা দেয়, যৌনতা তখনই বিকৃতিতে পর্যবসিত হয়। এ ধরনের মনোবিকৃতির একাধিক কাহিনি রচনা করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র। কিন্তু কখনোই শৃঙ্গাররসের অনর্থক বর্ণনা বিস্তারে মুখর হননি।[১৫] জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক-বিন্যাস নানামাত্রিক তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তিনি আজীবন যেন প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধে নিমজ্জিত থেকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুমাত্রিক সম্পর্ককে অবলোকন করেছেন এবং প্রকৃতি কীভাবে মানবজীবনকে প্রভাবিত করে সেই চিত্রের পাশাপাশি প্রকৃতিকে অনেক সময় একটি শক্তিশালী চরিত্র হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতিতে বাদ দিয়ে তিনি নারীর রূপ, মানুষের অন্তর্লোকের উন্মোচন করতে পারেন না।

এই গল্পে মায়া যখন প্রকৃতিকে উৎসর্গ করে নিজের স্নানদৃশ্য, তখন প্রকৃতি বাস্তবিকই দ্রষ্টা। এ-রকম প্রকৃতিসান্নিধ্য বিশুদ্ধ ইঙ্গিত আনন্দানুভূতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ইঙ্গিত বিভূতিভূষণের গল্পেও দেখা যায়। তবে জ্যোতিরিন্দ্রের প্রকৃতি যেভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলে সে-রকম সম্পর্ক বিভূতিভূষণের গল্পে দেখা যায় না।

নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চৈতন্যের সাবলিমিটি ঘটিয়ে এক অন্যতর জগৎ তৈরি করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। আমাদের প্রাত্যহিক মন, দৈনন্দিন টানাপড়েনে জেগে ওঠা লোভ, দুঃখ, গ্লানি ইত্যাদি অনেক সময় তুচ্ছ রূপ ধারণ করে প্রকৃতির ঋতুচক্রের পরিবর্তনের কাছে– 'বৃষ্টির পরে' গল্পটির এটাই উপজীব্য। দুই পুরাতন বন্ধুর ছেলে-মেয়ে পালিয়ে যাওয়ার সংকট কীভাবে বৃষ্টিস্নাত জুঁই-চাপার কলির আত্মপ্রকাশে কেটে যায়– তারই গল্প 'বৃষ্টির পরে'। অতীতের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু– একজন ঝুনো ব্যারিস্টার, অন্যজন প্রাজ্ঞ প্রবীণ অধ্যাপক। ষাট আর ঊনষাট দুজনের বয়স। এই দুই বন্ধু পরস্পরের একদা-অসংযত জীবনাচারণের সাক্ষী। বহুদিন পর দুজনে মুখোমুখি– ব্যারিস্টার প্রভাতই প্রচণ্ড ক্রোধে ছুটে এসেছেন অধ্যাপকের বাড়িতে, কারণ তার ছেলে ব্যাডমিন্টন খেলতে আসত এই বাড়িতে অধ্যাপকের মেয়ের সঙ্গে। ছেলে আজ নিখোঁজ– কোথায় গেল? ব্যারিস্টার পিতা অধ্যাপক পিতার কাছে কৈয়িফত চান। ব্যারিস্টারের উত্তেজিত আচরণের বিপরীতে অধ্যাপকের আচরণ অদ্ভুতভাবে নিরুত্তাপ, নির্লিপ্ত– অধ্যাপক যে চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে অভ্যস্ত সেই চোখ ব্যারিস্টারের নেই। অধ্যাপকের বাড়ির সামনেই সবুজ ঘাসে মোড়া সুন্দর মাঠ, নানা রঙের ফুলের বাগান, তার বাড়ির গাছের মাথায় পাখিদের কূজন-গুঞ্জন। ঋতুতে ঋতুতে বাগানের রং বদলায়, বর্ষার আগমনে বৈশাখী চাঁপা-বকুলের ঔদ্ধত্য কমে যায়, কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথায় আগুন ম্লান হয়ে আসে। অধ্যাপক জানতেন, তার লনের কৃষ্ণচূড়ার ম্লান বিষণ্ন চেহারা, বকুল চাঁপার দীর্ঘশ্বাস, ছাদের ওপরকার আকাশের ধূসর রং প্রভাতের মনের ওপর সুন্দর কাজ করবে। তার ঔদ্ধত্য, চঞ্চলতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ থাকবে না। তাছাড়া এতদিন কৃষ্ণচূড়া বাগানে আগুন জ্বেলে রেখেছিল, আজ বর্ষা এসেছে– বসন্ত জ্বলায়, গ্রীষ্ম জ্বালায়, কিন্তু বর্ষার কাজ নেভানো। বর্ষায় রজনীগন্ধার কুঁড়ি চোখ মেলে, অন্যদিকে বর্ষণ থামলে হিমের স্পর্শ পেয়ে চোখ খুলবে শিউলিরা। কী অদ্ভুত এই নিসর্গ– প্রকৃতির খেলা! প্রকৃতির এই যাতায়াত নিয়ন্ত্রণে মানুষের কোনো হাত নেই। ঠিক তেমনি ব্যারিস্টার আর অধ্যাপকের দুটি ছেলে-মেয়ে অধ্যাপকের বাড়ির সামনের লনে চুনের দাগ বুলানো ব্যাডমিন্টন খেলার চৌখুপি ঘর থেকে খেলাধুলা শেষে কখন যে উঠে আসতে শুরু করল দোতলায়– এই অন্ধকার ঘরে– যেখানে একটা রিবন আর একটা অ্যাশট্রে আজও তাদের অন্য খেলার সাক্ষী হয়ে পড়ে আছে। পিতা হিসেবে অধ্যাপক ওদের বাধা দেননি, কারণ যখন ওদের দিকে চোখ গেল তখন আর বলার সময় ছিল না। অধ্যাপক পিতা অনুভব করেন :

> শীত শেষ হয়ে বসন্ত এসে গেছে। তখন কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত আভায় আকাশ লাল হয়ে গেছে, মধুলোভী ভোমরাদের আনাগোনার বিরাম ছিল না; ওদিকে আম জাম কাঁঠাল জামরুলের গুটি দেখা দিয়েছে গাছে গাছে। ফলের সম্ভাবনায় ডাল পাতাগুলি কাঁপছিল। সেই উৎসবের দিনে ওদের দু'জনকে কিছু বলতে আমি সাহস পাইনি।[১৬]

প্রকৃতির যাতায়াতকে বা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনকে যেমন কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তেমনি দুই বিপরীত লিঙ্গের মানবীয় প্রেমিকসত্তার বেড়ে ওঠা ও মেলামেশা কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। বৃষ্টির জলে ম্লান হয়ে গাছেরা যখন নিজের রং পাল্টাচ্ছে, পাতারা যখন উল্লাসে মত্ত– তখন বিমূঢ় ব্যারিস্টারের মনে প্রশ্ন জাগে, 'মানে সারা বসন্তটা ওরা মাঠে খেলাধুলা করল,

গ্রীষ্মের শুরু থেকে ওই কামরায় ঢুকল 'তাই'? 'আর বর্ষা আসছে এমন সময় তোমার লনেও রইল না ওরা, ছোট ঘরেও রইল না।'[১৭] ঠিক তাই। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির রূপ-রং যেমন বদলায়, তেমনি মানুষেরও মনের রং এবং স্বভাব বদলায়। মেয়ের অধ্যাপক পিতা এই দুটি সন্তানের প্রতিনিয়ত বেড়ে ওঠা দেখেছেন, দেখেছেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের গতিবিধির পরিবর্তন– অনেক কিছু বুঝতেও পেরেছেন, কিন্তু বাধা দেননি। তিনি এই পরিবর্তনকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছেন। লেখকের ভাষায় :

> ঋতুতে ঋতুতে গাছের রূপ বদলায় প্রকৃতির রং বদলায় মানুষের স্বভাব বদলায়। হুঁ তার ইচ্ছা, তার চাওয়া, তার অভিরুচির রং। কোনটা থাকল বলে আমরা হাসব কোনটা থাকল না বলে আমরা কাঁদব তুমি বলতে পার কি? কেননা তোমার ছেলের কোনোটাই তোমার না, আবার সবটাই তোমার– তেমনি আমার মেয়ের। ঠিক ফুল ফোটার মতন, ফুলের মরে যাওয়ার মতন। তাই তো ওরা মাঠের খেলা ছেড়ে যখন চুপ করে গাছের নীচের ওই বেঞ্চিটায় বসে থাকতে আরম্ভ করল আমি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি; যখন বেঞ্চি ছেড়ে আমার ঘরের পাশের সেই ছোট্ট কামরায় আশ্রয় নিল আমি চুপ করে রইলাম। আমি হাসিও নি কাঁদিও নি।[১৮]

ব্যারিস্টারকে প্রকৃতির এই নিষ্ঠাহীন নিয়ত-পরিবর্তনের তত্ত্বে দীক্ষিত করার জন্যই অধ্যাপক তার হাত ধরে অগ্রসর হন মাধবীবনের দিকে। বৃষ্টিস্নাত মাধবীবন দেখা শেষ করে তারা এগিয়ে গেলেন ঘন কেয়া-ঝোপের দিকে– লম্বা ডাঁটার মতো সাদা ফুলটা হাওয়ায় দুলছে কিন্তু সেদিকে তাদের দৃষ্টি নেই। তারা দেখছিলেন পাশের জমির একটু অংশ, যেন গতকাল রাতে বা কোন এক সময়ে মাটি খোঁড়া হয়েছে। নতুন মাটির চিহ্ন–যেন গর্ত খুড়ে আবার মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। তার ওপর ঘাসের চাপড়া বসিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির তোড়ে ঘাস সরে গেছে, মাটি ফেটে গেছে। তারা দুজনই মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। শেয়ালের মতো মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে ব্যারিস্টার ওটাকে টেনে বার করলেন। আশ্চর্য, রাগ করলেন না বা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন না। দুজনেরই চোখে জল, তিনবার নবজাত ঘুমন্ত শিশুর কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে প্রভাত আবার আস্তে আস্তে কোল থেকে শিশুটিকে শুইয়ে দিয়ে ওপরে মাটি চাপা দিলেন। ঘাসের চাপড়াগুলি সুন্দর করে বসিয়ে দিলেন। ব্যারিস্টারের ব্যথিত হৃদয়ে প্রশ্ন জাগে, 'এটা দরকার ছিল কি? 'হয়তো ভয়ে– লজ্জায়'– অধ্যাপক উত্তর দেন। 'তারপর পালিয়ে গেল দুটিতে।' আকাশের দিকে মুখ করে সোনালি রোদ চোখে নিয়ে ব্যারিস্টার বললেন। শুধু অনুকম্পা নয়, আশ্বস্ত অধ্যাপক তার বন্ধুর চকচকে চোখে ফুল শুকিয়ে যাওয়ার ব্যথা যেমন দেখলেন, তেমনই দেখলেন শুকিয়ে যাওয়া ফুলের একটু একটু করে সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ। 'বৃষ্টির পরে' গল্পটিতে নিসর্গ-প্রকৃতিই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। মনের সংকট নিরসনে প্রকৃতিই এখানে সহায়। নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চৈতন্যের সমন্বয় ঘটিয়ে পাঠককে এক অন্য জগতে নিয়ে যান লেখক। অরুণাভ মিত্র এ-গল্পে খুঁজে পান পুরাণের 'মাধবীর মিথ'। সেজন্য তিনি মনে কেরন, 'দুই বন্ধুর ছেলে-মেয়ের অবৈধ সন্তানটি যে মাধবীবনেই পরম নিশ্চিন্তে থাকবে, এতে আর আশ্চর্য কি? কুন্তীরা নয়, মাধবীরাই পারে তাদের আশ্রয় দিতে।'[১৯]

'শ্বাপদ' গল্পে প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সমন্বয়ে মানবমনের অবচেতনের গূঢ় সত্যের প্রকাশ দেখা যায়। মা মারা যাওয়ার পর সোদপুর থেকে খালি পায়ে হেঁটে আসা গণেশ বালিগঞ্জে মাসির বাড়ি থাকতে আসে। মাসতুতো ভাই শহুরে স্মার্ট খোকনের চোখে গণেশ একটা গেঁয়ো জংলা ভূত হিসেবে দেখা দেয়। খোকন প্রথমে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেও এক আদিম উল্লাসে তাকে কাছে নেয়। খেলা দেখাবার জন্য সার্কাসের দলের লোকেরা যেমন বনের পশুদের শিখিয়ে পড়িয়ে তোলে– সার্কাসে শিম্পাঞ্জি বা বানর দাড়ি কামায়, সিগারেট টানে, খবরের কাগজ পড়ে, তাস খেলে, জ্বলন্ত রিং-এর ভিতর দিয়ে লাফ দেয়, গণেশ সম্পর্কেও যেন খোকনের সেই ধরনের উৎসাহ। সেই উৎসাহে গণেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে বাবু সাজতে শেখায়, সিগারেট ফুঁকতে, একদিন অন্তর অন্তর দাড়ি কামাতে শেখায়। আর সিনেমার কাগজের সুন্দরী অভিনেত্রী রেবা, চামেলী, স্বাতী অন্য কোনো মেয়ের ওপর 'উপুড় হয়ে থাকতে' শেখায়। খোকনের কাছে মনে হয়েছে, এ একটা খেলা– একটা আনন্দ। গণেশ তার সবকিছু অনুসরণ করুক, শিখুক, তারপর কী দাঁড়ায়, কতটা যায় তখন না হয় দেখা যাবে। কিন্তু খোকন বুঝতে পারেনি তারই প্রশিক্ষণে গণেশের ভেতর লুকিয়ে থাকা শ্বাপদ একদিন তাকেই আক্রমণ করবে। এক ছুটির দিনের বিকেলে গণেশকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মদিঘির পাড়ে প্রেমিকা রুবির সঙ্গে দেখা করতে যায় খোকন। গণেশ গাঁয়ের বোকাসোকা মাথামোটা একটি ছেলে তাই খোকনের ধারণা– মেয়েটেয়ে সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই তার নেই, সেসব কোনো বোধই যেন ঈশ্বর তার ভেতর দেননি, যেন গরু-গাধা। পোষা কুকুরের মতন ওকে দিয়ে যা খুশি করানো যায়। প্রেমিকা রুবিকে খুশি করানোর জন্য গণেশকে দিয়ে পুকুর থেকে পদ্ম তুলিয়ে আনে এবং গণেশকেই আদেশ দেয় রুবির খোঁপায় পদ্ম গুঁজে দিতে। গাছ থেকে পাকা পেয়ারা পেড়ে দিতে বলে। ধীরে ধীরে রুবির লজ্জা কাটে, একসময় সেও গণেশকে নিয়ে খেলতে শুরু করে। কামরাঙা গাছে উঠিয়ে পাকা কামরাঙা পাড়ায়। তারপর এ-গাছ ও-গাছ করতে করতে বাগানের গভীরে হারিয়ে যায়। একসময় তাদের আর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। অন্ধকার নেমে আসে, সাপের হিসহিস শব্দের মতো যেন একটা শব্দ ভেসে আসে। খোকন আবার পেয়ারাতলায়, দিঘির ধারে ছুটে আসে। জলের বুক কালো হয়ে আসে– তবুও তাদের দেখা মেলে না। খোকন বুঝে যায়– ওরা বাগানেই আছে, খোকনের উপলব্ধি :

> মাঝে মাঝে আমার মনে হত, ওরা বাগানেই ছিল, বাগান থেকে বেরিয়ে কোথাও যায়নি। সেই সন্ধ্যার ছবিটা আমার মনে পড়ত। যাকে বুনো বলতাম, গাড়ল বলতাম, সে আর মানুষের আকৃতি নিয়ে ছিল না, বাগানের একটা গাছ হয়ে অরণ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, আর সে অরণ্য আমাদের বালিগঞ্জের ঝকমকে মেয়ে রুবিকে জীর্ণ করে ফেলেছিল।[২০]

গ্রামের বোকাসোকা ছেলে গণেশের কাছে সভ্যতার আলো প্রবেশ করেনি অথচ তার সরলতা, আদিম প্রবৃত্তি তোলপাড় করে নারীমনকে। প্রকৃতির সংস্পর্শে গণেশ তার নিজরূপে আবির্ভূত হয়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এ কাহিনি– প্রকৃতি বনাম মানবপ্রকৃতিকে কেন্দ্র করে এক সদূরপ্রসারী অধিবাস্তব জগতের সন্ধান দেয়।

এভাবে প্রকৃতি ও মানবমন মিলেমিশে একাকার হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে। প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের অনাদিকালের সম্পর্ক। প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি বাহ্যত দুটি ভিন্ন সত্তা হলেও তা যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে– লেখক বার বার একথাই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চিরায়ত সম্পর্কের রুপায়ন ঘটিয়েছেন বার বার। আবার কেবল প্রকৃতিকে চরিত্র করে 'সমুদ্র', 'গাছ', 'বনের রাজা', 'সামনে চামেলি' ইত্যাদি অসংখ্য গল্প লিখেছেন– যা পড়লে মনে হবে- গাছ কথা বলছে, আবার প্রকৃতির সঙ্গে তিনি কথা বলছেন।

'বনের রাজা' গল্পটিতে বিধৃত হয়েছে ক্লান্তিকর নাগরিকজীবন থেকে প্রকৃতিতে আশ্রয় লাভের কাহিনি। কলকাতা শহরের ইট-কাঠ-কংক্রিটের বদ্ধজীবন থেকে মুক্ত এবং শহরের বিকৃত চিৎকারে ভরা অসুস্থ জীবনকে সুস্থ করে আয়ুর রশি প্রলম্বিত করার এক ব্যবস্থাপত্র 'বনের রাজা' গল্প। ষাট বছরের ইঞ্জিনিয়ার সারদা কলকাতার গাড়ি-বাড়ি ও ভোগবিলাসী-জীবনের পাট চুকিয়ে গ্রামে গিয়ে বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে বাগান-পুকুর-মাটির সঙ্গে নিজেকে নিবিড়ভাবে মিশিয়ে দিয়ে জীবনের চরিতার্থতার অনুসন্ধানী হয়েছেন। গল্পের শুরু হয় দাদু সারদা এবং গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে আসা নাতি মতির কথোপকথনের মাধ্যমে–

> 'গাছ আমার সঙ্গে কথা বলে।'
> 'গাছের ডাল? পাতা?'
> 'ডাল পাতা ফুল কুঁড়ি ফল সব, –সবাই ফিস্‌ফিস্ করে আমার সঙ্গে কথা বলে।'
> 'আমার সঙ্গে বলবে?'[২১]

গাছের কথা মতিও শুনতে চায়, কিন্তু শুনতে পায় না। কারণ শহরে থেকে তার কান নষ্ট হয়ে গেছে। শহরের গাছ কথা বলে না– দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা গাড়ির ঘড়ঘড় ভেঁপু, রেডিওর চিৎকার ইত্যাদি শুনে শুনে গাছের আর শক্তি নেই, সব বোবা হয়ে গেছে; কথা বলবে কী, যেন প্রাণটা কোনো মতে টিকিয়ে ধুক্‌ধুক্ করছে। গ্রামের প্রকৃতিতে গাছের কাছে গাছ ছাড়া আর কিছুই নেই। একটি গাছের গুঁড়িকে যেন অন্য একটি গাছ আদর করে জড়িয়ে থাকে। লেখকের ভাষায় :

> এখানে গাছের কাছে গাছ ছাড়া আর আর ঐ দ্যাখ্, এক একটা গাছকে যেমন কিছুই নেই। গুঁড়ির কাছে কত ঘাস মাটি! আদর করে জড়িয়ে ধরেছে অপরাজিতা লতা, ঝুমকা লতা। ...আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে ডালে ডালে রঙবেরঙের পাখিরা এসে উড়ে ব'সে, গান গায়, পাতার বোঁটায় ঠোঁট ঘষে, ফলে ঠোকর মারে, তাই না? ...আর তোদের বীডন স্ট্রীটের গাছের গুঁড়ির কাছে কি? পাথরের খোয়া, গরম পীচ, গাছকে জড়িয়ে থাকে ইলেকট্রিক তার, গাছের মাথা ডিঙিয়ে ওঠে চারতলা, দু'তলা দালান, কেমন?[২২]

গাছ, লতা-পাতা, ফলের সঙ্গে পাখির সম্পর্ক, আবার গাছের সঙ্গে গাছের সম্পর্ক যেন প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক, যেন গভীর আস্থার আশ্রয়। এ সম্পর্ক নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতায় তা চিন্তা করা যায় না। শহরের পাশাপাশি গ্রাম, প্রকৃতির পাশাপাশি নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক

সভ্যতা– তার যন্ত্রণা, আর্তনাদ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এই গল্পে দেখিয়েছেন। মতি ধীরে ধীরে তার শহরের পরিচিত গণ্ডি ছেড়ে দাদুর তৈরি নতুন জগতে প্রবেশ করে। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে মতি গাছে গাছে ঝুলে থাকা পাকা জাম দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। দাদু গাছে চড়ে ফল পাড়ে। লেখকের বর্ণনায়–

> 'যেন এক একটা গাছের ডালের মাথায় লাল সবুজ কালো পাথরের মালা ঝুলিয়ে রেখেছে কে!' মতির কাছে ভারি সুন্দর লাগে, দাদু জানেন শহরের ছেলেরা শুধু সুন্দর সুন্দর করেই মরবে, সুন্দর লাগছে বলে গাছতলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেই তো আর ফলগুলো মুখের ভিতর লাফিয়ে ঢুকবে না! তাই দাদু কাঁধের গামছাটা কোমরে বেঁধে গাছের উঁচু ডালে চড়ে পাকা জাম পেড়ে খেতে থাকেন এবং নাতি, ঘরের বুড়ির জন্য গামছায় বেঁধে নিয়ে আসেন। একসময় সারদা মগডালে উঠে যাওয়ায় মতি ভয় পেলে সারদা হেসে বলেন–'ভাঙবার আগে ডাল জানান দেবে, মট্‌মট্‌ শব্দ হবে, তোদের বীডন স্ট্রীটের গাড়ি ঘোড়া জানান না দিয়ে এসে ঘাড়ে পড়ে।'[২৩]

সারদা নাতিকে বোঝাতে চেয়েছেন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কতটা নিবিড়, নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক জীবনচর্যার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কতটা মেকি। সারদা তার হলুদ রঙের বড় গাড়িটি বিক্রি করে দিয়েছেন। কারণ ঘাসের ওপর পাকা জাম-জামরুল ছড়িয়ে থাকে, গাড়ি ছুটিয়ে এলে তা থেঁতলে যাবে। গাড়ির হর্নে গাছের পাখি, কাঠবিড়ালী, ফড়িং, প্রজাপতি সব ভয়ে পালিয়ে যাবে।

মতি দেখেছে, দাদু সারদার পায়ে জুতা থাকে না, গাছের রাজার পায়ে জুতা যেন বেমানান। আম বাগানে বা জাম বাগানে থাকলে, বেশি গরম থাকলে, শরীর ঘাম দিলে দাদু সারদা পোশাক-আশাকের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন, 'পায়ে যদি ধুলো না লাগল, নরম ঘাস না মাড়ালাম তো বেঁচে আছি বলে আমার মনে হয় না।'[২৪] সারদা তার এই স্বাধীন ভুবনে মুক্ত মানুষ। নাগরিক কৃত্রিম খোলসযুক্ত জীবনে স্বাধীনতার এ স্বাদ নেই। নাগরিক খোলস খুলে অনাবৃত শরীরে পেতে চান প্রকৃতির আদর। তাঁর রাজ্যের ফল-ফুল, রূপ-রস-গন্ধ বাঁদর, কাঠবিড়াল, শালিক, বুলবুলি এমনকি পাড়া-প্রতিবেশীদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েই আনন্দ। সারদার এই প্রকৃতিসংলগ্নতা নাতি মতির সামনে সামাজিক বন্ধনের এক বৃহত্তর ঔদার্যকে তুলে ধরে।

সারদার সঙ্গে প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে নিবিড়ভাবে বিচরণ করতে করতে মতি ক্রমশ সম্মোহিত হয়ে পড়ে। ভারি সুন্দর গোলমতো পুকুরে শাপলা আর পদ্মকলি দেখে ভীষণভাবে আলোড়িত হয়। তার পুকুরে নামতে ইচ্ছে করে কিন্তু সে তো সাঁতার জানে না। তারই চোখের সামনে সারদা নগ্ন হয়ে পুকুরে সাঁতার কাটেন। হঠাৎ উপস্থিত হওয়া স্থানীয় কিশোরীকে শাপলা ফুল তুলে দেন। সারদার উলঙ্গ ভেজা শরীরটা দেখে মতির মনে হয় যেন একটা পুরনো গাছ। অনেকদিন জলের নিচে থাকার পর গাছটি উঠে এসেছে। মতি ভাবে– 'গাছের রাজা তো গাছই হবে'।

দাদু যে মাছের খুব ভক্ত সেকথা মতি গ্রামে এসে জেনেছে। দুবেলা গাদা গাদা মাছ ছাড়া সারদার চলে না। মাছ খাওয়ার জন্য তিন-তিনটে পুকুর কাটিয়েছেন তিনি। সারদা বলেন, এমনভাবে মাছ খেতে হয় যেন শুধু হাতে মুখে না, শরীর দিয়েও আঁশটে গন্ধ বেরোয়– তবেই না মাছ খাওয়া। শহুরে মানুষ 'বরফ চাপা পচা পচা' মাছ খায়, বাসি মাছ খেয়ে মতির মত হাড়গিলে হয়ে বেড়ে ওঠে, তাদের বুকের সবকটা হাড় গোনা যায়, পেট হয়ে উঠে 'হোমিওপ্যাথির শিশি'। মতির তখনি মনে পড়ে শহুরে মা-বাবার কথা- খাওয়ার পর আঁশটে গন্ধ দূর করার জন্য বার বার সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার কথা, ধোয়ার পর মায়ের হাতে পাউডার মাখার কথা। তাছাড়া শহুরে মানুষ ভেজাল খাবার, ধোঁয়া-কালি গিলে গিলে আয়ুর ফিতেটা গুটিয়ে নিচ্ছে। মতি দাদুর সঙ্গে ছুটি কাটাতে এসে পুকুরের টাটকা মাছ, ফলমূল আর খাঁটি দুধ খেয়ে পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই শরীর-স্বাস্থ্য ভালো বোধ করতে থাকে।

ষাট বছরের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার নাগরিক খোলস খুলে সাধে, স্বাদে, জীবনযাপন ও চিন্তাভাবনায় প্রকৃতির আদিম পুরুষ হয়ে উঠেছেন। সারদার বাগানে পাখির কলতান, টাটকা ফলমূল, পুকুরের মাছ, খাঁটি দুধ, দূষণমুক্ত বাতাস, মাটির কোমল স্পর্শ সারদাকে সতেজ, সবুজ করে। পাশাপাশি আয়ুর ফিতে প্রলম্বিত করে। দশবছর বয়সি মতি দাদুর বিপরীতে মা-বাবার কৃত্রিম জীবনযাপনের ত্রুটিগুলো ভেবে কষ্ট পায়। বাড়ি ফেরার পথে দাদু যখন তার কাঁধে হাত রাখে তখন দাদুর গায়ের ভিন্ন এক গন্ধ তার নাকে লাগে :

> মাছের গন্ধ না, আমের গন্ধ না, ক্ষীরের গন্ধ না, জাম জামরুলের গন্ধ না। জলের গন্ধ? শ্যাওলার গন্ধ? তা-ও না! কোমল মিষ্টি ঠাণ্ডা মৃদু শাপলা ফুলের গন্ধ এটা। মতি বুঝল। মতি বুঝল না আয়ুর ফিতে লম্বা করতে এই গন্ধও শরীরে ধরে রাখার দরকার আছে কিনা। বুঝতে না পেরে সে ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে লাগল। আর হাঁটতে লাগল।[২৫]

এই গল্পে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সবকিছু ছাপিয়ে দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছেন প্রকৃতিকে। সৌন্দর্যকে দেখার জন্য দরকার অন্তর্দৃষ্টি। তাই বোধহয় সারদা নিজের অন্তরাত্মার ডাকে সাড়া দিয়ে খুঁজে পেয়েছেন প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য, নিজেকে নিজেই সেখানে নবজন্ম দিয়েছেন, খুঁজে পেয়েছেন 'আয়ুর ফিতে' লম্বা করার পথ। সেই অন্তর্দৃষ্টিকে সর্বইন্দ্রিয়ে ছড়িয়ে দেওয়ার মানুষটিই হলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তিনি সব বাধা ভেঙে আমাদের নিয়ে যেতে চেয়েছেন আদিম উপভোগের সৌন্দর্যের জগতে। সমালোচকের ভাষায় :

> এখানে যেটা দেখবার– তা হল, কথা একটাই– নাগরিক জীবনে ধোঁয়া-ধুলো-আবর্জনা আর হাজার রকমের টেনশনের চাপে হাঁসফাঁস করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে– একমাত্র প্রকৃতি। প্রকৃতিই পারে মানুষকে তরতাজা, চনমনে রাখতে। তবে সে ক্ষেত্রে মানুষকে ভোগ-বিলাসের মুখে লাথি মেরে– নগ্ন হয়ে প্রকৃতির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।[২৬]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পাঠককে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে বলতে চান, প্রকৃতি থেকে মাটির স্পর্শ থেকে শহরের মানুষেরা কতদূর সরে এসেছে। তিনি চান মানুষ তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রকৃতিকে অনুভব করুক। আর এই প্রকৃতির পটে মানুষকে দাঁড় করিয়ে তিনি তাদের অন্তর্লোক বিশ্লেষণ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পল্লিজীবন তথা পরিবেশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা যেমন ছড়িয়ে ছিল তাঁর সমগ্র সত্তায়, তেমনি ছড়িয়ে আছে তাঁর সমগ্র সাহিত্যে। পরিবেশ নিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী উদ্বিগ্নতা চরম পর্যায়ে। অথচ সেই কবে রবীন্দ্রনাথ পরিবেশ রক্ষার কথা বলেছেন। যেজন্য দেবলীলা মুখোপাধ্যায় বলেন, "আজ আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখি, আজকের পরিবেশবিদ যেমন করে শহরকে হাত বাড়াতে বলেন গ্রামের দিকে কিংবা উৎসাহিত করেন মধ্যবর্তী বসতি নির্মাণ প্রকল্পে বা transit village-এর পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ তার তাগিদ অনুভব করেছেন অনেক আগে। শহর কলকাতার থেকে বহুদূরে, মাঠ-গাছ-গ্রামের সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং বিকল্প বাসভূমি স্থাপন, বলা যায় এমনই এক উদ্যোগ।"[২৭]

নাগরিক ক্লান্তিতে প্রকৃতিতে আশ্রয়-আকঙ্ক্ষার একটি গল্প 'গাছ'। দু-তিনটি বাড়ির মাঝখানে এক টুকরো পোড়ো জমির ওপর একটি পুরনো গাছ দাঁড়িয়ে থাকে, চারপাশের মানবিক সক্রিয়তায় তার প্রয়োজন আছে কি নেই– তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাছের রূপেরও পরিবর্তন ঘটে। বর্ষায় যেমন পাতাগুলো পুষ্ট হয়, শরতে আবার ভারি হয়, মোটা হয়, সবুজ রং আরো গাঢ় সবুজ হয়ে কালোর কাছাকাছি দাঁড়ায়; হেমন্তের মাঝামাঝি এসে সেই গাঢ় সবুজ পাতাগুলোই কালো ধূসর হয়ে ওঠে, শীতে হলদে ফ্যাকাসে পাণ্ডুর চেহারা হয়ে ঝরে পড়ে– তখনো গাছ গাছই থাকে। পড়ো জমিতে নিবিড় ছায়াটুকু ফেলে অনন্তকালের সাক্ষী হয়ে নিঃসঙ্গ গাছ যুগের পর যুগ দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় যেন কোনো দার্শনিক, নীরব অবিচল থেকে থেকে জগৎটাকে দেখছে, সংসারের উত্থান-পতন দেখছে, পাপ-পুণ্যের জয়-পরাজয় দেখে বিমূঢ় বিস্মিত হয়ে আছে। যেন একজন চিন্তাশীল মানুষ হয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে। আশেপাশের মানুষগুলো একটু-আধটু সুবিধে আদায় করার জন্য গাছের কাছে আসে, যেমন– সকাল হতে খবরের কাগজ হাতে করে দু-চারজন প্রৌঢ় বুড়ো গাছতলায় একসঙ্গে হয়ে সমাজনীতি রাজনীতি অর্থনীতির আলোচনা করে, দুপুরের দিকে এ-বাড়ি ও-বাড়ির বুড়ি, বৌ, মেয়েরা গাছের নিচে সরু গালিচার মতো ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে সময় কাটায়। আবার বিকেল হতে না হতেই ছুটে আসে ছেলে-ছোকরার দল। গাছটাকে ঘিরে হৈ-হুল্লা ছোটাছুটি, গাছে উঠে ডাল ভাঙা, পাতা ছেঁড়া বা কোনোদিন গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোল খাওয়া। কখনো–বা শীতের দুপুরে গাছের ছায়ায় মাথা রেখে শরীরটাকে রৌদ্রে ছড়িয়ে দিয়ে কারো কারো বই পড়া, আবার গ্রীষ্মের রাতে গাছের তলায় শীতলপাটি বিছিয়ে হারিক্যান জ্বেলে পাঁচ-সাতজন গোল হয়ে বসে তাস খেলা। যখন মানুষ থাকে না তখন গাছতলায় ছাগল-গরু মাথা গুঁজে মনের আনন্দে ঘাস খায়। গাছের ওপরে

নানা জাতের পাখির কিচিরমিচির কলরব, ঠোঁট ঘষার শব্দ। মাঝে মাঝে বাতাসে পাতা নড়ে, ডাল দুলে ওঠে। যখন পাখি থাকে না, বাতাস থাকে না—তখন গাছ স্তব্ধ, নীরব অবিচল থেকে জগৎটাকে অবলোকন করে। তখন গাছ নিজেই যেন মানুষের সত্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়, তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু দেখতে পায়।

গাছ বুঝতে পেরেছিল তাকে ঘিরে পূর্ব দিকের সবুজ ও পশ্চিম দিকের লাল জানালার মানুষ দুটোর দ্বন্দ্ব ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। সবুজ জানালায় বসে থাকা যুবতী– যে রাতদিন গাছটিকে দেখছে, লক্ষ করছে। আগে হয়তো দশটি মানুষের মতো সে গাছের পাতা ঝরা দেখত, নতুন পাতা গজানো দেখত, এখন আর তার সাদা চোখ নেই, কাজল পরে গভীর কালো হয়েছে। গাছ বুঝতে পারে কালো পালক ঘেরা চোখ দুটোর তাকানোর মধ্যে কেবল ভয় না, বিদ্বেষও মিশে আছে। তাই গাছ ভয় পায়। তারপর ঠিকই সবুজ জানালার মানুষটি সবাইকে জানিয়ে দেয়– এই গাছ দুষ্ট, এই গাছ শয়তান। গাছের ডাল শিশুদের মাথায় ভেঙে পড়তে পারে, এই গাছ বজ্রপাত ডেকে আনতে পারে। শুধু তাই নয়, এই শয়তান গাছ মধ্যরাতে যে কোনো মানুষকে ডেকে আনতে পারে, সকালে সবাই দেখবে সেই মানুষটি গাছের কোনো না কোনো একটা ডালে ঝুলে আছে– কাজেই এই গাছের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু লাল জানালার মানুষটির প্রতি গাছের দৃষ্টি পড়াতে গাছ নিশ্চিন্ত হয়। কদিন আগেও যে মানুষটির দৃষ্টি অশান্ত ছিল, চলায়-বলায় চাপল্য ছিল। হাফ প্যান্ট পরে সময়ে-অসময়ে তার কাছে ছুটে এসেছে, ডালপাতা লক্ষ করে ঢিল ছুঁড়েছে, পাতার আড়ালে পাখির বাসা খুঁজে বের করে ভেঙে দিয়েছে, যখন-তখন গাছটিতে দোলনা বেঁধে দোল খেয়েছে– সে আজ মার্জিত-ভদ্র-সুন্দর। লাল জানালার এই মানুষটির কাছে সবাই অন্য কথা শুনল– এই গাছ ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ, একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সকাল-বিকাল অনেক মানুষ এই গাছের নিচে একত্র হয়। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের মনের কাছে টেনে আনছে এই গাছ অর্থাৎ আমাদের সামাজিক হতে শেখাচ্ছে। গাছটি আছে বলেই ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে খেলাধুলা করে একত্রে বেড়ে উঠছে। মায়ের মতো শিশুদের স্নেহ-আনন্দ বিতরণ করছে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা এই বনস্পতি, যার ছায়া সুন্দর, ডাল সুন্দর। নিরীহ সুন্দর পাখিগুলো তাকে আশ্রয় করে সারাক্ষণ কূজন-গুঞ্জন করছে, রঙিন প্রজাপতি ছুটে আসছে। পাড়ার মানুষগুলো যেন নতুন করে ভাবতে শুরু করলো। পশ্চিমের লাল জানালার সুন্দর মানুষটি শুধু সেখানেই চুপ করে থাকল না, আরো বলল :

> ইট, লোহা, সিমেন্টের মধ্যে বাস করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের চোখের সামনে একটি সবুজ গাছ আছে বলে প্রকৃতিকে আমরা মনে রাখতে পারছি। আমরা যে এখনো পুরোপুরি কৃত্রিম হয়ে যাইনি মিথ্যা হয়ে যাইনি তা ওই গাছের কল্যাণে। এই গাছ থাকবে। এই গাছ আমাদের ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত জীবনে একটি কবিতার মতো।[২৮]

মন্দ কথা শুনে মানুষ যেমন বিচলিত হয়, ক্ষিপ্ত হয়, তেমনি ভালো কথা শুনে তারা নিশ্চিন্ত হয়, খুশি হয়, শান্ত হয়। এই গাছ নিয়ে পাড়ার মানুষগুলো আর মাথা ঘামায় না কিন্তু পুবের

সবুজ জানালার মানুষটি চুপ থাকল না। গাছ শুনল– সবুজ জানালার মানুষটি দাঁতে দাঁত ঘষে প্রতিজ্ঞা করছে, শয়তানকে চোখের সামনে থেকে যেভাবে হোক দূর করবে। যদি আর কেউ তাকে সাহায্য না করে তো একাই কুড়াল চালিয়ে গাছকে শেষ করে দেবে। এই কথা পশ্চিমের জানালার মানুষটির কানেও পৌঁছে গেল। গাছ শুনতে পেল, লাল জানালার মানুষটিও বজ্রমুষ্টি শূন্যে তুলে প্রতিজ্ঞা করছে– এই গাছকে যেমন করে হোক রক্ষা করবে, গাছের গায়ে আঁচড়টি পড়তে দেবে না। যদি কেউ গাছের গায়ে হাত তুলতে আসে তবে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রতিহত করবে। গাছ নতুন করে ভয় পায়, তাকে কেন্দ্র করে লাল-সবুজ দুটি জানালার মানুষের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষ বাঁধবে না তো! সেদিন গভীর রাতে চারদিকে যখন নিঃসীম অন্ধকার আর অমেয় স্তব্ধতা, সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারেও দিনের আলোর মতো গাছ সবকিছু দেখতে পেল। গাছ দেখল, পূবদিকের মানুষটির হাতে কুড়াল আর পশ্চিমের জানালার মানুষটির হাতে লাঠি। গাছ যেন মানুষ রূপে কান পেতে রইল। গাছ দেখল, দুজনের মাঝে তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে একজনের হাত থেকে কুড়ালটা খসে পড়ল, তখন অন্যজন ফেলে দিল তার হাতের লাঠি। এখানে কেবল গাছের পার্সোনিফিকেশন ঘটেনি, তা সর্বপ্রাণবাদী তত্ত্বের সত্যকেও আলিঙ্গন করে। যে গাছকে শয়তান মনে করে সে একসময় গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝিকমিক আলো দেখতে লাগল। প্রেম-ভালোবাসাহীন জীবনেই যেন সব অন্ধকার। যখন নিজের ভিতর প্রেম জাগে, আলো জাগে তখনই সবকিছু সুন্দর আলোময় মনে হয়। আর সেজন্য দরকার সুন্দরের চর্চা, ভালোবাসার চর্চা। লাল জানালার মেয়েটি সবুজ জানালার ছেলেটির কাছে সেই দীক্ষাই পেল। লালের আলোকিত প্রেমময় স্পর্শে সবুজ জানালার মানুষটির ঈর্ষাকাতরতা থেকে মুক্তি ঘটল। গাছকে ঘিরে মানুষে মানুষে সংঘর্ষ সম্ভাবনাকে প্রেমের দীক্ষায়, সুন্দরের দীক্ষায়, নর-নারীর সান্নিধ্য-সমন্বয়ের মাধ্যমে লেখক বানচাল করে দিয়েছেন। অতঃপর :

> গাছ চোখ বুজল। তার ঘুম পেয়েছে। গাছও ঘুমায়। কত রাত দুশ্চিন্তায় সে ঘুমাতে পারেনি। অথবা যেন ইচ্ছা করে সে আর নিচের দিকে তাকাল না। মানুষ যেমন গাছ সম্পর্কে উদাসীন থাকে, গাছকেও সময় সময় মানুষ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হয়, অভিজ্ঞ গাছকে তা বলে দিতে হল না।[২৯]

যে গাছ আমাদের অক্সিজেন ছড়ায়, রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে ডালপালা ছড়িয়ে আশ্রয় রচনা করে, যে গাছের ছায়ায় মানুষ আশ্রয় নেয়– সেই গাছের প্রতিই মানুষ কত উদাসীন। তার বুকে যথেচ্ছ কুড়াল চালায়, ফুল ছিঁড়ে, পাতা ছিঁড়ে কিন্তু গাছ নীরবে সব সহ্য করে। গাছের কাছ থেকেই যেন লেখক প্রেমের দীক্ষা, সহিষ্ণুতার দীক্ষা নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রকৃতি-নির্ভর গল্প রচনায় জ্যোতিরিন্দ্র বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন, আর এর প্রধান কারণ তাঁর ইন্দ্রিয় সচেতনতা। আজীবন প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধে নিজেকে নিমজ্জিত রেখে চারপাশ আবলোকন করেছেন। 'সামনে চামেলি' গল্পটিতে আমরা দেখব নিসর্গ-প্রকৃতিই সেখানে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। গল্পের কথক প্রথমপুরুষ আর

উত্তমপুরুষের অদলবদলে দুর্বল বিকলাঙ্গ শরীরের দুর্বহ ভারকে প্রকৃতির কাছে মেলে ধরে। সাতাশ বছর বয়সের এক যুবক বন্ধুর মায়ের জন্য ডাক্তার ডাকতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ে একটি পা হারানোর পর তাকে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। দুর্ঘটনার জন্য স্কুল ফাইনালের পর পড়াশুনা আর এগোয়নি। বন্ধুর বাবার চেষ্টায় সাতবছর ধরে সে কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। আজ মাইনে দাঁড়িয়েছে একশ কুড়িতে এবং দুবেলা দুটি টিউশনিতে মাসিক রোজগার চব্বিশ টাকা। বুড়ো মা-বাবা আর তিন ভাইবোন নিয়ে সংসারের মোট ছয়জন খাইয়ে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর যতটুকু পুষ্টিকর খাবার বা ভিটামিন দরকার ছিল তার কিছুই সে খেতে পারেনি। বেশভূষা মলিন, চেহারাও ম্লান-বিষণ্ন, স্বাস্থ্য দুর্বল-নিস্তেজ, রক্তশূন্য। বিকলাঙ্গ শরীর ও দারিদ্র্য তাকে নিঃস্ব করে রেখেছে। নানারকম হীনম্মন্যতা মানুষ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। সেই সঙ্গে আশাতীত রকম ভীরু এবং অনাবশ্যক রকম লাজুক। ফলে নির্জনতা আর ফাঁকা রাস্তাই তার প্রিয়।

এতকিছু না থাকার মাঝেও তার আছে সুন্দরের পিপাসা, রূপের তৃষ্ণা, পরিচ্ছন্নতার মোহ, অতিমাত্রায় রোমান্টিকতা। অতিরিক্ত খাটুনি, খারাপ স্বাস্থ্য কোনো কিছুরই ভ্রূক্ষেপ নেই। যতক্ষণ ছেলে পড়ানোর পড়ায়, যতক্ষণ স্কুলে থাকার থাকে। আর বাকি সময় খোঁজে সুন্দরকে :

> বাকি সময়টা ক্রাচ ঠুকে ঠুকে হাঁটছে, সুন্দর কিছু খুঁজছে সে সুন্দর পরিচ্ছন্ন মার্জিত– তাই এই নির্জন বিশাল রাস্তাটায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয় সারা জীবন সে যে-সব স্বপ্ন দেখেছে এখানে প্রায় তার সবকিছুই ছবি হয়ে চুপ করে আছে।[৩০]

শত প্রতিকূলতায়ও মনোহর তার রূপপিপাসু মনটাকে কিছুতেই নষ্ট হয়ে যেতে দেয়নি। তার সৌন্দর্যসন্ধানী মন ছেলেবেলা থেকেই মার্জিত কিছু খুঁজছে– একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ আশার মতো। ভালো কিছু দেখবে, সুন্দর কিছু পাবে, হাত বাড়ালেই পাবে। পরিচ্ছন্ন নয়নাভিরাম শ্রীসম্পন্ন কোনো জগতে একদিন গিয়ে দাঁড়াবে। সে জানে এটা তার দূরাকাঙ্ক্ষা– তারপরও মনোহর কিছু খুঁজছে। একদিন এক ভদ্রলোকের হাতে লাল গোলাপের তোড়া দেখে স্কুলের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে প্রায় এক মাইল পথ পাগলের মতো মানুষটার পিছু পিছু ছুটে গিয়েছে, সংকোচ কাটিয়ে একটি গোলাপ চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধমক খেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে– প্রায় কুড়ি মিনিট দেরি করে ক্লাসে ঢোকায় মাস্টার মাশাইয়ের বেতের বাড়ি জোটে। একদিন মা দোকান থেকে জিনিস কিনতে পাঠালে– সেকথা ভুলে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অর্ধেক দুপুর ময়ূরের পেখম ধরা দেখল। আর একদিন বিকেলে খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার পথে আচমকা বুনো ফুলের গন্ধের মতো অদ্ভুত সুন্দর একটা গন্ধ নাকে লাগায় থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বুনো ফুলই বটে। ফুলের মতন টাটকা ঝকঝকে কটি মুখ। ফুলের মতো এতগুলো সুন্দর মুখ এল ও চকিতে অদৃশ্য হল ভীষণ ধাক্কা লেগেছিল তার বুকে। তারপর প্রায় একটা মাস, রোজ বিকেলে ঠিক ওই সময়টায় রাস্তার সেই লাইটপোস্টের

নিচে গিয়ে সে দাঁড়াত আর উদাস নয়নে এদিক-ওদিক দেখত–কিছু খুঁজত। আজ এই সাতাশ বছর বয়সেও সে মনোহর পরিচ্ছন্ন মার্জিত কিছু খুঁজছে। তাই স্কুল থেকে বাড়ি না গিয়ে দুর্বল-ক্ষুধার্ত শরীরটাকে ক্রাচে ঠুকেঠুকে এই সুন্দর নির্জন অভিজাত রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। রাস্তার দুপাশে রাধাচূড়া, তারপর মে-ফ্লাওয়ার আবার রাধাচূড়া, মে-ফ্লাওয়ারের বদলে কখনো ইউক্যালিপ্টাস। সাজানো এই রাস্তার দুপাশে উঁচু উঁচু বাড়ি আর ফুলে ফুলে সাজানো ব্যালকনি। একটায় মাধবীলতা, পরেরটায় হয়ত হাস্নাহেনা, একটু এগিয়ে গেলেই চাঁপা কি বকুল। হঠাৎ করে জায়গাটা বড় বেশি নির্জন মনে হয়, নিজেকে অতিরিক্ত নিঃসঙ্গ মনে হয়। সে চেয়েছিল চেন্-বাঁধা কুকুরটা ভীষণ রেগে গিয়ে গর্জন করে উঠুক, প্রেসার কুকারটা আর একবার জোরে হিসহিস করে উঠুক। অন্তত কোনো গাছের ডালে একটি পাখির ডানার ঝাপটা অর্থাৎ ক্ষীণতম একটি শব্দ হোক যাতে সেই একফোঁটা শব্দের আড়ালে সে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু চারপাশ নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ আঁটোসাঁটো বিস্ফারিত খোঁপা, দীর্ঘাঙ্গী এক যুবতী এতটাই ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে যে রেলিং এবং লতা-ঝোপ ডিঙিয়ে নয়নাভিরাম শাড়ির আঁচল যেন তার মাথা ছোঁবে। চোখ নামিয়ে হাতের আঙ্গুলগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে। চারদিকের অপার নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতায় বিব্রত ও সংকুচিত হয়ে পড়ে– এত প্রত্যক্ষ, এত নিকটবর্তী! কিন্তু তারপরই নিস্তব্ধতা ভেঙে কুকুরের ঘেউ ঘেউ, প্রেসার কুকারের হিসহিস, রাস্তার দুপাশের অগুনতি রাধাচূড়া, মে-ফ্লাওয়ার, মাথার ওপর ইউক্যালিপ্টাস গাছটার পাতার ঝরঝর। আর ঠিক তখনই তার কানে এল ওপর থেকে কেউ যেন একটা-দুটা মুদ্রা, দু–নয়া পাঁচ নয়া– বনেদী পাড়া, সিকি আধুলি হতে ক্ষতি কি, পেভমেন্টের ওপর ছুঁড়ে দিল। সে আশান্বিত হয়েছিল রাস্তাটায় সে নিঃসঙ্গ নয়, নিশ্চয়ই এক-আধজন ভিখিরি কোনো গাছতলার অন্ধকারে বসে আসে। সে সঙ্কোচ কাটিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে উপরে চেয়ে দেখল ব্যালকনি থেকে যুবতী তখন আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। অসীম ধৈর্য, পর্বতসম প্রত্যাশা নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়– সামনে আরো ব্যালকনি, সারি সারি বাড়ি, একটার পর একটা রাধাচূড়া, মে-ফ্লাওয়ার, মাঝে মাঝে একটা-দুটা মনোরম ইউক্যালিপ্টাস বা অন্তত দেবদারু বৃক্ষ থাকতে বাধা কী? আরো এগিয়ে যাচ্ছে, স্বপ্ন খুঁজছে, শুকনো পাঁজরের নিচে রমণীর আশা নিয়ে মসৃন চকচকে রাস্তায় চলে আসে। চলতি পথেই ওই বাড়ির চাকর তাকে জিজ্ঞেস করে, 'দিদিমণি পয়সা ছুঁড়ে দিল তুমি নিলে না, চলে যাচ্ছ!'... 'ওই দ্যাখো দিদিমণি আবার এসে দাঁড়িয়েছে, জিজ্ঞেস করছিল যদি পয়সা না নাও, পুরোনো শার্ট পাঞ্জাবি আছে, নেবে কি?'[৩১] হেসে মাথা নেড়ে শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে ঠুক ঠুক করে ঠিক এগোতে লাগল– যেন সামনে কোথাও চামেলি ফুটেছে, গন্ধ পাচ্ছে। মনে সংকট নিরসনে প্রকৃতিই যেন সহায়। তাই সৌন্দর্যপিয়াসী মন এই অবহেলাকে অবজ্ঞা করে ফুলের সুরভীতে জীবনের মানে খুঁজে বেড়ায়। সেজন্য তার এই এগিয়ে যাওয়াকে নিলয় বক্সী দেখেছেন, 'তার স্বপ্ন মরেনি, সুন্দরকে খোঁজাও শেষ হয়নি– তাই তার এরূপ পথ চলা।'[৩২] এই আকস্মিক পরিবর্তনের বাস্তব পটভূমি যে প্রকৃতি তা রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পে দেখতে পাওয়া যায় : 'সেই

পুষ্করিণী, সেই পথ, সেই তরুতল, সেই প্রভাতের রৌদ্র এবং সেই হৃদয়ভারানত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাৎ সে তাহার সহস্র অর্থ বুঝিতে পারিল।'[৩৩]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বহুমাত্রিক তাৎপর্যে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে মানব প্রকৃতি, তার মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, তার অস্তিত্বের বা মানবসত্তার অন্তর্লোকের সঙ্কট সবকিছুই তাঁর গল্পে তুলে এনেছেন। শিশুর মনস্তত্ত্ব নিয়ে তাঁর একটি বিখ্যাত গল্প 'চোর'। 'চোর' মনস্তত্ত্বনির্ভর, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সমাজ সমস্যাজনিত বাস্তবতার গল্প। গল্পটিতে একটি পেঁপেচারাকে কেন্দ্র করে বিষয়ভাবনা আবর্তিত হয়েছে। যে চারাটি গল্পের উত্তমপুরুষ কথক নিম্নবিত্ত আত্মসচেতন কিশোর মিন্টু স্কুল থেকে ফেরার পথে রাস্তার নর্দমার পাশ থেকে তুলে আনে। পেঁপেচারাটির ঠাঁই হলো মিন্টুদের রান্নাঘরের পিছনে ছাই আর জঞ্জাল নিয়ে চার-পাঁচ হাত এক টুকরো জমিতে। জায়গাটি দিনরাত ছায়ায় ঢাকা থাকে, এছাড়া একটি বড় যজ্ঞডুমুর গাছ ডালপালা ছড়িয়ে জমিটা অন্ধকার করে রেখেছে। যেখানে অন্য কোনো চারা বা গাছ মাথা তুলতে সাহস পায় না। মিন্টুর বাবা নিম্নমধ্যবিত্ত একজন কেরানি। তিনি গাছটিকে কখনো কাটেননি বা কাটতে দেননি কারণ গাছটি কাটলে বাড়ির পিছনটা একেবারে বে-আব্রু হয়ে পড়বে। যজ্ঞডুমুর গাছটি ছিল অর্থনৈতিকভাবে বে-আব্রু পরিবারটির আব্রুর প্রতীক। মিন্টু যখন চারাটি মাটিতে পুঁতে, ঠাণ্ডাজল দিয়ে চারাটিকে গোসল করিয়ে দাঁড়ায় ঠিক তখনই এ বাড়িতে মদনের প্রবেশ ঘটে। মদন সুকুমারদের বাড়ির একসময়ের ছোকরা চাকর। ব্যামোতে আক্রান্ত হয়ে ও বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। এখন সে আশ্রয় খুঁজছে। মিন্টুর অসহায় কেরানি বাবার দ্বিধাদ্বন্দ্ব দোলাচলে তিন টাকা মাইনেতে মদন কাজে বহাল হয়। মদনের মুখে হাসি ফুটে, হ্যারিকেনের আলোতে মিন্টু সে হাসিমুখ দেখতে পায়। ভালোবাসা-আদরে মদন যেন মিন্টুদের বাড়িরই একজন হয়ে ওঠে। পেঁপেচারার ওপর থেকে অন্ধকার দূর করার জন্য মদন ডুমুর গাছের বড় বড় চারটি ডাল কেটে ফেলে– ফটফটে রোদের মুখ দেখে চারাটা হাসতে লাগল। পাঁচদিনের মাথায় পেঁপেচারাটার আরো দুটি কুঁড়ি-পাতা দেখা গেল। সব মিলিয়ে ছয়টি ডাঁটা আর পুতুলের ছাতার মতো ছোট পাতা হয়েছে– এখন আর চারা নয়, রীতিমতো একটি গাছ বলা চলে। বাগান করার নেশা তাদের পেয়ে বসে। মদন জায়গাটাতে আতা, করমচা, বাতাবি লেবু, পেয়ারার চারা লাগাতে চায়। কিন্তু এসব চারা পাওয়া সহজলভ্য নয়। চুরি করতে হবে, মদনের মুখেই প্রথম চুরি শব্দটির প্রকাশ ঘটে। মদনের রাগ যেন প্রতিহিংসায় রূপ নেয়, 'সুকুমারদের বাড়ির পিছনের পাঁচিল টপকে বাগানের সব ফল আর মূলের চারা নিয়ে আসব। যেগুলো আনতে পারবো না, ভেঙে মুচড়ে নষ্ট করে রেখে আসব।'[৩৪] মদন একথা বলেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি, সে আরো বলেছে, সুকুমারের ব্যারিস্টার বাবা মদ খায়, ওদের টাকা-পয়সা কিচ্ছু থাকবে না। গাড়ি-বাড়ি সব বিক্রি হয়ে যাবে, এসময় তাদের মতো গরীব হয়ে যাবে– তখন খুব মজা হবে। এসব ভেবে ভেবে মদন উল্লসিত হয়। লাটসাহেবের ছেলের জুতো বুরুশ

করতে করতে মদনের হাতে ফুসকা পড়ে যেত। সেই সুকুমারদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়ার ফলে তার ভিতর একধরনের রাগ-ক্ষোভ বাসা বাঁধে। অর্থনৈতিক অসমতার ফলে কিশোর মিন্টুর ভিতরও একধরনের ঈর্ষাবোধ কাজ করত, আর নানা কথা বলে বলে মিন্টুর ঈর্ষাবোধকে জাঁকিয়ে তোলে মদন। ফলে মদনের নানা কূটকৌশলে মিন্টুও সায় দেয়। মিন্টু জানে, সুকুমারের সঙ্গে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট। ব্যারিস্টারের ছেলে ভালো জামাজুতো পরে স্কুলে আসে আর সে যায় খালি পায়ে– জামাপ্যান্ট ময়লা, ছেঁড়া। সুকুমার তার সঙ্গে মেশা দূরের কথা কোনোদিন কথাই বলেনি।

একদিন এক অদ্ভুত প্রতিশোধস্পৃহায় কোথা থেকে ছুটে এসে পা দিয়ে রাস্তার জল ছিটিয়ে সুকুমারের সাদা ধবধবে মার্টিনের শার্ট-প্যান্ট নোংরা করে দিয়ে মদন ছুটে পালাতে চাইলে সুকুমারদের মালী ভূষণ ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে। মদনকে হিড়হিড় করে ভূষণ সুকুমারদের বাড়িতে টেনে নিয়ে যায়। মদনের কুকীর্তি, সম্ভাব্য শাস্তি, না ফেরার দুশ্চিন্তা ইত্যাদি নিয়ে ভাবলেও আত্মসম্মানবোধ থেকে মিন্টুর বাবা সুকুমারদের বাড়িতে যেতে অপারগতা প্রকাশ করে, ফলে মিন্টুকেই মদনের খবর আনতে যেতে হয়। বাড়ির ভিতরে ঢুকতে হয়নি, সুকুমারদের গেটের সামনে শিউলি গাছের তলায় মিন্টু থমকে দাঁড়ায়। মদন খুব ব্যস্ত। বালতি করে ভিতরের চৌবাচ্চা থেকে জল এনে গাড়ি পরিষ্কার করছে। মিন্টুর চোখাচোখি হতেই ফিক করে হেসে মদন বলল :

> শোন। তোর মাকে বলিস আমি তোদের বাড়ি কাজ করব না। এখানে লেগে গেছি। গিন্নীমা কাল রাতে বলল ওরা গরীব মানুষ। নিজেদেরই চলে না, তো ও বাড়িতে তুই থাকবি কি।[৩৫]

এ শুধু গিন্নিমার বক্তব্য নয়, এ যেন নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে মদনেরও উপলব্ধি– তাই মিন্টুর মুখের উপর রূঢ় সত্যটি জানিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। বিত্ত-বৈভবের কাছে আদর-ভালোবাসা সব তুচ্ছ হয়ে যায়। মদন নিজে যেমন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রয়োজন অনুভব করেছে তেমনি পেঁপেচারাটিরও নিরাপদ আশ্রয়ের কথা চিন্তা করে মিন্টুদের বাগান থেকে পেঁপেচারাটি চুরি করে নিয়ে যায়। যার আশ্রয় হয় সুকুমারদের আলো-বাতাসযুক্ত বাগানে। তারপর ছমাস কেটে যায়। মিন্টুর পরীক্ষাও শেষ হয়। গল্পটি আবার নতুন দিকে বাঁক নেয়।

পরীক্ষার পর একটি ডিটেকটিভ বইকে উপলক্ষ্য করে সুকুমার ও মিন্টুর মধ্যে গাঢ় নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়। সুকুমারদের বাড়ির ঘরে বসে কখনো গল্প করে, কখনো প্রকাণ্ড ছাদে উঠে বেড়ায়, কখনো বা বাগানে নেমে যায়। প্রকাণ্ড বাগান– একধারে ফুলের গাছ, অন্য ধারে ফলের গাছ। একসময় দুজনে একটা গাছের কাছে এসে দাঁড়ায়– দীর্ঘ কাণ্ড, লম্বা ডাঁট, সতেজ সবুজ ছড়ানো পাতা নিয়ে একটি সুন্দর পেঁপে গাছ। কেবল ফলতে শুরু করেছে। সুকুমার বলে, 'ওটা এনে লাগিয়েছে মদন–আমাদের চাকর– এইটুকুন গাছ ছিল, দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল।'[৩৬] মিন্টুর কিশোর মন ভীষণভাবে নাড়া খায়, ভীষণ অভিমান তৈরি হয়, কষ্ট

পায়, কি যেন বলতে গিয়ে থেমে যায়, অন্য পাশটায় চলে যায়। কিন্তু কিছু বলে না, মাকেও সে কষ্টের ভাগ দেয়নি। মদন আর পেঁপেচারা যেন উপযুক্ত জায়গার সন্ধান পেয়েছে। নিম্নবিত্তের সংসারের টানাপড়েন তাছাড়া রান্নাঘরের পিছনের ছায়ায় ঢাকা স্যাঁতস্যাঁতে জমির চেয়ে ও বাড়ির রোদেলা বিশাল বাগানের মাটি ওর কাছে প্রিয় হবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রকৃতি পাগল মিন্টু যতবার সুকুমারদের বাড়িতে গিয়েছে ততবারই বাগানের কাছে ছুটে গিয়েছে, এমন সবুজ-সতেজ যৌবনের লাবণ্যে মণ্ডিত পেঁপে গাছটা তাকে বড় বেশি টানতে লাগল। এক একসময় একটা ভয় ডেলা পাকিয়ে তার গলার কাছে ঠেকে যায়– তার বার বার মনে হয়, মদন পেঁপেচারাটি চুরি করে নিয়ে যায়নি, পেঁপেচারাটিই মদনকে তাদের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। শুধু মদনকে নয় মিন্টুও যেন সুকুমারদের ঐশ্বর্যে নিজের সত্তাকে বিসর্জন দিতে বসেছিল। নয়তো নিজের ছোট উঠান, টিনের ঘর, ছায়া-ডাকা ডুমুরতলার কথা ভুলে গিয়ে সারাক্ষণ বড়লোক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারত না। সে যেন সম্বিত ফিরে পায়, নিজের শিকড়ে ফিরে আসে। আত্মসচেতন সংবেদনশীল মিন্টু ঐশ্বর্যের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে এসে মায়ের পায়ের কাছে চুপ করে বসে থাকে। কী হয়েছে মা প্রশ্ন করলে তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে, কোনো উত্তর যেন জানা নেই, কেমন করে বলবে বিত্ত-বৈভবের কাছে সে যেন চুরি হয়ে গিয়েছিল। তাই নিজের ভিতরেই তার বোধের অনুরণন ঘটে:

> আমি কি বলতে পারতাম রোগা ময়লা কাপড় পরা তোমার শুকনো মুখের কথা ভুলে গিয়ে ও-বাড়ির শাড়ি গয়না পরা প্রগল্‌ভ-স্বাস্থ্য সুকুমারের মার দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আর কখন তিনি সাদা পাথরের বাটিতে করে আমাকে ও সুকুমারকে আপেল আনারস কেটে দেবেন সেই সোনা-ঝরা বিকেলের অপেক্ষায় আমি শুকিয়ে থাকতাম– থাকতে আরম্ভ করেছি। আর কোনোদিন আমি ও-বাড়ি যাইনি।[৩৭]

'চোর' গল্পটিতে পেঁপে চারাটিকে কেন্দ্র করে মদন, মিন্টু ও সুকুমারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পাশাপাশি তিন কিশোরের জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরূপের পরিচয় মেলে। গল্পের মূলচরিত্র গল্পকথক মিন্টু অত্যন্ত স্পর্শকাতর, আত্মসচেতন। আর্থিক প্রতিকূলতা এবং অসম সমাজব্যবস্থা সত্ত্বেও আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে সুকুমারদের বিত্ত-বৈভবের সান্নিধ্য থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনে, আত্মসচেতন মিন্টু একদিন নিজেকে যে শপথ বাক্য পাঠ করায় তারই বাস্তবায়ন ঘটায়, সে আর কোনোদিন সুকুমারদের বাড়িতে যায়নি। এ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য :

> মিন্টুর নিজ নিম্নবিত্ত শ্রেণী-সচেতনতাই অভিমানে, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে, আত্ম-আদরে সুকুমারদের সুখ-সমৃদ্ধি থেকে তাকে সরিয়ে আনে। মিন্টু চরিত্রের এই ব্যঞ্জনাই গল্পের লক্ষ্য। পেঁপেগাছের প্রতীকে মিন্টুর এই যে মানসিক টানা-পোড়েন এবং স্ব-স্থানে ফিরে আসা– এতেই কেন্দ্রীয় চরিত্রের গভীরতা অতলশায়ী হয়ে ওঠে।[৩৮]

লেখকের 'চোর' গল্পে গভীর প্রতীক, ব্যঞ্জনা নিহিত আছে। পেঁপেচারটিকে কেন্দ্র করে লেখক তিন কিশোরের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা উন্মোচনের পাশাপাশি শ্রেণিবিভক্ত সমাজতত্ত্বের একেবারে গভীর তাৎপর্য-অর্থের বিস্তার ঘটিয়েছেন। একটি পেঁপেচারাকে প্রতীকায়নের মাধ্যমে লেখক সর্বহারা নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মধ্যে আত্মসম্মানের প্রচ্ছন্ন সংঘাত-সংকট, দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এ গল্পের সামাজিক শ্রেণি-চেতনার অস্তিত্ব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় অধিকাংশ রচনায় লক্ষ করা যায়। তবে 'চোর' গল্পের মিল পাওয়া যায় মানিকের প্রথমদিকের রচনার সঙ্গে, যেখানে একক ব্যক্তি ও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ব্যক্তির ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারছে না, তার হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে অনবরত প্রতিরোধহীন। অথচ এই প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির ভেতর কোথাও উজ্জীবিত হতে চায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না।[৩৯]

নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নাগরিক নিষ্করুণতার পরতে পরতে প্রকৃতি বা প্রকৃতির রসকে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। তিনি গল্পকার হিসেবে কল্লোলীয় বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে সরে এসে প্রকৃতিকে দেখেছেন বহু মাত্রিকতায়। তাঁর আশৈশব প্রকৃতিসংলগ্নতা এবং আজীবন প্রকৃতির রূপ-রস-শব্দ-গন্ধে ইন্দ্রিয় নিমজ্জিত থাকায় পরবর্তী জীবনে সাহিত্যসৃষ্টিতে এই ইন্দ্রিয়জ সচেতনতা অনেক সাহায্য করেছে। সমাজবিচ্ছিন্নতা থেকে ব্যষ্টির ভাঙন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের প্রধান অনুষঙ্গ। বাংলা গল্পকারদের বিশশতকীয় আঙিনায় দাঁড়িয়ে তিনি নিরাসক্তভাবে ব্যষ্টির বিচ্ছিন্নতাকে অবলোকন করেছেন এবং প্রকৃতির আলোকে তার অন্তর্লোক উন্মোচন করেছেন। তাঁর গল্পের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ব্যক্তির অন্তর্লোকের বহুমাত্রিক টানাপড়েন। লেখকের সৌন্দর্যপিপাসু মন বাস্তবজীবনের সবকিছু ছাপিয়ে দেখতে চেয়েছে সৌন্দর্যকে। তিনি প্রতিনিয়ত লক্ষ করেছেন– শহরের মানুষ ক্রমশ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ইট-পাথর-কারখানা আর যন্ত্রে। ক্রমে ক্রমে শেকড়ের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ড্রয়িং রুমে ঝোলানো প্রকৃতির ছবি বা বারান্দায় রাখা টবের মেকি সৌন্দর্যে তৃপ্ত শহরবাসীদের জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিয়ে যেতে চেয়েছেন, আদিমকাল থেকে পৃথিবীর সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক– সেই আদিম সৌন্দর্যের কাছাকাছি।

নানান বিচারে অনেকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কেননা রচনাশৈলী, বিষয়গত বৈচিত্র্য ও ভাষাগত দিক বিবেচনায় তিনি পুরোপুরি পৃথক। এ-দিক দিয়ে জীবনানন্দ দাশের কবিতার সঙ্গে অনেকটা মিল পাওয়া যায় বলে তাঁরা মনে করেন। এ-সম্পর্কে সরসিজ সেনগুপ্ত বলেন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো ইন্দ্রিয়ঘন, sensuous বাংলাগদ্য আর কেউ লেখেননি বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। রূপ-রং-স্পর্শ-গন্ধ-র শব্দজ বর্ণনায় তিনি অতুলনীয় এবং এটি তাঁর রচনাশৈলীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যও বটে। এদিক থেকে একমাত্র জীবনানন্দ দাশের কবিতার সঙ্গেই বোধহয় তাঁর গদ্যের তুলনা চলে।[৪০] তবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বিশ্ববীক্ষা ও রচনাশৈলীর

বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রশিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সংকট উত্তরণের আভাস প্রদর্শনে মানিক অগ্রগামী। তপোধীর ভট্টাচার্য বলেন,

> মূল্যবোধ হারিয়ে জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি কীভাবে আত্মিক সংকটে দীর্ণ হচ্ছে অহরহ, চোরাবালিতে ডুবতে ডুবতে যাই আঁকড়ে ধরতে চাইছে খড়কুটো– তার বিধ্বস্ত রূপকার হিসেবে হয়তো মানিক ও জ্যোতিরিন্দ্র সহযাত্রী। কিন্তু পুর্বসূরির তুলনায় জ্যোতিরিন্দ্র যেখানে স্বভাবত স্বতন্ত্র, সেইটে হল মানিকের উত্তরণ-আভাস তাঁর গল্পের ভুবনে সাধারণত অনুপস্থিত।[৪১]

নাগরিক গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখকসত্তা, চিন্তা-চেতনার মূলস্রোতটি প্রকৃতিকেন্দ্রিক হলেও মানব প্রকৃতি, মনস্তাত্ত্বিক জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব, অস্তিত্ব, ব্যষ্টির অবয়ব, মানবসত্তার চেতনা বা মননগত বোধের সংকট, সবকিছুই তুলে ধরেছেন সবুজ-সরল ও প্রাণবন্ত প্রকৃতির বিশাল ক্যানভাসে। তাঁর গল্পের আদ্যন্ত মোড়ানো রয়েছে প্রকৃতির প্রচ্ছদ। তিনি প্রকৃতির পটে মানবমনের অন্তর্লোকের চাপা রহস্যের উন্মোচন করেছেন নির্ভীক ডুবুরির মতো। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের চিরায়ত সম্পর্ককে খুঁজেছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তাঁর লেখায় প্রকৃতি কোথাও চরিত্রের অন্তর্গত সুখ-দুঃখ, বিষণ্নতা-নিঃসঙ্গতার ধারক হয়ে উঠেছে, আবার কোথাও প্রকৃতি নিজেই মানবসত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এখানেই বিভূতিভূষণ, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি দর্শন থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য। রোমান্টিক কৌতূহলে বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে অনুসন্ধান করেছেন, রহস্যের জটের উৎসকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন। তাঁর কাছে প্রকৃতি জীবনেরই একটা অংশ। প্রকৃতি দর্শনে তাঁর আছে সহজ-সরল বালকের মতো অসীম কৌতূহল। তাঁর প্রকৃতি সহজ-সাবলীল। রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতিকে আবিষ্কার করেছেন তা কবির আবেগে দীপ্ত, রঞ্জিত। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রকৃতি মানবমনের জটিল মর্মযন্ত্রণার ধারক। তিনি তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদ অনুভব করে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির কথা, প্রকৃতির পটে মানবমনের অন্তর্লোকের কথা তাঁর গল্পে তুলে এনেছেন। প্রকৃতির পটে মানুষের সম্পর্কের বহুমাত্রিক বিন্যাস উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে।

তথ্যনির্দেশ

১. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *আনোয়ার পাশা রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২১৯

২. আহমদ রফিক, *ছোটগল্প : পদ্মাপর্বের রবীন্দ্র-গল্প*, রূপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৬৩-৬৪

৩. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, "বিভূতিভূষণের গল্প : বাস্তবতার দৃষ্টিকোণে", *গল্প পাঠকের ডায়ারি* (সম্পা. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৮৪

৪. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'আমার সময় এবং আমার লেখালেখি', *জনপদপ্রয়াস* (সম্পা : বিকাশ শীল), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, হুগলি, ২০০৪, পৃ. ৬

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭
৬. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*, (সম্পা. নিতাই বসু), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৩১
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
১১. সুনন্দা মল্লিক, '*সমুদ্রের স্বর : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী*', *উজাগর* (সম্পা. উত্তম পুরকাইত), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা-১৪১৭, উজাগর প্রকাশন, হাওড়া, ১৪১৭, পৃ. ২৯৫
১২. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, *গল্পসমগ্র-১*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৫২০
১৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৪৩৩
১৪. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, *গল্পসমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৫
১৫. রঞ্জনা দত্ত, *স্রোতের বিপরীতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী*, রাজলক্ষ্মী প্রিন্টার্স, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৪১
১৬. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*, (সম্পা. নিতাই বসু), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৭
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
১৯. অরুণাভ মিত্র, "প্রাচীন ভাবকল্পের রূপময় আখ্যান: প্রসঙ্গ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী", *সময় তোমাকে* (সম্পা. সোমনাথ দাস), পঞ্চম বর্ষ বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১২৯
২০. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬
২৬. অসীম সামন্ত, *হ্যাঁ, না, এবং জ্যোতিরিন্দ্র ও সন্দীপন*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৮৩
২৭. দেবলীনা মুখোপাধ্যায়, *পরিবেশ-ভাবনা ও প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩২
২৮. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬
৩২. নিলয় বক্সী, "সামনে চামেলি : এক ভিন্নস্বাদের গল্প", *গল্পচর্চা* (সম্পা. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ও বিশ্বজিৎ কর্মকার), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৮০২
৩৩. *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ১২ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৩০৭
৩৪. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭
৩৮. বীরেন্দ্র দত্ত, বাং*লা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড)*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৩১
৩৯. সাহেদ মন্তাজ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তরালে কথকতা*, দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৩
৪০. সরসিজ সেনগুপ্ত, "চোর : অপহৃত আকাঙ্ক্ষার গল্প", *বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক* (সম্পা. শ্রাবণী পাল), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৮৯
৪১. তপোধীর ভট্টাচার্য, *ছোটগল্পের অন্তর্ভুবন*, মহাজাতি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১১৩

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ছত্রিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/জুন ২০১৮

ওয়ালীউল্লাহ্‌র ইংরেজি উপন্যাসের বিষয়বস্তু

মোস্তাক আহমাদ দীন*

সারসংক্ষেপ

বাংলা ভাষায় লিখিত তিনটি উপন্যাসের ভিত্তিতে পাঠক ও সমালোচকসমাজে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে যে-ধারণা তৈরি হয়েছিল, ইংরেজি উপন্যাস দুটি—*দি আগলি এশিয়ান* ও *হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিন্‌স*—প্রকাশের পরে সেই ধারণায় পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। এমনিতেই *লালসালু*-র লেখকের সঙ্গে ভিন্নচেতনার দুই উপন্যাস *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো*-র লেখককে মেলাতে হিমশিম খেতে হয়েছে, তার উপর এই মধ্যবর্তী সময়ে—১৯৪৮ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে—লিখিত ইংরেজি উপন্যাস দুটি যখন সামনে এল, তখন বোঝা গেল এই লেখককে নির্দিষ্ট ধারণায় চিহ্নিত করা মুশকিল। মুশকিল বটে, তবে, এই সূত্রে, তাঁকে এভাবে মূল্যায়ন করা যায় যে, স্থান ও পরিপ্রেক্ষিতের ক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসে স্বদেশপ্রাধান্য থাকলেও স্বভাব ও বিষয়গত ক্ষেত্রে তিনি আন্তর্দেশিক। ইংরেজি/পর ভাষা নির্বাচনও অনেকটা সেই কারণে; আর এতে, উপনিবেশের মোকাবেলায় তার অবস্থানও কোনোভাবে অস্পষ্ট নয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ইংরেজি ভাষায় লিখিত দুটি উপন্যাস *দি আগলি এশিয়ান* ও *হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিন্‌স* প্রকাশিত হওয়ার পরে তাঁর উপন্যাসচিন্তা ও উপন্যাসের প্রবণতা বিষয়ে কথা বলা কিছুটা সহজ হয়েছে। দুটি বইয়েরই অনুবাদক শিবব্রত বর্মন।[১] বইয়ে অনুবাদবিষয়ে অনুবাদকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ উল্লেখ না থাকলেও বোঝা যায়, ঔপন্যাসিকের মনের অভিব্যক্তি বিবেচনায় রেখে এতে *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাস দুটির ভাষাভঙ্গি গৃহীত। ইংরেজি উপন্যাস দুটির রচনাকাল নির্ণয় নিয়ে এখনও মতভিন্নতা থাকলেও ভাষা ও বিষয় উভয় ক্ষেত্রে এদের ঘনিষ্ঠতা *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো*-র সঙ্গেই, *লালসালু*-র সঙ্গে নয়; তাই বলা যায়, অনুবাদকের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ। এই লেখার কিছু মন্তব্য এ-কথার পক্ষেই যাবে, এছাড়াও এখানে আলোচিত হবে ইংরেজিতে উপন্যাস লেখার কারণ এবং বিশেষভাবে আলোচিত হবে তখন পর্যন্ত কোনো বাঙালি ঔপন্যাসিক কর্তৃক গৃহীত এর নতুন বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে।

এই সময়ে এসে, ওয়ালীউল্লাহ্‌র [এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত ও] প্রকাশিত পাঁচটি উপন্যাসের দিকে নজর দিলে *লালসালু*-র ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা সার্বিক সাফল্য ও এখনকার জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও আজ

---

* সহযোগী অধ্যাপক, লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট।

একথা স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে, চেতনাগত দিক দিয়ে অন্য চারটি উপন্যাস থেকে *লালসালু* ভিন্নচেতনার একটি উপন্যাস। এতে *লালসালু*-র মহত্ত্ব কিছুতেই ক্ষুণ্ন হয় না, ক্ষুণ্ন হয় না এর স্রষ্টার মর্যাদাও, বরং মজিদ পিরের বাস্তব ভিত্তি বা উপন্যাসের অন্তঃকাঠামো যাই হোক, সে যে মোটের ওপর ভণ্ড পিরের প্রতীকে পরিণত হতে পেরেছে, তাতে সমাজের উপকারই হয়েছে। তবু একথা মনে রাখা জরুরি, ১৯৪৮ সালে *লালসালু* প্রকাশের পর বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসটির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও ষোলো বছর। তার কারণ, যে-ভাষা ও বিষয়বস্তু অবলম্বন করে উপন্যাস লিখবেন, ধারণা করি, তা মনে দানা বাঁধতে সময় লেগেছে। আর এ-কথাও ঠিক যে, পূর্বে-দেখা সামান্য অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে, বলা উচিত জীবন্ত করে, বিশেষ দায়বোধ থেকে তিনি *লালসালু* লিখেছেন, দ্বিতীয়বার সেরকম বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লেখা ছিল অসম্ভব, কেননা গ্রামীণ জীবনব্যবস্থার সঙ্গে ততটা ঘনিষ্ঠ হওয়ার মতো সুযোগ তাঁর জীবনে আসেনি। যদিও এ সময়ের মধ্যে, ১৯৫৪ সালের ১৫ই অক্টোবরে লিখিত চিঠিতে একটি ইংরেজি উপন্যাস রচনাবিষয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর স্ত্রী আন মারিকে জানিয়েছিলেন : 'এটি আসলে এখানকার গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার ওপর ভিত্তি করে লেখা উপন্যাস, তবে এর পরতে পরতে আছে আমার ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তা'[২]—ধারণা করি, সেই উপন্যাসটি, শেষপর্যন্ত গ্রামজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার অভাবে সমাপ্ত করে যেতে পারেননি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্; অথবা হতে পারে সেই উপন্যাসটি পরে বিষয় ও রূপ পাল্টে অন্য উপন্যাসে অন্তরিত হয়ে গেছে। তবে এ সময়ের মধ্যেই তিনি সাময়িকপত্রে কিছু গল্প লিখেছেন, গল্প লিখেছিলেন *লালসালু* প্রকাশের আগেও, গল্পবই *নয়নচারা*ও বেরিয়েছিল ১৯৪৪ সালে—নানাসময়ে লেখা এ সকল গল্পে গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা আছে, তবে পরবর্তী সময়ে তিনি যে-ভাবে, যে-আঙ্গিকে বাংলা ও ইংরেজি উপন্যাস লিখবেন তার কিছু মুদ্রাচিহ্ন তাতে দেখা গিয়েছিল, যা এড়িয়ে যায়নি সেই সময়কার আলোচকদের চোখেও। *নয়নচারা* প্রকাশের দু-বছর পরে *পরিচয়* পত্রিকায় সুশীল জানা লিখেছিলেন :

> ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেবের ঝোঁক মনঃসমীক্ষণের দিকেই বেশি। এতে বিপদ আছে, বিশেষ করে যে শ্রেণীর মর্মকথা তিনি লিখেছেন সে ক্ষেত্রে। মধ্যবিত্তিক ভাবপ্রবণতা আবেগের ঝোঁকে ঘাড়ে চেপে বসে গিয়ে নিপীড়িত শ্রেণী-জীবনের ওপরে। জীবন আড়াল হয়ে যায়। যা বর্তমান সাহিত্যে খুবই সুলভ। এতে রচনা জীবন-ধর্মী না হ'য়ে, হয়ে পড়ে ভাবধর্মী।[৩]

তুলনায় *লালসালু*-তে এই ঝোঁক কম এবং তিনি একজন চিত্র-আলোচক ছিলেন বলে অন্য চারটি উপন্যাসের থেকে তাঁর এই পৃথকস্বভাব বইটি সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, এখানে মজিদের মূর্তিকে দাঁড় করিয়ে তাকে কেন্দ্র করে যথাসম্ভব নিষ্ঠার সঙ্গে একটি সম্প্রসারিত অথচ আপাতনিস্তরঙ্গ স্থিরচিত্র তৈরি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তবু এ বই প্রকাশের একবছর পরে *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় আহসান হাবীব লেখেন :

> নায়ক মজিদ স্পষ্ট সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মানসিক দ্বন্দ্বের বর্ণনায় মাঝে মাঝে লেখকের নিজের তীক্ষ্ণ মননশীল মনটি প্রধান হয়ে উঠতে চেয়েছে। সৌভাগ্যের কথা সে বিভ্রান্তির পরিসর খুব অল্প।[৪]

লালসালু ও সেই ধরনের জীবনবাস্তবতাধর্মী গল্পের জন্য মনঃসমীক্ষণের প্রতি ঝোঁক বা সেখানে 'তীক্ষ্ণ মননশীল মন'-এর 'প্রধান'-হয়ে-ওঠার ব্যাপারটি দোষের হলেও প্রাসঙ্গিক স্থানে তাই হয়ে ওঠে গুণের—ওয়ালীউল্লাহ্‌র অনেক গল্প আর বাকি চারটি উপন্যাস তারই মুদ্রিত নজির। আসলে শুরুর দিকে তাঁর লেখার প্রতি আশানুরূপ আগ্রহের অভাব এবং এসব মূল্যায়নই তাঁকে ইংরেজি উপন্যাস এবং *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো* রচনার দিকে ঠেলে দেয়। সৈয়দ আবুল মকসুদকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাঁর ভাই সৈয়দ নসরুল্লাহও মূল্যায়নের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, পূর্ববাংলার সেই সময়কার লেখকেরা *লালসালু*-র মধ্যে কোনো ধরনের বিশেষত্বই খুঁজে পেলেন না, তবে নসরুল্লাহ *লালসালু*-র অনাদরের প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিলেন যে, গোড়া থেকেই ইংরেজিতে লেখার প্রতি ঝোঁক ছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র।[৫] এ-বিষয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে কাজী আফসার উদ্দিনের ছোটো আলাপটি উদ্ধৃত করলে লেখকের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

> *লালসালু* যথেষ্ট বিক্রি না হওয়ায় তিনি হতাশ হয়েছিলেন। আমাকে বলেন, ইংরেজিতে উপন্যাস লিখব। বললাম, ইংরেজিতে কেন? বললেন, বাংলার পাঠক কোথায়? পাঠক যা পড়তে চায়, আমি তা লিখতে পারব না।[৬]

এর পরে, ১৯৫৪ সালে, তিনি একটি ইংরেজি উপন্যাসে হাত দিয়েছিলেন, আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌র অনুমান সেই উপন্যাসটি *দি আগলি এশিয়ান*, কিন্তু সাজ্জাদ শরিফ যুক্তি উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন, সেটি *দি আগলি এশিয়ান* নয়, অন্য কোনো উপন্যাস। উপন্যাস যেটিই হোক, আর তা যে-সময়েই লেখা হোক না কেন, এ-কথা ঠিক যে, তিনি ইংরেজিতে উপন্যাস লিখেছিলেন, এবং এটাও ঠিক যে, তিনি শুধু *লালসালু*-র প্রতি অনাদরের প্রতিক্রিয়া থেকেই তা লেখেননি, এর পেছনে তাঁর সংবেদনশীল, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত প্রধান ভূমিকা রেখেছে। আন মারি যে লিখেছেন, গ্রিক সফোক্লিসই হোন বা ফরাসি ভলতেয়ারই হোন কিংবা বাঙালি রবীন্দ্রনাথই হোন, তাঁদের সবার চিন্তা ও রীতি আত্মস্থ করে তিনি নিজের সংস্কৃতি, মানুষ তথা পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমান কৃষকদের উপর প্রয়োগ করতেন, তা এমনিতে নয়; তাঁর কাছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাহিত্যের কোনো ভেদ নেই, তিনি বলতেন, 'আমি একজন মুক্ত মানুষ। জগৎ আমাকে গ্রহণ করুক আর নাই করুক, পুরো জগৎটিই আমার।'[৭]এরকম একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী লেখক কোন ভাষায়—বাংলায় না ইংরেজিতে না ফরাসিতে—সাহিত্য রচনা করবেন সে-আলোচনা সবসময় প্রাসঙ্গিক থাকে না। তবে তিনি *দি আগলি এশিয়ান* ও *হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিন্‌স* কেন ইংরেজিতে লিখেছেন এবং কেন তা জরুরি ছিল, তা বই দুটির বিষয়বস্তুর মধ্যেই নিবিড়ভাবে নিহিত।

২

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *দি আগলি এশিয়ান* ঠিক কোন সময়ে লিখিত, তার দিনতারিখ নির্ণয়ে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো না গেলেও একথা বলা যায় যে, এটি একসময়ের জনপ্রিয়

উপন্যাস জে. লেডারার ও ইউজিন বারডিক রচিত *দি আগলি আমেরিকান* [১৯৫৯] প্রকাশের পরেই রচিত। কেননা ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে ওই বই পাঠের ইঙ্গিত ও প্রতিক্রিয়া আছে এবং সেটি লিখিতও হয়েছে একই আঙ্গিকে। তবে সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, ইঙ্গিত, প্রতিক্রিয়া ও আঙ্গিক যাই থাক, *দি আগলি এশিয়ান* রচিত হয়েছে *দি আগলি আমেরিকান* থেকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। আমেরিকাবাসী দুই লেখক জে. লেডারার ও ইউজিন বারডিক যৌথভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁদের উপন্যাসটি লিখেছেন, অল্পকথায় একটি লেখায় তার উল্লেখ করেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী :

> *দি আগলি আমেরিকান*-এর লেখকদ্বয়ের আক্ষেপ এখানে যে, এতসব করেও আমেরিকানরা এশীয়দের মন পায় না। মন দখলের যুদ্ধে তারা পরাভূত। এর কারণ তারা অনুসন্ধান করেছেন এবং উপন্যাসের শেষে উত্তরভাষণ হিসেবে একটি প্রবন্ধে এশিয়াবাসীর মন জয়ের জন্য কী কী করণীয় তাও বলে দিয়েছেন। আমেরিকানদের প্রথম কাজ হবে স্থানীয় মানুষকে জানা এবং সেই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে স্থানীয় ভাষা রপ্ত করে ফেলা।[৮]

কিন্তু তাদের এ পরামর্শ কাজে লাগবে কি না, তার জবাব আছে *দি আগলি এশিয়ান*-এর শেষে, 'একজন এশীয়র সংলাপ'-এ, যেখানে লেখক বলতে চেয়েছেন, এশীয়দের মন পেতে গেলে ভাষা রপ্ত করে তাদের সঙ্গে সংলাপ করলেই হবে না, কেননা এখানে যে যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা, তা ভাষার নয়, প্রতিবন্ধকতা হলো 'বক্তব্য'-এর, আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় : বাধা হলো দৃষ্টিভঙ্গির, অভিজ্ঞতার এবং চাহিদার। একথা বলবার জন্য, অর্থাৎ ভাষা রপ্ত করার পরও তাদের উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হবে তা বোঝানোর জন্য তিনি কল্পনায় নিখুঁতভাবে একজন মার্কিনি ও একজন এশীয় কৃষকের সংলাপ তৈরি করে তাদের বক্তব্য ও অভিজ্ঞতার দূরত্ব দেখিয়েছেন :

> কৃষক : আমাদের গ্রামে আপনি কী চান?
>
> মার্কিনি : আমি ধানের ফলন বাড়াতে তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি।
>
> কৃষক : আপনার কী দয়া! কিন্তু আমাদের জন্য এসব করে আপনার লাভ?
>
> মার্কিনি ইতস্তত করে, কারণ এখন পর্যন্ত কেউ তাকে এ প্রশ্ন করেনি। এ দেশের দরিদ্র লোকজনের প্রতি আন্তরিক টানের কারণে কি সে কাজ করছে? সে জানে না। সে কি সামান্য মিথ্যাচার করবে? না, লোকটিকে সে সহজ-সরল সত্যটি জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।
>
> মার্কিনি : আমি চাই তোমরা ভালো থাকো, কারণ আমি চাই না কমিউনিস্টরা তোমাদের নাগাল পাক।
>
> কৃষক : কমিউনিস্ট আবার কারা?
>
> মার্কিনি : ওরা খারাপ লোক। মানুষের জমি কেড়ে নেয়।
>
> কৃষক : আমার কাছ থেকে তো কাড়তে পারবে না। আমার জমি নেই।
>
> মার্কিনি : কোনোদিন জমি হলে তখন কেড়ে নেবে। একদিন তো তোমার জমি হবেই।
>
> কৃষক : ওরা কি আমাদের জোতদারের চেয়েও খারাপ?

> মার্কিনি : (চারপাশে তাকিয়ে) তার চেয়েও জঘন্য। ওরা মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতাও কেড়ে নেয়। ওরা মানুষকে দাস বানায়।
>
> কৃষক : আমার ছেলে-মেয়েগুলিকে ওরা খেতেটেতে দেবে না?
>
> মার্কিনি : (বিরক্ত ভঙ্গিতে) খাওয়া-দাওয়াই সবকিছুই নয়। মানুষের আরো চাহিদা আছে, তাই না?
>
> কৃষক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।
>
> মার্কিন ভদ্রলোক কৃষকের নিজের ভাষায় কথা বলে, কিন্তু তার কথার অর্থ সে বুঝতে পারে না।[৯]

এ সংলাপ কল্পিত বটে, কিন্তু এটাই তো বাস্তব এবং সত্য, আর সেকারণেই সংলাপটি—দু-জনের বক্তব্যের দূরত্বের কারণে—হাস্যকর। আমেরিকানদের তা বোঝার কথা নয়, সেজন্যই আমেরিকানদের কাছে এমন এশীয়দের নির্বোধ মনে হবেই! এ সবকিছু উপন্যাসের সারকথা বটে, কিন্তু এ হলো উপন্যাসের শেষের বক্তব্য, আর বইয়ের শুরু থেকে পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা ব্যাপী রয়ে গেছে আরও নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনা, রয়েছে সুবোধ এশীয়দের তৎপরতা আর সুশীল গণতান্ত্রিক মার্কিনিদের আধিপত্য বিস্তারের কাহিনি! এখানে, এসবের পুনরুল্লেখ না করেও, সারকথা সেরেই, *দি আগলি এশিয়ান*-এর আলোচনাটি শেষ করা যেত, কিন্তু আসলে উপন্যাসটি শুরু থেকে সারকথায় পৌঁছার আগপর্যন্ত ঘটনাগুলি মার্কিন আধিপত্যের একটি প্রতীকী দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। আজ, ২০১৮ সালে পৌঁছানোর পর, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের, বিশেষত ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের দিকে খেয়াল করলে মনে হয়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ পুরো সময়-অভিজ্ঞতা যাপন করে অল্পদিন আগেই যেন এ উপন্যাসটি লিখেছেন।

৩

> ইউরোপ ভূত দেখছে—কমিউনিজমের ভূত। এ ভূত ঝেড়ে ফেলার জন্য এক পবিত্র জোটের মধ্যে এসে ঢুকেছে সাবেকী ইউরোপের সকল শক্তি পোপ এবং জার, মেত্তেরনিখ ও গিজো, ফরাসি র‍্যাডিকেলেরা আর জার্মান পুলিশগোয়েন্দারা।[১০]

দি আগলি এশিয়ান উপন্যাসটি পড়তে শুরু করলে আস্তে আস্তে এর [কল্পিত] দেশে কয়েকজন আমেরিকানের উপস্থিতি ও তৎপরতা লক্ষ করা যায় : কেউ সাংবাদিক, কেউ রাষ্ট্রদূত, কেউ প্রকৌশলী, কেউ গোয়েন্দা, কেউ আবার স্বেচ্ছাসেবীও। সকলের ক্ষেত্রই আলাদা, নানা মতলবে তাদের বিচরণ, কিন্তু একটি ব্যাপারে সকলেই একমত যে, এখানে যাদের উপরে কমিউনিজমের ভূতের আছর পড়েছে, বা যাদের উপরে আছর পড়ার সম্ভাবনা, তা যেন কোনোভাবেই না পড়ে সেই চেষ্টা করা। কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের পটপরিপ্রেক্ষিতরূপে উল্লিখিত এ উদ্ধৃতিতে 'ইউরোপ'-এর জায়গায় 'আমেরিকা' আর অন্যদের জায়গায় এ আমেরিকানদের বসিয়ে নিলে পুরো কাহিনিটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এখানে আমেরিকানরা ভূত দেখছে একথা ঠিক, আবার তাদের ঐকমত্য এটাও প্রমাণ করে যে, তারা নিজেরাও কম ভূতগ্রস্ত নয়, এবং ভূতগ্রস্ত বলেই তাদের আচরণ স্থানে স্থানে হাস্যকর।

আমেরিকার এক রাজনৈতিক পত্রিকা সাপ্তাহিক *অপিনিয়ন*-এর সাংবাদিক জনসনের আগমনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের শুরু, সে এসেছে এদেশের চলমান অবস্থা সরাসরি জানবার জন্য, আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, পত্রিকার স্বার্থেই তার আসা, তার পর্যবেক্ষণে একপ্রকার নিরপেক্ষতা ও আত্মসমালোচনাও রয়েছে, এবং বোঝা যায় লেখক তার মাধ্যমে আমেরিকানদের দৃষ্টিভঙ্গিও অনেকটা খোলাসা করতে চেয়েছেন। *অপিনিয়ন*-এর সম্পাদক এশিয়া ও আফ্রিকার সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্ক নিরীক্ষণ করেন, তিনি জানেন এবং মানেন, এ সকল স্থানে পুরাতন পরাশক্তিগুলো তাদের অবস্থান হারাবার পর আমেরিকাই এখন পৃথিবীর 'একমাত্র পরাশক্তি', তাই এখানকার অসহায় মানুষকে সমাজতন্ত্রের ভূতের আছর থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমেরিকার ওপর আপনাআপনি এসে বর্তেছে; তবে তিনি এও স্বীকার করেন যে, এ-জাতীয় নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো পূর্ব-ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা নেই, অঢেল ইস্পাত ও মোটরগাড়ি তৈরি করা বা গম ফলানো আর নেতৃত্ব দেওয়া এককথা নয়। তিনি জানেন, শত্রু মোকাবেলা করার শৌর্য তাদের আছে, অস্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করে সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতাও তাদের আছে, তবু এ নিয়ে আশ্বস্ত হওয়া ঠিক নয়, কেননা শত্রু নানা ভাবে এগুতে পারে, তাই আমেরিকাকে সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জনসনের মাধ্যমে এ কথাগুলো এজন্য উচ্চারিত হয়েছিল যে, এখানে যে-দেশটি আমেরিকার সঙ্গে সবধরনের মৈত্রী স্থাপন করেছিল, আমেরিকার অস্ত্র, সরঞ্জাম ও অর্থ ছিল যার প্রধান সহায়, নানাভির নেতৃত্বাধীন সেই সরকারি দলটি নিঃসংকটে একদশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও বিরোধী মোর্চার কাছে হেরে যায়। কেন হেরে যায়, এ ভাবনায় উত্তেজিত *অপিনিয়ন*-এর সম্পাদক, সে প্রথমে ভাবে, এ পরাজয়ের পেছনে রহস্যময় কিছু একটা আছে, কারণ পররাষ্ট্র দপ্তরও এ-ব্যাপারে আগাম কোনো সতর্কবার্তা পায়নি; পরে, জনসনের উদ্দেশ্যে সে এ মর্মে নির্দেশ ছুড়ে দেয় যে, 'এখানে আমাদের লোকজন তালগোল পাকিয়ে বসে আছে কি না গিয়ে খোঁজখবর নাও। যদি তা-ই হয়, কসম কেটে বলছি, এবার আমি হৈচৈ বাধিয়ে দেব।'[১১] বোঝা যায়, আমেরিকার সরকারপক্ষের ক্ষমতাশালী এ সম্পাদকের নির্দেশে রহস্য মোচনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে এখানে এসেছে জনসন, এখানে রাষ্ট্রদূতসহ নানা ক্ষেত্রে আরও যে-সকল আমেরিকান আছে তারা সকলেই এ-বিষয়ে যার যার জায়গা থেকে তৎপর অর্থাৎ কমিউনিজমভূতের আছর-তাড়ানো আর বিশেষ বশীকরণের ক্ষেত্রে সকলের চিন্তায় একধরনের ঐক্য রয়েছে।

কিন্ত ঘোরতর রহস্য মোচনের আগেই একসময় মার্কিন দূতাবাসের পদস্থ কর্মকর্তার কাছে আরেক রহস্যময় সংবাদ শোনে জনসন, নির্বাচনে-জয়ী ইউনাইটেড ফ্রন্টের নেতা আবদুল কাদের নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য নানাভির দলের যে-অল্প ক-জন জয়ী হয়েছেন তারা এবং আরও একটি ছোটো দলের সঙ্গে মিলে জোট বাঁধছেন, 'তারপর তিনি সোজা তার পূর্বসূরির জুতাটি পরবেন।' কিন্তু এ বিষয়ে তার বিস্ময় কাটে না, সে বুঝতে পারে না নিরপেক্ষতাবাদের সমর্থনে যারা এদের ভোট দিল এরা এখন কী করবে, তাই সে প্রশ্ন করে : 'আর যারা এই

মাথামুণ্ডু স্লোগানের পেছনে ভোট দিল, তাদের কী হবে? তাদের তো নিরপেক্ষতাবাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তাই না?' এর উত্তর দেয় কনডন এবং বুঝিয়ে দিতে চায় যে, এখানে প্রার্থীরা যা ইচ্ছা প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং তাকে এ কথাও বলে যে :

> আপনাকে আগে এ দেশটার চালচিত্রটা বুঝতে হবে, মি. জনসন। এখানে আশি ভাগ লোকের বসবাস গ্রামে। তারা লেখাপড়া জানে না। পাশের গ্রামে কী হচ্ছে তারই খবর রাখে না। যে কেউ তাদের কাছে গিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করতে পারে।[১২]

কিন্তু এ কোন দেশের কথা বলছেন কনডন? একজন আলোচক অবশ্য স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন 'চারপর্বে বিন্যস্ত উপন্যাসটির কাহিনিকাঠামো, পটভূমি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান',[১৩] তা হতে পারে, আবার সমগ্র উপন্যাসের খণ্ড খণ্ড ঘটনার দিকে নজর দিলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান, ভারত বা এশিয়ার অন্যান্য দেশের নামও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে। এ-প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৫০ সালে আমেরিকা ও কানাডা সফরকালে ক্যামব্রিজের ম্যাসাচুসেট টেকনলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে প্রদত্ত পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের বক্তৃতার কথা, যেখানে তিনি প্রথমে বিশ্ববাসীর জন্য অবদান রাখার জন্য আমেরিকান জাতির কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন যে, তাদের অভিজ্ঞতা ও শিল্পজ্ঞান নিয়ে গণতান্ত্রিক মতবাদকে বলিষ্ঠভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সময় কি এখনো তাদের আসেনি? বলেছিলেন, 'বর্তমান জগতে গঠনমূলক কার্যক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়ে চিরস্থায়ী বিশ্বশান্তির ভিত্তি আপনারাই কি স্থাপন করবেন না?' এরপর নিজ দেশের জন্য তাদের সহায়তা চেয়ে বলেছিলেন :

> কেউ হয়ত ভাববেন, আমি দয়ার ভিখারী, আমি আপনাদের দানশীলতাই কামনা করছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আমাদের জনশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার জন্যে আমরা শুধু অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ দেশসমূহের সহায়তা কামনা করছি। দেশের ও রাষ্ট্রের স্বার্থের খাতিরেই শুধু এই সহায়তা চাই না; এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে আমেরিকার ও সারাবিশ্বের স্বার্থ। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ও সমৃদ্ধি বর্তমান জগতে সম্ভবপর নয়।[১৪]

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সফরে গিয়ে আমেরিকার প্রতি এ আহ্বান জানিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই সফরের দাওয়াত এসেছিল আমেরিকার কাছ থেকেই। ১৯৫০ সালের এ সফরের পরে ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালে পাকিস্তান বর্ধিত হারে সাহায্য লাভ করে বটে, তবে সাহায্য ছিল সশর্ত : মার্কিন সরকারের অনুমোদনের মাধ্যমে এ-সাহায্য কাজে লাগানো হত এবং অন্য দেশ থেকেও কোনো প্রকার কারিগরি সহযোগিতা নেওয়া যেত না। এ সবকিছু তদারকির জন্য আসে বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টারা, এবং এভাবে '১৯৫৩ সালের মধ্যে পাকিস্তানের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং তখন থেকেই পাকিস্তান সরকারের নীতিমালা তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়;'[১৫] এরপরে, ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে

পাকিস্তান সরকার একটি পুতুল-সরকারে পরিণত হয়। এ সকল ঘটনার দিকে নজর দিলে *দি আগলি এশিয়ান*-এর পটভূমিবিষয়ে ধারণা পাওয়া যায় আর ওয়ালীউল্লাহ্‌ও এ সময়েই নয়াদিল্লি ও সিডনিতে পাকিস্তান দূতাবাসের প্রেস এটাচি হিসাবে দায়িত্ব পালন করায়, ধারণা করি, এসব বিষয়ে তিনি ছিলেন পুরোটাই অবহিত।

বাস্তবে ঘটে-যাওয়া এ সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলির মাধ্যমে পাকিস্তানে আমেরিকার হস্তক্ষেপের যে-চিত্র দেখি, তা তো কোনো দেশের গণতন্ত্রের জন্যই কাম্য নয়; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে, তাদের ভাষ্য মতে, তারা যা করছে তা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠারই জন্য এবং তারাও চায় সরকার যেন এমন পন্থা অবলম্বন করে যে, জনগণ যেন বুঝতে পারে আমেরিকা তাদের বন্ধু, এবং তারা যেন তাদের বন্ধুর শত্রুকে—কমিউনিস্টদের—তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এ অবস্থায় আমেরিকানরা কেন এশীয়দের বন্ধু হতে পারে না তার সমালোচনা আছে *দি আগলি আমেরিকান*-এ, এ-প্রসঙ্গ আলোচিত হয় *দি আগলি এশিয়ান* উপন্যাসেও, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল?

এ প্রশ্নে 'একজন এশীয়র আলাপ'-এর উপর ভিত্তি করে ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন খালিকুজ্জামান ইলিয়াস। তিনি লিখেছেন : 'কিছুটা শিশুসুলভ সরলতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কিছু সদুপদেশ দিয়ে বিভিন্ন দেশে মার্কিন অবস্থান ও হস্তক্ষেপের ভূমিকাটিকে মোটামুটি পাকাপোক্ত করারই ব্যবস্থা করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্।'[১৬] ভারত-ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের বেদনা মর্মে লালনকারী ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনবাস্তবতা-বিষয়ে কোনো কৌতূহল না দেখিয়ে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনোটাকে নির্মম সিদ্ধান্তের উদাহরণই বলতে হবে। অথচ এ বই পড়েই, 'রূপান্তরশীল মন'-এর কথা বিবেচনায় এনে, সাজ্জাদ শরিফ এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন :

> এ উপন্যাসে তাঁর রাজনৈতিক সত্তা যেন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে উদ্‌গীরিত হয়েছে। তিনি এতে প্রবলভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, বিভিন্ন গরিব দেশের জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ের অকুণ্ঠ সমর্থক, এমনকি সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর পক্ষপাতও মোটেই প্রচ্ছন্ন নয়। মনে রাখতে হবে পাকিস্তান তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক লেজুড় রাষ্ট্রবিশেষ। এটি আর যা-ই হোক, ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বপ্নের রাষ্ট্র নয়, এ রাষ্ট্রে তার মন পড়ে থাকার নয়।[১৭]

তিনি 'প্রবলভাবে' সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কিনা জানি না, তবে অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী; তিনি সক্রিয় কমিউনিস্ট ছিলেন না ঠিক, তবে অবশ্যই কমিউনিস্ট-মনোভাবী। আন মারিকে অনেকেই জিজ্ঞেস করতেন ওয়ালীউল্লাহ্ মার্কস্‌বাদী কি না, সেই সূত্র ধরেই তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

> আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ওর বন্ধুবান্ধবদের মতো ও মার্ক্সবাদী কি না। হ্যাঁ ও মার্ক্সবাদী ছিল। সেটা বুঝতে গেলে আপনাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোয় পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে নিজেদের বসাতে হবে। সময়টা অধিকাংশ লেখক ও শিল্পীর কাছে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি আর এর ফলে দারিদ্র্যের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভের প্রত্যাশা থেকে প্রতিভাত হয়েছিল।[১৮]

ওয়ালীউল্লাহ্‌কে যেভাবেই চিহ্নিত করা হোক না কেন, তাঁর লেখা পড়লে বোঝা যায়, আসলে তিনি কোনো তত্ত্বের অনুগত ছিলেন না, তবে গুণগ্রাহী ছিলেন। বেগম আকতার কামাল উপন্যাসের তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করে ওয়ালীউল্লাহ্‌র মধ্যে যে 'দ্বৈত'তা খুঁজে পেয়েছেন এবং তাঁকে যে উদার মানবিকতাবাদী বলেছেন, তাও গ্রহণযোগ্য। নানা জাতি ও নানা শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা ও সংকটে মর্মপীড়িত এ মহৎ ব্যক্তিত্বের বিচার করতে গেলে যে-কোনো আলোচককেই সতর্ক ও সচেতন না হয়ে উপায় নেই। তিনি তাঁর উপন্যাসে, 'একজন এশীয়র আলাপ'-এ, আমেরিকানদের যা বলেছেন তাকে 'সদুপদেশ' বলে ব্যঙ্গ করা ঠিক নয়, তা 'পরামর্শ' বলাও ঠিক নয়, তিনি আসলে তাঁর কূটনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোকে—উপায়ান্তর না দেখে—আপাতস্বার্থে কিছু কথা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন, উপন্যাসের শেষের দিকে জনসনের সঙ্গে আলাপে আহসানের বক্তব্যে তো তারই ইঙ্গিত :

> ...'আপনার তত্ত্বের পক্ষে আপনি কী যুক্তি দেখান, বুঝতে পারছি না।'
>
> 'যুক্তি দেখাতে পারি না তো', আহসান বলেন, একথা স্বীকার করতে তাকে মোটেও বিব্রত দেখায় না। 'তার মানে এই নয় যে, কথাটি অসত্য। আমি মানুষের হৃদয়ের কথা বলছি। নানারকম লোকদেখানো ভঙ্গির প্রকাশ সিদ্ধান্ত, অটল বিশ্বাসের অন্তরালে হয়তো কোথাও সত্যিকার মানবহৃদয় একটি আছে। সেই হৃদয় অন্যের দুঃখদুর্দশা বুঝতে পারে।...
>
> 'আপনি বলতে চান কমিউনিস্টদের জন্য গোপনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হৃদয়ে এ রক্তক্ষরণ হচ্ছে?
>
> 'না, আপনারা কমিউনিস্টদের ঘৃণা করেন। আমার বক্তব্য সেটি নয়, আমি বলতে চাই : আমাদের ক্ষুধার্ত মানুষজনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কিন্তু তারা একথা স্বীকার করতে পারছে না।'...
>
> জনসন উত্তর দেবে না সাব্যস্ত করে। আর তার বলার কী আছে? সে বরং বৃষ্টির অস্পষ্ট শব্দ শোনে। ঘরের ভেতর শত-সহস্র মশার পাখার শব্দ অদৃশ্য গুঞ্জন তোলে।
>
> 'একদিন একথা আপনি স্বীকার করবেন', কিছুক্ষণ বিরতির পর প্রায় অশ্রোতব্য কণ্ঠে আহসান বলে।[১৯]

আহসানের এ উক্তিকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো মুশকিল, এ হলো মর্মপীড়িত মানুষের অভিব্যক্তি, যাতে মিশে আছে এক স্বপ্ন-দেখা মানুষের যন্ত্রণা। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ের আলোকে আহসানকে স্বপ্ন-দেখা মানুষ বলছি বটে, কিন্তু 'একজন এশীয়র আলাপ'-এ লেখক নিজেই মনে করছেন, এ স্বপ্ন হয়ত 'অলীক কল্পনা' নয়, তার আশাও হয়ত বাতুলতা নয়, ক্ষুধাকে জয় করার জন্য আকুল একটি দেশ যদি মার্কিনিদের কাঙ্ক্ষিত পথ গ্রহণ না করে তবু তারা জবরদস্তি থেকে বিরত থাকবে। এ-সূত্রে তিনি কিউবার প্রসঙ্গ তুলছেন এবং ধারণা করছেন, তারা যে কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে মারাত্মক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না, তার কারণ, তাদের আত্মদম্ভী, স্বেচ্ছাচারী আচরণ ও অস্ত্রভাণ্ডার টিকিয়ে-রাখার বাসনার আড়ালেও নিশ্চয়ই দুর্দশার ভেতর জীবনযাপনকারী পিছিয়ে-পড়া মানুষের প্রতি সহমর্মিতা রয়েছে। আহসানের উক্তি আর এ বক্তব্য তো একই, এ হলো একজন ব্যথিত মানুষের ভাবনা। এ আহসান যে ঔপন্যাসিক ওয়ালীউল্লাহ্‌রই প্রতিনিধি।[২০] তিনি এখানে একটি বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক

উপন্যাস লিখেছেন বটে, কিন্তু উপরের সংলাপে পাঠকের মনে পড়ে যেতে পারে *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাসের আরেফ ও কাদেরের সংলাপের কথা। মৃত্যু বিষয়ে কাদেরের উক্তি শুনে আরেফ তাকে বলেছিল আপনি শুধু দুর্ঘটনার কথাই বলছেন, কিন্তু তাকে যে 'মায়া-মহব্বত' করতেন তা তো বলেননি—এতে বিস্মিত হয়েছিল কাদের, তার কণ্ঠে ঘৃণা ও বিস্ময়। যেভাবে আহসানের কথায় বিস্মিত হয়ে জনসন ভেবেছিল, সে 'এমন জগতে হাজির হচ্ছে, যে জগৎ অবাস্তব, এ জগৎকে সে চেনে না বলেই এর রঙ, আকার ও মাত্রা নিয়ে সে প্রশ্ন করতে পারে না।'[২১] অবশ্য শেষপর্যন্ত 'মায়া-মহব্বত'হীন শূন্য হৃদয়ের অধিকারী কাদেরের কারণে আরেফের যে-মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এখানে জনসনের কারণে তেমন অভিজ্ঞতা হয়নি আহসানের। আহসান জানত জনসনের সাঙ্গপাঙ্গরা তাকে যে-কোনো সময় মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু রাজনীতির মানুষ হয়েও, হয়ত ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বলে, মৃত্যু তার কাছে বড়ো কোনো ঘটনা নয়, বড়ো হলো হৃদয়, মমতা, ঘৃণা এবং অবশ্যই মানুষের সদাশয়তা। তাই জনসনকে সে প্রশ্ন করেছিল, আপনি কি আমাকে ঘৃণা করেন? এর জবাব জনসন দুই বার দিয়েছিল : প্রথমবার শুধুই 'না', পরে, 'না, আমি আপনাকে ঘৃণা করি না।'[২২] এটি, আহসানের জন্য, ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্যও বড়ো স্বস্তিকর একটি উক্তি, আর একারণেই, রাজনৈতিক বয়ান সত্ত্বেও এই উপন্যাসটিকে *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো*র ঘনিষ্ঠ বলছি। ফলে ইংরেজি উপন্যাস দুটি পাওয়ার পর ওয়ালীউল্লাহ্‌র মূল্যায়ন সহজ হয়েছে বটে, সেই সঙ্গে তাঁকে কিছুটা ভুলভাবে বোঝার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। কথাটা এজন্যই বলছি, এ দুটি উপন্যাসে ওয়ালীউল্লাহ্ যেভাবে নানা চরিত্রকে সূক্ষ্ম দার্শনিক জায়গা থেকে সহৃদয় দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছেন তাতে চরিত্রগুলোকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে কদর্য এশীয়র বিষয়টি, এখানে 'কদর্য' কে? সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, আমেরিকানরা চাইলে আহসানকে 'কদর্য' বিবেচনা করতে পারে,[২৩] কিন্তু আমরা উপন্যাসে মার্কিনিদের প্রতিনিধি জনসনকে দেখি আহসানকে সে 'ঘৃণা' করে না, বরং আহসানকে তার স্বপ্ন ও কল্পনার কারণে 'অদ্ভুত' ভাবতে পারে জনসন, বা যে-কোনো আমেরিকান। অন্য একজন আলোচক লিখেছেন, যে-এশীয়রা আমেরিকানদের সহযোগী, তারাই 'কদর্য', চিহ্নায়নটি আপাতসংগত বলেই মনে হয়, কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে তো 'কদর্য' বলার অধিকারটা আমেরিকানদের উপর না পড়ে খোদ লেখকের উপরই বর্তায়—কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসগত অভিব্যক্তি তো সেরকম নয়।

তাহলে এ উপন্যাসে 'কদর্য' কে? এখানকার দরিদ্র জনগণই আসলে আমেরিকানদের চোখে 'কদর্য', এ-প্রসঙ্গে কৃষক ও মার্কিনির মধ্যকার সংলাপটির কথা মনে করা যেতে পারে, এ মতের বাইরে কারও যদি আরও যুক্তিসংগত মত থাকে তাহলে আমরা সেটিও মেনে নিতে বাধ্য, কেননা ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসগুলো তার অন্তরঙ্গ অভিব্যক্তির কারণে সেরকম ভিন্নমতের সম্ভাবনাই জারি রাখে। তবে এ মতের পক্ষে আরেকটি কথা বলবার আছে যে :

কৃষক-মার্কিনি সংলাপে গম্ভীর ওয়ালীউল্লাহ্‌ মার্কিনিদের কিছুটা হলেও হাস্যকর করে তুলেছেন এবং আমরা আবারও স্মরণ করতে পারি মার্কিনির ধানের ফলন বাড়ানোর জন্য গ্রামে আসার কথা শুনে কৃষকের সেই সপ্রশ্ন/বিস্ময় উক্তি : 'আপনার কী দয়া! কিন্তু আমাদের জন্য এসব করে আপনার লাভ?', এ উক্তিতে কি বিদ্রুপের কোনো আভাস নেই? এ সূত্রে মনে করা যেতে পারে উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের কথাও, যেখানে মেয়েটি জনসনকে প্রশ্ন করেছিল, 'কেমন লাগছে এ দেশ?' জবাব না দিয়ে তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল জনসন। নিচে পড়ে দেখা যেতে পারে তাদের সংলাপটি :

> 'তোমার দেশকে তুমি নিজে কীভাবে দেখো, বলো তো।'
>
> 'আমাদের জন্মই তো এখানে।'
>
> 'সেটাই তো সব নয়। এখানে জন্মে তুমি কি সন্তুষ্ট?'
>
> খানিক বিরতির পর মেয়েটি জবাব দেয় 'হ্যা সন্তুষ্ট।'
>
> 'ফালতু' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ছেলেটি বলে ওঠে।
>
> মেয়েটি চকিতে তার দিকে ফেরে। 'ফালতু মানে কী, চুপ করো।' আবার মার্কিন ভদ্রলোকটির দিকে ফিরে মিনতির ভঙ্গিতে সে বলে, 'ওর কথায় কান দেবেন না। ও মানসিক পীড়ায় ভুগছে। হ্যাঁ আমরা আমাদের দেশকে অবশ্যই ভালোবাসি। এত গরিব আর নিঃসহায় দেশ। এজন্যই আমরা একে ভালোবাসি। জানেন তো, অসুস্থ সন্তানই মায়ের সবচেয়ে বেশি স্নেহ পায়। হয়তো নিজ দেশ থেকে বহু কিছু পান বলে আপনি আপনার দেশকে ভালোবাসেন। আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি এ দেশ আমাদের কিছু দিতে পারে না বলে।[২৪]

জনসনের কাছে মেয়েটির মন্তব্য অযৌক্তিক মনে হয়েছিল, কারণ এর উত্তরে জনসন কিছু না বললেও পরে নিজের-দেশ-সম্পর্কে অন্য মানুষের ধারণা-বিষয়ে মেয়েটির আরেকটি মন্তব্য শুনে জনসন বলেছিল 'এই তো যুক্তিবাদী কথা।' আসলে জনসন ভাববে কী, কথা বলার পর মেয়েটি নিজেই ভাবে, অন্যের কাছে এ ভালোবাসা 'হাস্যকর' মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলেই কি হাস্যকর? নিজের দেশকে এরকম ভালোবাসতে-পারার ক্ষমতাকে—দৃষ্টিভঙ্গিকে—হাস্যকর-মনে-করাটাই কি হাস্যকর নয়? আমেরিকান ও এশিয়ানদের সম্পর্কে, এ স্পর্শকাতর বিষয়ে, স্থিরনিশ্চিত সিদ্ধান্ত দেবে কে? ঔপন্যাসিক-অভিব্যক্তিও তো স্থিরমতের পক্ষে নয়। একজন আলোচক ওয়ালীউল্লাহ্‌র এ উপন্যাসকে 'থিসিস নভেল' হিসেবে চিহ্নিত করে এতে থিসিসের 'যুক্তি-বিশ্লেষণ ব্যবহার করে একটি চিন্তা বা ধারণা'[২৫] তুলে ধরা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আসলে এখানে যুক্তি-বিশ্লেষণ-চিন্তা-ধারণা আর স্বপ্ন-আবেগ-ভালোবাসা প্রভৃতি তাদের নিজ নিজ অভিব্যক্তি নিয়ে মুখোমুখি ঠাণ্ডা লড়াইয়ে লিপ্ত; মনে হয় না, এ অনিশ্চিত পরিণতিতে লেখকের কোনো আপত্তি ছিল। তার বড়ো প্রমাণ *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়* উপন্যাসটি, যার উপশিরোনাম 'এক এশীয়র ফ্রান্স-অভিযান'। উপন্যাসে সন্দর্ভসুলভ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলে কি আবারও সেই 'এশীয়'-প্রসঙ্গ আসে?

৪

এশীয়-প্রসঙ্গ আবার এজন্যই যে, ধারণা করি, এ উপন্যাসটি তিনি *কদর্য এশীয়* লেখার পরেই লিখেছেন, বা হতে পারে আগেই লিখেছেন, তা যে-সময়েই লিখুন, এটি আসলে একই ভাবনার ভিন্নরকম প্রকাশ : একটিতে আমেরিকা আর অন্যটিতে ইউরোপ। পশ্চিমারা যুক্তিশীল, উন্নত, শ্রেষ্ঠ আর প্রাচ্য চিন্তনবৈকল্যতাড়িত, অনুন্নত ও নিকৃষ্ট—এরকম একটা ধারণা যে প্রচারিত হয়েছে, *অরিয়েন্টালিজম*-এর সূত্রে এখন তা সবারই জানা। *অরিয়েন্টালিজম-এর* প্রকাশকাল গত শতকের ১৯৭৮, প্রচারিত হয়েছে আরও পরে, কিন্তু তারও আগে লিখিত *দি আগলি এশিয়ান*-এ আমেরিকানদের চোখে যে-এশীয়দের দেখি, তা তো প্রচারিত *প্রাচ্যতত্ত্ব*-এর উদাহরণ ও সমালোচনা। *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়* বইয়ে রয়েছে এ-বিষয়ের অন্যরকম বয়ান, একজন এশীয় ফ্রান্সে গিয়ে কীরকম অবস্থায় পড়ে তারই বিবরণ।

কিন্তু কথা হলো এ এশীয় কেন ফ্রান্সে যায়?

বইয়ের শুরুর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় মানুষ নানা কারণে—একশ একটি কারণে—ফ্রান্সে যায়, এক অদৃশ্য দানা বা স্বপ্নের তাড়নায় তাকে যেতেই হয়, যাওয়ার কোনো যুক্তি না থাকলে, যুক্তি তৈরি করে হলেও যায়, যেতেই হয়, না গিয়ে উপায় নেই, এজন্যই কথক যাত্রার আরেকটি যুক্তি/কারণ খুঁজে পায় : 'যৌক্তিকতা পাওয়ার জন্য (যুক্তি ছাড়া কেউ তো আর ফ্রান্স ভ্রমণ করতে পারে না) আরেকটি দানার সঙ্গে একীভূত হলো। আকারে অনেক বড় ও দৃশ্যমান এক দানা : শিম।'[২৬] এখানে যুক্তির কথা বলা হচ্ছে বটে, কিন্তু আসলেই কি তা কোনো যুক্তি? অভিযাত্রী বলছে, ফ্রান্সের সভ্যতা, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ঝরনা, প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, ইতিহাস তাকে কৌতূহলী করলেও ফ্রান্স-অভিযানে উৎসাহিত করেনি, এ বিস্ময়কর দেশে তার আগমনের কারণ মূলত একটাই, সেই তাড়নার নাম : শিম। অভিযাত্রীর ভাষায় :

> আরো নির্ভুলভাবে বললে, রান্না হয়ে থালায় পরিবেশনের দশায় উপনীত শিম। অন্য কথায়, কীভাবে শিম রান্না করা হয়, সেটা দেখতেই আমি এসেছি। মনে রাখবেন, ফেজিওলিজ গোত্রের সব শিম কিন্তু না : ঘোড়া শিম না, উইন্ডসর শিম না, লিমা শিম না, কিডনি শিম না, এবং অতি অবশ্যই সয়া শিমও না। বরং বাটার শিম, ফরাসিরা ছাড়া, আর সবাই যেটাকে বলে—ঠিকই বলে—ফ্রেঞ্চ শিম।[২৭]

শিম বিষয়ে যত গুরুতর তথ্যই এখানে উল্লেখ করা হোক না কেন, শিম যে এখানে কোনো অপরিহার্য বিষয়ই না, অথবা বিষয় যদি হয়ও তবু তা যে হাস্যসৃষ্টির উপলক্ষ্য মাত্র, সেটা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই স্পষ্ট। আন্দাজ করি, ওয়ালীউল্লাহ্ চাকরি সূত্রে বসবাসকালে ইউরোপের সভ্যতা-সংস্কৃতির গুণগ্রাহী হওয়া সত্ত্বেও এদের অন্তঃসারশূন্যতা, এশীয়দের প্রতি এদের আধিপত্যবাদী মনোভাব তাঁকে তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে থাকবে, যার পরিণতি এ উপন্যাস

দুটি, বিশেষত *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়*। তারপরও এ বিষয়টি গ্রহণ করার পেছনে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তাঁর স্ত্রী আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌। ম্যানিলার একটি রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিলেন তাঁরা, সেখানে এক ফরাসিকে শিম পরিবেশন করা হলে সে তীব্রভাবে অভিযোগ করে বলেছিল যে, এগুলো রান্না করার পদ্ধতি নাকি ঠিক হয়নি; তা থেকেই এ উপন্যাসের—আন মারির ভাষায় 'প্রহসন'-এর—আইডিয়া। আমরা এটাকে আইডিয়া না বলে উপলক্ষ্যই বলব, যার উপরে ভর করে আইডিয়ার বিস্তার, এখানে যা শিম না হয়েও যে-কোনো কিছুই হতে পারত, কেননা ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাছে উপলক্ষ্যের বিষয়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো চরিত্রের প্রবণতা বিশ্লেষণ ও তার দর্শন-অনুসন্ধান। *চাঁদের অমাবস্যা* বিষয়ে তাঁর ইংরেজি ভাষার প্রকাশককে লিখিত চিঠির কিছু অংশ পড়লে এ-কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

> উপন্যাসটির মূল বিষয় একটি অপরাধের একটি অশুভ কর্মের জ্ঞান। যুবক শিক্ষক হয়ে দাঁড়ায় এ জ্ঞানের ধারক। এ জ্ঞানের সঙ্গে যে দায়িত্ববোধ যুক্ত, সেটি তাকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। এ অশুভ কর্মটি শিক্ষকের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। আমি যেটা বলতে চাই, তা হলো, সেই অশুভ কর্মটি বা সেই অপকর্মের হোতা কেউই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়, সবচেয়ে জরুরি হলো এরকম একটি অপকর্মের বাইরের মানুষের আচরণ।[২৮]

বলা নিষ্প্রয়োজন, এখানে অপরাধটি 'মৃত্যু'কেন্দ্রী বলে তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা বেড়েছে, সংকটও তীব্র হয়েছে, কিন্তু এখানে মৃত্যু ও অপরাধ উপলক্ষ্য মাত্র, বিষয় নয়; আইডিয়াও নয়। এখানে শিমও যে-কোনো শিম নয়—ফ্রেঞ্চ শিম, এ বলে শিমকে নয় ফ্রান্সকে বিশেষায়িত করা হচ্ছে, আর শিম, প্রকৃত অর্থে একটি সাধারণ খাদ্য বলে, তার জন্য এশীয়র এ অনিবার যাত্রাকে কিছুটা হাসির বিষয় করে তোলা হয়েছে। একজন এশীয়র এই অভিযানকে ঔপনিবেশিক দাসত্ব বা হীনম্মন্যতাজাত অভিযানরূপে উপস্থাপন করা ঔপন্যাসিকের গৌণ লক্ষ্য হলে হতে পারে, তবে মুখ্য লক্ষ্য ছিল ফরাসিদের কর্মকাণ্ড এবং তাদের মনোভাবকে হাস্যকর করে তোলা। এ অর্থে আন মারি যে এ বইকে উপন্যাস না বলে 'প্রহসন' বলেছেন তা যথার্থ, তবে তিনি তাঁর স্মৃতিকথায়, অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় এটিকে যে কম গুরুত্ব দিলেন, তার কারণ হতে পারে এ বইয়ের মর্মে রয়েছে ফরাসিদের—তাঁর নিজ দেশের— সমালোচনা। স্বীকার করি, এ মন্তব্যে ছিদ্রান্বেষণের পরিচয় রয়েছে, তবু নির্দ্বিধায় বলব, ঠিক কারণেই এ উপন্যাসটি ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্য ছিল দায়িত্বশীল, আর আমাদের অর্থাৎ উপনিবেশিত এশীয়দের জন্য, খুব দরকারি একটি রচনা।

বইটি শেষ করে উঠে পাঠকের কাছে এ ভ্রমণগল্পের বহু জায়গায় যুক্তি-শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বোঝা যায় এ সবই ইচ্ছাকৃত। ঘটনাক্রমের কারণে যে এরকম হয়েছে তা না, মনে হয় একজন হতবিহ্বল মানুষ তার জীবনে ঘটে-যাওয়া কোনো গল্প মনে করার চেষ্টা করছে—কিছু মনে করতে পারছে, কিছু পারছে না, এর সঙ্গে সূত্রহীন অনেক কিছুই তার মনে এসে যাচ্ছে।

উড়োজাহাজে চড়ার পর অভিযাত্রী বাইরে তাকিয়ে আরও তিনটি উড়োজাহাজ দেখে, এর মধ্যে দুটি রাগে গজরাতে গজরাতে অন্যদিকে চলে গেল; তৃতীয়টিকে একগুঁয়ের মতো তাদের পিছু নেওয়ার পর সে স্পষ্ট দেখে তার চোখ দিয়ে মুক্তার মতো দুই ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।'[২৯] এরপর বিমানবালার সঙ্গে আরও যে বাক্যালাপ হয়, বোঝা যায় এ একধরনের যেন মনালাপই, কিন্তু বালা ঠিকই তার জবাব দেয়।

এরপর, দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনে তার অনাগ্রহ লক্ষ করে স্বেচ্ছানিয়োজিত গাইড যখন বিরক্ত হয়ে তাকে বলেছিল, 'তা হলে আপনি এখানে এসেছেন কেন?' তখন সে এমনি-এমনি একটি 'ব্যালকনি' দেখার আগ্রহ প্রকাশ করে।[৩০] অন্যত্র, গাইডের চাপে একটি উঁচু টাওয়ার থেকে নিচে তাকিয়ে সে অদ্রে পেরর‍্যাঁর চেহারা দেখে।[৩১] এতে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয় গাইড। কিন্ত এর মানে কী?

বইয়ে এ সকল আচরণের কোনো মানে পাওয়া না গেলেও, সে যে একজন এশীয়, তা বারবারই মনে পড়ে :

১. আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটছে, সেই ফরাসি লোকটার সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর নিজের মধ্যে আমি এরকমই একটা পরিবর্তনের আভাস পেতে শুরু করেছি। পরিবর্তিত হয়ে আমি যা হয়ে উঠছি, তা হয়ে ওঠাই অবশ্যম্ভাবী—আমি একজন এশীয় হয়ে উঠছি।[৩২]

২. আমি ফিসফিস করে তাকে ধন্যবাদ দিলাম। তারপর সন্তর্পণে হেঁটে ঢুকে পড়লাম আমার কাছে প্রতিভাত প্রাচ্যের রহস্যময় অন্ধকারের ভেতর। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, সুবিশাল ফাঁকা লবির শক্ত মর্মর মেঝেতেও আমার জুতা কোনো আওয়াজ তুলছে না। এশীয়রা এভাবেই হাঁটে।[৩৩]

৩. প্রত্যেক এশীয়র গভীরে নাটুকেপনার একটা সূক্ষ্ম বোধ থাকে, সামান্য উৎসাহেই সেটি ঠেলে বেরিয়ে আসে।[৩৪]

৪. এশিয়ার সব লোকই সাবধানী, এমনকি সর্বগ্রাসী বাসনার আগুনে পোড়ার সময়ও তারা সাবধানী। সাবধানী হওয়াই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, নতুবা বিদেশীদের শত শত বছরের লুটপাট আর হামলা, প্রকৃতির খামখেয়ালিমার্কা নিষ্ঠুরতার পরও কি তাদের পক্ষে এভাবে টিকে থাকা সম্ভব হত?[৩৫]

৫. আমরা এশীয়রা বিলক্ষণ জানি, ব্যতিক্রমেই জীবনের প্রাণ। এমনকি ঈশ্বরও ব্যতিক্রমের ফায়দা নেন।[৩৬]

৬. কেউ তাকে স্টুপিড বলবে, এশীয়রা ব্যাপারটা মোটেই হজম করে না।[৩৭]

৭. এশীয়রা আর যে একটা জিনিস হজম করতে পারে না, সেটা হলো কাপুরুষ উপাধি।[৩৮]

৮. ডাক্তার যতবারই আমার দেহের উপর হাত রেখেছেন, আমি একটা ছোট পশুর মতো যন্ত্রণায় মোচড়ামুচড়ি করে উঠেছি। সেটা করেছি ডাক্তারকে হতাশ করতে চাইনি বলে। প্রত্যেক এশীয়ই অপরের জন্য এই দায়িত্বটি বোধ না করে পারে না।[৩৯]

এশীয়রা কি আসলেই এ রকম? আচরণের এ সকল বৈশিষ্ট্য কোথা-থেকে পাওয়া, তা বোঝা যায় না; মনে হয় ফরাসিদের বৈশিষ্ট্য থেকে এশীয়দের বৈশিষ্ট্যগুলো যে আলাদা, তা বোঝানোর জন্য এর উল্লেখ। এমন-আচরণের-অধিকারী এশীয়ই কিন্তু ফ্রান্সে যাচ্ছে এবং সে যে ফ্রান্সে যাচ্ছে সেটাও বারবার মনে করিয়ে দিয়ে ফ্রান্সকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করছে। এখানে মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্য যদিও ভিন্ন, কিন্তু বাস্তবেও যে সেই ধারণা প্রচলিত ছিল সেকথা তো আরও আগেই লিখেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর *একটি সত্যি ভ্রমণকাহিনী* বইয়ে। তিনি জানিয়েছেন ফরাসিদের, বিশেষত প্যারিসের সম্মোহনী শক্তির কথা; তাঁর মতে প্রাণ-বাঁচানোর চাহিদার পরও মানুষের 'স্থূল উপভোগ' ও সূক্ষ্ম অনুভূতির 'উপকরণ'-এর কেন্দ্র হলো প্যারিস; বিদেশীদের কল্পনাকে পুঁজি করে তাদের আকর্ষণ করবার জন্য 'চুম্বক' তৈরি করাই তাদের পেশা। ফরাসিদের ট্যুরিস্টভোলানো প্রবণতা বিষয়ে তাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলো বিবেচনা করলে আমাদের এশীয় অভিযাত্রীর দুর্ভোগ বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছতে পারব :

> প্যারিসের কুৎসিত রূপটা এরা দেখায় না।...এখানকার পালা-পার্বণগুলোকে বারোমাস বিদেশীদের সম্মুখে তুলে ধরবার জন্য একটা বড় সমিতি আছে। Jules Romains-এর মত বড় সাহিত্যিক তার সভাপতি। যতই অব্যবসায়ী আর আপন-ভোলা হ'ক না-কেন এই ফরাসি জাতটা, টুরিস্ট আমদানির ব্যবসা তারা বোঝে ভাল। যেখানে টুরিস্ট নিয়ে কারবার সেই সব দপ্তরেই কাজ দেওয়া হয়, অকেজো সুন্দরীদের। এদের একমাত্র কাজ দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপনের সাদা হাসিটি মুখে ফুটিয়ে অফিসে বসে থাকা।[৪০]

এ ফ্রান্সের কথাই মনে করিয়ে দেয় ফরাসি—এক সবিশেষ ফ্রান্স—সে-স্থান ভ্রমণ করতে গেলে নাকি অভ্যস্তও হতে হয় অভিযাত্রীকে। এখানে ফ্রান্সকে মহিমান্বিত করার দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের উদ্দেশ্য এ মনোভাবের প্রকাশ ঘটানো যে : তোমাদের এতকিছু, এতসব থাকা সত্ত্বেও, তা দেখার জন্য আমি আসিনি, আমার আসার কারণ ভিন্ন, তোমরা কীভাবে শিম রান্না করো তা দেখা। কিন্তু এসবে আগ্রহী না হওয়ার কারণেই চলে জবরদস্তি—দেখা যায় বিরক্তি ও ক্ষোভ, আর ফরাসির এ আচরণই তাকে হাস্যকর করে তোলে। একজন উপনিবেশিত এশীয় হিসেবে এ বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন ছিলেন লেখক, না হলে অদ্রে পেরর‍্যাঁরকে দেখে অভিযাত্রীর এমনটি মনে হত না যে, ফরাসিরা ছাড়া ব্রিটিশ বা অন্য কেউ যে-দেশ শাসন করে সর্বত্র তাদের পদচিহ্ন রেখে যায় সে-দেশে খুব কম ফরাসিই 'সুখ' বোধ করে।[৪১] এ চেতনার পরিচয় রয়েছে উপন্যাসের অন্যান্য স্থানেও। আমরা দেখি এশীয়দের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে

আত্মম্ভরী ফরাসি-প্রতিনিধি অদ্রে পেরর‍্যাঁর সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নির্লজ্জের মতো সৈকতে দৌড়ায়, পেছনে তোয়ালে হাতে নিয়ে দৌঁড়ায় এশীয় ও একটি কুকুর, কিন্তু এদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপও নেই তার। এ নগ্ন হয়ে দৌড়ানোটাই তার উদ্ভটত্ব। এভাবে লেখক 'প্রাচ্যবাসীর দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিমের একটি দেশকে হাজির করেছেন উদ্ভট চেহারায়, তার বাইরের ভব্যতার চামড়াটি খসিয়ে দিয়ে।'[৪২] অন্য আলোচক লিখেছেন, 'ফ্রান্সে এক এশীয় আগন্তুকের বিচিত্র/বিড়ম্বনা এই উপাখ্যানের উপজীব্য',[৪৩] উপন্যাসে এ এশীয় বিড়ম্বিত বটে, সেই সঙ্গে সে আত্মচেতনও, এ জায়গায় *কদর্য এশীয়*র চরিত্রগুলো থেকে এ এশীয় অভিযাত্রীর চারিত্রিক অবস্থান অনেকটাই স্পষ্ট, এতে ঔপনিবেশিকদের চেহারাও বিলকুল পরিষ্কার। তাই যারা তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টির দক্ষতা এবং এ-অঞ্চলের রাজনৈতিক তৎপরতাকে ভিত্তি করে লিখিত ইংরেজি-ভাষায়-লেখা অন্যান্য ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের কথা মাথায় রেখে এ উপন্যাস দুটিকে পূর্ণাঙ্গ-চরিত্রহীন ও অসফল শিল্পপ্রয়াস বলে মূল্যায়ন করেন, তাদের এ-কথা মনে রাখা জরুরি যে, বিশ্বসাহিত্যের নিবিড় ও সতর্ক পাঠক ওয়ালীউল্লাহ্ আখ্যান ও চরিত্রের বয়ান ও বয়নবিষয়ে প্রাচীন প্রথাগত রীতি সজ্ঞানে বর্জন করেছিলেন।

উপন্যাস দুটি পড়া শেষ করে তাঁর এ রাজনৈতিক বিষয়বস্তু ও তৎকালিক পাক-মার্কিন সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনায় আনলে ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'আবু শারিয়া' ছদ্মনাম গ্রহণের কারণটিও আর অস্পষ্ট থাকে না। এ কারণে কট্টরপন্থী কেউ যদি কখনো গোপনীয়তার প্রসঙ্গ তুলে অভিযোগ করেন, তাহলে তার জবাবে একথা নির্দ্বিধায়ই বলা যাবে যে, কট্টরপন্থাও যেখানে প্রায়শই লক্ষ্যচ্যুত হয়, সেখানে ওয়ালীউল্লাহ্‌র দুটি উপন্যাসই হয়েছে একই সঙ্গে দায়িত্বশীল ও লক্ষ্যভেদী।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. এ অনুবাদের সম্পাদনাকাজে যুক্ত ছিলেন শহীদুল জহির ও সাজ্জাদ শরিফ।

২. আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্, *আমার স্বামী ওয়ালী [Wali, My Husband, as I saw him]*, শিবব্রত বর্মন অনূদিত, প্রথমা, ঢাকা, ২০১২ পৃ. ৫০

৩. সৈয়দ আকরম হোসেন-কর্তৃক উদ্ধৃত, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী* ২, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৫৬১

৪. আহসান হাবীব, 'লাল সালু', *চতুরঙ্গ থেকে দ্বিতীয় খণ্ড*, অশোক মিত্র সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১০৭

৫. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *স্মৃতিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২১-২২ [সেই সময়কার পূর্ববাংলার লেখকদের সম্পর্কে সৈয়দ নসরুল্লাহ লিখেছেন : 'তখন যাঁরা গল্প-উপন্যাস লিখতেন, তারা রোমান্সের উপরেই জোর দিতেন। তরুণ-তরুণীদের জন্য লাভস্টোরি ধরনের লেখা। কেউ কেউ Downtroden people-দের দুঃখ-দুর্দশার কথা তাদের গল্পে বলতেন। সেই অবস্থায় *লালসালু* ছিল ব্যতিক্রম। লাভস্টোরিও না, সরাসরি গরিব-দুঃখীর কথাও না। ধর্মীয় গোঁড়ামির কথা। কাহিনিটি তখনকার পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারেননি।']

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

৭. আন মারি ওয়ালীউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আরেক পূর্ববঙ্গ', *প্রথম আলো* [২৩ জুন], মতিউর রহমান সম্পাদিত, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৩

৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, *কদর্য এশীয় [The Ugly Asian]*, শিবব্রত বর্মন অনূদিত, ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ১৭১

১০. মার্কস এঙ্গেলস, *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*, *নির্বাচিত রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২৫

১১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

১২. পূর্বোক্ত, ২৩

১৩. বেগম আকতার কামাল, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *কদর্য এশীয়* : ক্ষুধা ও রাজনৈতিক মতাদর্শ', *নান্দীপাঠ* ৬, সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৪৬

১৪. লিয়াকত আলী খান, *পাকিস্তান এশিয়ার প্রাণকেন্দ্র, [Pakistan : The Heart of Asia]*, আবদুর রহীম অনূদিত [১৯৫০ সালের মে ও জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফররত পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান ও বেগম লিয়াকত আলী খান কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতাবলী], নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ১২২

১৫. তারিক আলী, *পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ জান্তা না জনতা [Pakistan : Military Rule or People's Power]* মাহফুজ উল্লাহ অনূদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৬১

১৬. খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ইংরেজি লেখা', *নান্দীপাঠ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১-২৪২

১৭. সাজ্জাদ শরিফ, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : প্রচ্ছদের অন্তরালে', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-সংখ্যাহীন ভূমিকা।

১৮. আন মারি ওয়ালীউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭; [এ-বইয়ের ভূমিকায় আনিসুজ্জামান লিখেছেন : 'আন মারি তাঁকে মার্কসবাদী বলেছেন; মার্ক্‌সবাদী না হলেও তিনি ছিলেন অনেকটা বাঁমঘেষা। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন তাঁর কাম্য ছিল।' পৃ. ১০]

১৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

২০. *নান্দীপাঠ* ৬, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২ [বেগম আকতার কামাল লিখেছেন : 'খুব আশ্চর্যভাবে মার্কিনিদের হৃদয়ের এই রক্তক্ষরণকে ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর জন্যে, আহসান যেন অনুভব করে। এই অনুভব ওয়ালীউল্লাহ্‌রও। দরিদ্রের ক্ষুধা নিয়ে তাঁর এই উপলব্ধি/বিশ্বাস গভীরতাস্পর্শী সহৃদয়বাদের স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁর শৈল্পিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পুনরাবৃত্ত এবং শ্রেণিসত্তাভিত্তিক উদারনৈতিক মতবাদের ফলশ্রুতি']; ['কদর্য এশীয় : ঠাণ্ডাযুদ্ধের তপ্ত বয়ান' প্রবন্ধে মাসুদুজ্জামান লিখেছেন : 'সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের অংশ হিসেবে জনসন বা মার্কিনিরা যে তত্ত্ব হাজির করেছিলেন, প্রফেসর আহসান তার বিপরীত বয়ান নির্মাণ করেছেন। একথাও অনুমান করা সম্ভব যে, এ ছিল আসলে ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌রও রাজনৈতিক ভাবনা।' পৃ. ২৬৪];

২১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

২২. পূর্বোক্ত, ১৬৯

২৩. *প্রথম আলো*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩ [সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন : 'আহসানকে কদর্য এশীয় হিসেবেই তারা দেখবে, যদি দেখতে চায়।' ...'আমেরিকানদের পক্ষে এমনটা না করে উপায়ও নেই, কেননা তাদের নিজেদের চোখে রয়েছে আমেরিকার স্বার্থের ঠুলি; সেটা দিয়ে দেখলে দেশপ্রেমিক আহসানদের কুৎসিত ভিন্ন অন্য কিছু মনে হওয়ার উপায় নেই।']

২৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

২৫. কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস : *কদর্য এশীয়*, থিসিস উপন্যাস?', নান্দীপাঠ৬, পূর্বোক্ত সাজ্জাদ আরেফিন, পৃ. ২৩৬

২৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, *শিম কীভাবে রান্না করতে হয় [How Does One Cook Bean's]*, শিবব্রত বর্মন অনূদিত, প্রথমা, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১২

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

২৮. আন মারি ওয়ালীউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬

২৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-১৮

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১-৪২

৪০. সতীনাথ ভাদুড়ী, *সত্যি ভ্রমণ কাহিনী*, *সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত রচনা* দ্বিতীয় খণ্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১৬

৪১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২ ['পরিশিষ্ট' অংশে পুনর্মুদ্রিত সাজ্জাদ শরিফ লিখিত 'ভূমিকা', এটি ২০০৪ সালে *প্রথম আলো* ঈদ সংখ্যায় *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়* বইটির প্রথম প্রকাশকালে লিখিত]

৪৩. পূর্বোক্ত, সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখিত ভূমিকা, পৃ. ১০

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ছত্রিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/জুন ২০১৮

মুক্তিযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে মার্চ ১৯৭১

সাবিনা নার্গিস লিপি*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ১৯৭১-এর মার্চের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনাবহুল মার্চ তাৎপর্যময় এ কারণে যে, এ সূত্রপথেই বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের দুয়ারে প্রবেশ। মার্চই হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৭০-এর নির্বাচন শেষে ১লা মার্চের Constituent Assembly-র অধিবেশন স্থগিত ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলন ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ পর্যন্ত চলমান ছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে তা আরো জোরালো হয়। আন্দোলন কোথাও শিথিল হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে মার্চ '৭১ সম্পর্কিত ব্রিটিশ ও মার্কিন কিছু অবমুক্ত (declassified) করা দলিল, সমসাময়িক সংবাদপত্র ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে এবং অসহযোগ আন্দোলনের অনিবার্যতা বিশ্লেষিত হয়েছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি (১৯৪৭) হওয়ার পর ১৯৭০-এর নির্বাচন ছিল প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যুক্ত পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ জাতীয় নির্বাচন। নির্বাচনের ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া LFO (Legal Framework Order) জারি করেছিলেন যার আওতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে সামরিক শাসনের মধ্যেও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু প্রশাসনের এতসব নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও নির্বাচনের ফলাফল সামরিক প্রশাসনকে বিচলিত করে। ফলাফলে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি (পিপিপি) ৮৩টিতে বিজয়ী হয়েছে।[১] এ ফলাফলকে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো কোনো জ্যেষ্ঠ জেনারেল 'Disaster' বলে উল্লেখ করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক রিজভিকে ফলাফল নিয়ে ভর্ৎসনাও করেছিলেন। কারণ, তিনি নির্বাচন–পূর্ব ভবিষ্যদ্বাণীতে কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না বলেছিলেন।[২] অথচ ফলাফল ছিল এর বিপরীত। পূর্ব পাকিস্তানে

---

*সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আওয়ামী লীগের বিজয় সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নিশ্চিত ছিল, তবে এরকম নিরঙ্কুশ বিজয়ের ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল না। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় বসার কথা থাকলেও সেটা স্থগিত করে দেয়া হয়। এ স্থগিত ঘোষণাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং মার্চের ঘটনাক্রম এগুতে থাকে। যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের সন্ধিক্ষণই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় তাই এতে ১লা মার্চ হতে ২৫শে মার্চের ঘটনাবলি উপস্থাপিত ও বিশ্লেষিত হবে। ২৫শে মার্চের হত্যাযজ্ঞ অপারেশন সার্চলাইট, যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছিল, এ প্রবন্ধের আওতাবহির্ভূত বলে এবং ২৬শে মার্চ যেহেতু স্বাধীনতার ঘোষণা আসে এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তাই এসব বিষয় এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়নি।

এক

১৯৪৭-পরবর্তী নানা ঘটনা বাঙালিদের মনে যুক্ত পাকিস্তানের প্রতি এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি তিক্ত অভিজ্ঞতা ও সন্দেহের জন্ম দেয়। এ সব তিক্ততার পরিণতিতে সৃষ্টি হয় ছয়দফা আন্দোলন। সর্বশেষ নির্বাচন (১৯৭০) অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা থাকলেও পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা এ ব্যাপারে গড়িমসি করে পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তোলে। বস্তুত নির্বাচন পাকিস্তানের দু-অংশের ভেতরকার দ্বন্দ্বকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ Cyril Pickard-এর মতে,'The Elections solved nothing. The very success of Sheikh Mujibur Rahman, made him a prisoner of his own extremists, and the lesser success of Bhutto in the west confronted him with an opponent, less interested in a constitutional settlement than power through the ruin of Mujib.'[৩] নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় বাঙালিদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। ১লা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা বাঙালিদের স্তম্ভিত করে দেয় এবং রাজনৈতিক অবিশ্বাসটা স্পষ্ট হয়ে যায়। পাকিস্তানি জেনারেল রাও ফরমান আলী তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন, 'অধিবেশন স্থগিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলা যেতে পারে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলো'।[৪] তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে আসে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২রা মার্চ ঢাকায় ও ৩রা মার্চ সারাদেশে হরতালের ডাক দেন। এ হরতাল ঘোষণার মধ্য দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের শুরু এবং এ হরতাল এত স্বতঃস্ফূর্ত ছিল যে রাস্তায় কোন যানবাহন চলেনি বা দোকানপাটও খোলেনি। এক ব্রিটিশ কূটনীতিবিদের ভাষায় '….. business, industry at a standstill, shops closed, the roads devoid of vehicles, railways halted, PIA flights grounded. Altogether, a pretty strong vote of support for Sheikh Mujib',[৫] পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ প্রতি সন্ধ্যায় কারফিউ জারি করে এবং

আওয়ামী লীগের মিছিলে গুলি চালায়, ফলে ৩রা মার্চকে শোক দিবস ঘোষণা করা হয়। ২রা মার্চ স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। আবার ৩রা মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এক ইশতেহারে (ইশতেহার নং এক) স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা দেয়।[৬] ৪ঠা মার্চের হরতালে ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামের অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। এ দিন চট্টগ্রামে ১২০ জন নিহত হয় বলে সংবাদে প্রকাশ পায়।[৭] হরতালে সব অচল হলেও শেখ মুজিবের বিশেষ নির্দেশে ৪ঠা মার্চ থেকে সরকারি ও বেসরকারি অফিসের কর্মচারীদের বেতন নেওয়ার সুবিধার্থে বেলা ২.৩০ থেকে ৪.৩০টা পর্যন্ত ব্যাংক খোলা রাখা হয়।[৮] অফিসের স্বাভাবিক সময় নয় বরং মুজিব নির্দেশিত সময়ই নির্ধারণ করা হয় ব্যাংকের কার্যাবলি সম্পাদন করার জন্য। এসময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নানা রাজনৈতিক দল ও সংগঠন (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ববাংলা ছাত্রশক্তি, পিডিপি, পাকিস্তান জাতীয় লীগ, জাতীয় গণমুক্তি দল, ন্যাপ, পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন) শেখ মুজিবের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।[৯]

ইয়াহিয়া খান ইতোমধ্যে ৬ই মার্চ রাতে দেশবাসীর উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষিত Constituent Assembly-র সভা ২৫শে মার্চ আহবানের ঘোষণা দেন। এ অধিবেশন আহবান নিয়ে বাঙালিরা সন্দিহান ছিলেন। কারণ, ইয়াহিয়া খান পরিস্থিতির জন্য বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগকে দায়ী করে যেভাবে বক্তব্য দিয়েছিলেন তাতে এটা স্পষ্ট ছিল, শান্তি নিশ্চিত করা নয় বরং আন্দোলন দমন করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। সেনাশাসন ব্যবস্থাই একমাত্র সমাধান বলে তিনি ভেবেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে ইতঃপূর্বে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিরাল আহসান এবং গভর্নর লে. জে. ইয়াকুবকে (যারা বাঙালিদের প্রতি নমনীয় ছিলেন) অপসারণ করে টিক্কা খান, যিনি বেলুচিস্তানের কসাই হিসেবে পরিচিত তাকে নিয়োগ দেন।[১০] তাকে নিয়োগের উদ্দেশ্য পরিস্থিতি আরো খারাপ হলে যাতে কঠোর হাতে তিনি দমন করতে পারেন। এ ঘটনাগুলো কাকতালীয় আকস্মিকতা নয় বরং পরিকল্পিত। ৬ই মার্চ জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণ এবং ৭ই মার্চ টিক্কা খানকে ঢাকায় প্রেরণ ইয়াহিয়ার দূরভিসন্ধির পরিচায়ক। দুটি বিষয়ই যাতে বঙ্গবন্ধুর পূর্বঘোষিত ৭ই মার্চের জনসভায় প্রভাব ফেলে, ইয়াহিয়া তার বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলেন। কেবল তাই নয়, ৬ই মার্চ রাতে একজন ব্রিগেডিয়ারকে মুজিবের সাথে যোগাযোগের জন্য পাঠানো হয় শীঘ্রই ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমনের সংবাদ নিয়ে।[১১] এসব ঘটনার উদ্দেশ্য ছিল ৭ই মার্চের ভাষণকে প্রভাবিত করা।

একইভাবে, ইয়াহিয়ার মনোভাব নিয়ে বিদেশি কূটনীতিকরাও সন্দিহান ছিলেন। ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ এক কূটনীতিবিদ মন্তব্য করেন, যে রকম যুধ্যমান এবং আপসবিরোধী মনোভাব নিয়ে ইয়াহিয়া অধিবেশন আহবান করেছেন তাতে বিরোধ নিবারক স্বরের অনুপস্থিতি স্পষ্ট। তিনি আরো মন্তব্য করেন, রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি যেরকম বিদ্বেষ ইয়াহিয়া পোষণ করছেন

তাতে ক্ষোভ আরো বাড়বে।[১২] কার্যত হয়েছিলও তাই। ৬ই মার্চ ঢাকা, টঙ্গী ও রাজশাহীতে পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণ ও প্রায় ৫০ জনের মৃত্যু বাঙালিদের আরো ক্ষিপ্ত করে তোলে।[১৩] এরূপ পরিস্থিতিতে ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও দিকনির্দেশনার জন্য বাঙালিরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও কুটনীতিকেরা বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা বলেন। কিছু ব্রিটিশ পত্রিকা পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে।[১৪] আমেরিকান কূটনীতিবিদ Van Hollen মুজিবের ভাষণে ৩টি সম্ভাব্য বিকল্পের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, মুজিব হয়ত একতরফা স্বাধীনতা (UDI) বা পূর্ণ স্বাধীনতার মতো কিছু প্রস্তাব অথবা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ২৫শে মার্চের অধিবেশন আহবানের সাথে একমত হতে পারেন।[১৫] সেই মাহেন্দ্রক্ষণে বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করেন,''এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, জয় বাংলা"। বস্তুত বঙ্গবন্ধুর এ উচ্চারণ একতরফা স্বাধীনতার মতোও নয় আবার পূর্ণ স্বাধীনতা থেকেও কম কিছু নয়। সরাসরি স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করলে মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা থাকত। এ ঘোষণা স্বাধীনতার জন্য পরবর্তী করণীয় ঠিক করে দেয়। এ ভাষণের মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা ছাড়া পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কাছে অন্য কোনো বিকল্প নেই। স্বাধীনতা যুদ্ধের যাত্রা শুরুর লগ্ন মার্চের এই প্রথম সপ্তাহ।

দুই

মার্চের প্রথম সপ্তাহের মতো দ্বিতীয় সপ্তাহেও অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণরূপে চলমান ছিল। ৮ এবং ৯ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে কিছু নির্দেশনা আসে। সরকারি বেসরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও কোর্টে হরতাল পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ৮ই মার্চের নির্দেশনায় ব্যাংকের প্রতি আলাদা নির্দেশ জারি করা হয় বাঙালি ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ মোতাবেক।[১৬] ব্যাংকের প্রতি ঘোষিত এই নির্দেশসমূহ কতটা জোরালোভাবে পালন করা হতো তার একটা উদাহরণ পাওয়া যায় আইয়ুব খানের ডায়েরিতে। তিনি উল্লেখ করেছেন, এডমিরাল আহসানের মিলিটারি সেক্রেটারি করাচিতে ফিরে যাওয়ার আগে ব্যাংকে রাখা তার স্ত্রীর অলংকার ফিরিয়ে আনতে গেলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবের অনুমতি ছাড়া তা দেওয়া হবেনা বলে জানিয়ে দেয় এবং পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবের মধ্যস্থতায় তিনি তা ফেরত পান।[১৭] অসহযোগ আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষের ছিল এমনই সাড়া। ১১ই মার্চের দিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সচল রাখার জন্য ব্যাংকিং কার্যক্রম ও কিছু প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে ছাড় দিয়ে প্রায় ১৬টির মতো নির্দেশনা দেওয়া হয়।[১৮] এ জাতীয় কর্মসূচিতে রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে দাবি আদায়ের একটা চেষ্টা থাকে। কিন্তু সাধারণ জনগণের কথা চিন্তা করে পরবর্তী সময়ে এসব ছাড় দেওয়া হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের অন্য রাজনৈতিক দলগুলো যেমন ন্যাপ (ওয়ালী খান), ন্যাপ (ভাসানী), আওয়ামী লীগের দাবিকে সমর্থন জানায়। লক্ষণীয় বিষয়, কেবল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগ এবং পিপিপি ছাড়া কিছু রাজনৈতিক দলও

মুজিবের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে ছিল।[১৯] এমনকি Punjab Pakistan Front এর মতো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলও ভুট্টোর অবস্থানকে সমালোচনা করে মুজিবের দাবিকে সমর্থন করে।[২০] এ রকম বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন মুজিবের আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতাকে পরিব্যাপ্ত করে। তবে বরাবরের মতো পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ প্রচারণা চালায়। অথচ সংবাদ মাধ্যম ও বিভিন্ন কূটনীতিক রিপোর্টে এর বিপরীত চিত্র মেলে। ঢাকায় থেকে ব্রিটিশ কূটনীতিবিদদের পাঠানো রিপোর্টে, অসহযোগ আন্দোলনের ফলে স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ায় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব, বিদেশ থেকে তার বা চিঠিপত্র আদান প্রদান ব্যাহত এবং ব্যবসা বাণিজ্যে উৎপাদন ও রপ্তানির পরিমাণ দ্রুত পতনের কথা উল্লেখ করা হয়।[২১] কারফিউ এবং আন্দোলনের ফলে অর্থনীতি ও জনজীবন কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তার একটা বিবরণ এসব রিপোর্টে পাওয়া যায়।

আন্দোলনের দ্বিতীয় সপ্তাহে পূর্ব বাংলার সম্পূর্ণ প্রশাসন অর্থাৎ অফিস, আদালত, ব্যাংক, বিমা, কলকারখানা, পরিবহণ, পোর্ট, ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেতার, টেলিভিশন সব কিছু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে খুলেছে, তাঁর নির্দেশেই বন্ধ হয়েছে। যুক্তরাজ্যের *Evening Standard* পত্রিকায় শেখ মুজিবর রহমানকে 'Real boss of East Pakistan' বলে উল্লেখ করা হয়।[২২] বস্তুত পূর্ব পাকিস্তানে তখন সামরিক জান্তা দেশ চালালেও নির্দেশ প্রতিপালিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর এবং পুরো নিয়ন্ত্রণও ছিল তাঁর। পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের অবস্থান বুঝানোর জন্য একজন ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ তাঁর রিপোর্টে লেখেন, 'It was the Sheik's writ that ran in East Pakistan and not that of the president and the central government'.[২৩]

তিন

তৃতীয় সপ্তাহে আইন অমান্য আন্দোলন আরো কঠোর হয়। আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলি অনুসারে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অফিস ও সার্ভিসসমূহ চালু থাকে। ১৫ই মার্চ আবার নতুন কর্মসূচি দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর দেওয়া কর্মসূচিতে বলেন, মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত সংগ্রাম নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে। বস্তুত আন্দোলন শেষ পর্যন্ত অব্যাহতই ছিল। ১৫ই মার্চের নির্দেশানুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি অফিসকে পূর্বের মতো হরতাল পালনের কথা বলা হয়। তবে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইপিআরটিসি-র বাস চালু এবং রেলওয়ে চালু থাকার কথা উল্লেখ করা হয়। তবে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় যে, সৈন্য আনা নেওয়া বা সমরাস্ত্র পরিবহণের কাজে বা মানুষের উপর নির্যাতন চালানোর উদ্দেশ্যে এগুলোকে ব্যবহার করা যাবে না। একই নির্দেশ নৌ পরিবহণের ক্ষেত্রেও দেওয়া হয়। তাছাড়া সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থার কর্মচারী ও প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার কথাও এ নির্দেশে উল্লেখ ছিল।[২৪]

১৫ই মার্চে গৃহীত এই ৩৫টি পদক্ষেপ বিদেশি কূটনীতিকদেরও প্রশংসা পায়। মার্কিন কূটনীতিক জোসেফ সিসকো পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্সকে লিখিত চিঠিতে এ নির্দেশনাগুলিকে 'সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত' পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেন।[২৫] এ নির্দেশগুলির আহবানে সাধারণ মানুষের সাড়া ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। এমনকি ইতঃপূর্বে ১৩ই মার্চে সামরিক আইন প্রশাসকের জারিকৃত ১১৫ নং সামরিক আইন আদেশ মোতাবেক সামরিক প্রতিষ্ঠানের বেসামরিক কর্মচারীদের কাজে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কর্মচ্যুতি ও কোর্ট মার্শালের ভীতি সত্ত্বেও সামরিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত প্রায় ১১ শত বেসামরিক কর্মচারী চাকরিতে যোগদান করেনি।[২৬] নির্যাতন ও ভীতি প্রদর্শনের মধ্যেও অসহযোগ আন্দোলনকারীরা তাদের লক্ষ্যে অটল থাকে।

চলতি রাষ্ট্রীয় কাঠামো হুমকির মুখে এরূপ বাস্তবতায় সংকট সমাধানের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আন্তরিক– এ ধরনের মনোবৃত্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে পৌঁছান। একই দিনে বঙ্গবন্ধুর ৩৫টি নির্দেশনা প্রদানও গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে একটি পরিষ্কার বার্তা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছিল যে, অসহযোগ আন্দোলনের পরিস্থিতি যেন আলোচনার বিবেচনীয় বিষয় হয়ে ওঠে। পরদিন অর্থাৎ ১৬ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ এবং আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় বঙ্গবন্ধু আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন। আলোচনার আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সামরিক জান্তার সৈন্য আনার কাজ চলছিল। অবশ্য সৈন্য আনার কাজটি শুরু হয়েছিল মার্চের শুরু থেকেই। আমেরিকান রিপোর্টে দেখা যায়, পাকিস্তানি বাণিজ্যিক এয়ারলাইনস এবং জাহাজের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক সৈন্য ঢাকায় আসে ৪ঠা মার্চে।[২৭] আর ব্রিটিশ রিপোর্ট অনুযায়ী, মধ্য মার্চ থেকে প্রায় ১৫,০০০ সৈন্য ঢাকায় প্রেরিত হয়। একই রিপোর্টে সাগরপথে 'Ocean Endurance' নামক জাহাজে সৈন্য, ট্যাংক এবং এ্যমুনিশন আনার কথাও উল্লেখ করা হয়। এমনকি পিআইএ (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস)-এর চেয়ারম্যান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে পিআইএ-এর ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশ্বাসও পায়।[২৮] সাংবাদিক ম্যাসকারেনহাস তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন, ২ থেকে ২৪শে মার্চের মধ্যে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার বাণিজ্যিক ফ্লাইট প্রায় ১২,০০০ সেনা বহন করে আনে।[২৯] এভাবে তৃতীয় সপ্তাহে অসহযোগ আন্দোলন চলার পাশাপাশি প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা এবং একই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আনার কাজও চলতে থাকে। ২১শে মার্চ ভুট্টো ঢাকায় এসে পৌঁছান। এতে সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে।

চার

মার্চের শেষ সপ্তাহেও ইয়াহিয়া-মুজিবের আলোচনা অব্যাহত থাকে। ১৫-২৫শে মার্চে পর্যন্ত চলা এ আলোচনাকে ম্যাসকারেনহাস 'আধুনিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক হেঁয়ালির নাট্যমঞ্চ'

বলেছেন।[৩০] আর রেহমান সোবহানের ভাষায় 'Negotiations Overtaken by War'।[৩১] মার্শাল ল প্রত্যাহার করা এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রশ্নে মতানৈক্য দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতার পথ রুদ্ধ করে দেয়। ২২শে মার্চ, পূর্ব ঘোষিত ২৫শে মার্চের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন পুনরায় স্থগিত করা হয়। ২৩শে মার্চ প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করা হয় এবং স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এ দিনটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালন করে। অসহযোগ আন্দোলনে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে ছাত্র সমাজ। মার্চের শুরুর দিকেই ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩রা মার্চ ছাত্রলীগের সভায় স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়। ৭ই মার্চের ভাষণের আগে বঙ্গবন্ধুর উপর ছাত্র সমাজ পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। ১১ই মার্চ ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক পল্টনে সভা করে এবং ১৬ই মার্চের দিকে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রাত জেগে মহল্লায় মহল্লায় পাহারার ব্যবস্থা করে। মার্চের শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নিয়মিত শহীদ মিনারে সমাবেশ করে। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ভবনে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ শুরু করে। ২০শে মার্চে ছাত্র ইউনিয়নের ট্রেনিংপ্রাপ্ত শত শত গণবাহিনী রাজপথে ডামি রাইফেল কাঁধে নিয়ে মার্চপাস্ট করে।[৩২]

২৩শে মার্চের প্রতিরোধ দিবসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে আনুষ্ঠানিকভাবেই বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেন। একই দিনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা লাগিয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে যান।[৩৩] এভাবে নতুন একটি পতাকা লাগানোর অর্থ চলতি রাষ্ট্রীয় কাঠামোকেই অস্বীকার করা। ২৪শে মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে এমভি সোয়াত জাহাজ থেকে সামরিক বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র খালাস করার কথা ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার মানুষ বন্দর এলাকা ঘেরাও করে। বন্দরে নোঙর করা অস্ত্রবাহী সেই পাকিস্তানি জাহাজ এমভি সোয়াত থেকে অস্ত্র নামাতে কৌশলে বাধা দেন তখনকার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ডার বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা এম আর মজুমদার, যার কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার ও অমানুষিক নির্যাতন করা হয়।[৩৪]

আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের নীলনকশাও আরো স্পষ্ট হয়। ২৫শে মার্চে আক্রমণের মধ্য দিয়ে তাদের সে মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। তবে আলোচনা ব্যর্থ হলেও আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। আন্দোলনের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন তার অব্যর্থ প্রমাণ। তবে এ স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে অনেক মূল্যে। ২৫শে মার্চে শুরু হওয়া Operation Searchlight-এর মাধ্যমে বাঙালি নিধনের যে সূত্রপাত তা পরবর্তী নয় মাস অব্যাহত থাকে। ২৫শে মার্চের আক্রমণকে একজন ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ 'Reign of terror' বলে এবং বাঙালি নিধনের কৌশলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা সফল হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন। ঢাকার ডেপুটি হাইকমিশনার তাঁর রিপোর্টে অফিসের প্রত্যক্ষদর্শী কর্মচারীর বরাত দিয়ে রাস্তায় মরদেহ পড়ে থাকা, নদীতে লাশ ভেসে থাকা এবং নয় ট্রাক লাশ মিউনিসিপ্যাল

রাবিশ ডাম্পে পুঁতে ফেলার বর্ণনা দিয়েছেন।[৩৫] মার্চের পরিস্থিতিকে বুঝতে পাকিস্তানের সরকারি ভাষ্যের বিপরীতে নিরপেক্ষ ও নির্মোহ তৃতীয় পক্ষ হিসেবে বাইরের এ রিপোর্টগুলি খুবই মূল্যবান। বাস্তবে ২৫শে মার্চের এ আক্রমণ বাঙালিদের মনে স্বাধীনতা ঘোষণা ছাড়া বিকল্প আর কিছু আসেনি। বহির্বিশ্বের সংবাদ মাধ্যম ও কূটনীতিক রির্পোটে মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের রূপ যেভাবে ধরা পড়েছে তা এ আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধিতে সহায়ক।

পাঁচ

মার্চের প্রায় ২৫ দিন ব্যাপী (১লা মার্চ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা থেকে শুরু করে ২৫শে মার্চ রাতে আক্রমণ পর্যন্ত) অসহযোগ আন্দোলনের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৭৮৯ সালে প্যারিসে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল, বাস্তিল দুর্গের পতনের (১৪ই জুলাই ১৭৮৯) আগ পর্যন্ত, সেসব যেমন ফরাসি বিপ্লবের জন্য অনুঘটক ছিল এবং ওখান থেকে ফরাসিবাসীদের ফিরে আসার পথ ছিল না, ঠিক তেমনি ১লা মার্চের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার ফলে বাঙালিদের পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে এক থাকার পথ বন্ধ হয়ে যায়। বাস্তবে এসময় পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব কেবল সেনাবাহিনীর ছাউনিতে আবদ্ধ ছিল যা পরবর্তী নয় মাসে প্রমাণিত হয়েছিল।

চার সপ্তাহের আন্দোলনের ধরন বা চরিত্র ছিল নিয়মতান্ত্রিক। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু যেমন একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি আবার এটা ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার মতোই। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর দেওয়া নির্দেশাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ এবং নিয়মাতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সাধারণ জনগণের বিপুল সমর্থন প্রমাণ করে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি অনীহা কত গভীর ছিল। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের জন্য পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ আলোচনার নামে যে শঠতার আশ্রয় নেয় তাতেও বাঙালি নেতারা আলাপ আলোচনাকে নাকচ করেননি। বরং দাবি আদায়ের পর্যায়ক্রমিক ধাপ অতিক্রম করে তবেই চূড়ান্ত পথে অগ্রসর হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এরূপ শান্তিপূর্ণ আইন অমান্যের ঘটনা পাকিস্তানের ইতিহাসে নজিরবিহীন। এরও প্রায় ৫০ বছর আগে ভারতে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে শুরু হওয়া অহিংস অসহযোগ আন্দোলনও (১৯২১) শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকেনি। যার ফলে গান্ধিজি আন্দোলন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অহিংস আন্দোলনের আজীবন ভক্ত খান ওয়ালি খান মার্চের আন্দোলন সম্পর্কে বলেছেন 'এমনকি গান্ধিজিও বিস্মিত হতেন'।[৩৬] প্রায় ৪ সপ্তাহের মতো অসহযোগ আন্দোলনের দিকে তাকালে দেখা যায়, আন্দোলন ছিল ক্রমচলমান। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের কোথাও ছেদ পড়েনি। এ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যই ছিল স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যমুখী। এ আন্দোলন কোনো শ্রেণি বিশেষের ছিল না বরং সকল স্তরের লোকের অংশগ্রহণ এতে দৃষ্টিগোচর হয়। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত

হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে এ আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরিণতি প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুত কোনো জাতির জীবনে এমনকিছু সময় আসে, সময়ের ব্যবধানে পার্থক্য থাকলেও পরিপ্রেক্ষিত থাকে একই রকমের, যেমনটা চার্লস ডিকেন্স ফরাসি বিপ্লবের সময়টাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন 'It was the best of times, it was the worst of times' ফরাসি বিপ্লবের সময়কে উপলক্ষ করে লেখা এ বাক্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা শুরুর সন্ধিক্ষণে মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপারে সমভাবে প্রযোজ্য। 'worst' এই অর্থে এই মার্চেই পরিকল্পিত বাঙালি নিধনের সূত্রপাত, আবার 'best' এই অর্থে এই মার্চেই আসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা।

তথ্যনির্দেশ

১. ১৯৭০ এর পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Craig Baxter, Pakistan Votes-1970, *Asian Survey*, 11 (1971), pp. 197-218

২. Hasan Zaheer, *The Separation of East Pakistan* : *The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism*, UPL, Dhaka, 2001, p.130

৩. FCO 37/870 (Foreign Commonwealth Office Report), Telegram from Islamabad to Douglas Hume, 21 May, 1971: FCO 37/876, Telegram from Islamabad to FCO, No. 239, 6 March 1971

৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Rao Forman Ali, *How Pakistan Got Divided* (*বাংলাদেশের জন্ম*, শাহ আহমদ রেজা অনুদিত), UPL, ১৯৯৬

৫. FCO 37/876, Telegram from Islamabad to H.C. Byatt (SAD) Pakistan: the internal political situation, 2 March 1971

৬. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-১৯৭১)*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৬০৬

৭. *দৈনিক আজাদী*, ৫ মার্চ ১৯৭১, ১১শ বর্ষ, ১৫৪ সংখ্যা, পৃ. ১

৮. Kamal Hossain, *Bangladesh : Quest for Freedom and Justice*, UPL, Dhaka, 2013. p. 86

৯. মোহাম্মদ হান্নান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২৩; *The Morning News*, 8 March, 1971, Vol. XXIX, no. 233, *The Pakistan Observer*, 10 March, 1971, No. 647, p. 1

১০. এ এফ এম সালাহউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ২০৭

১১. Kamal Hossain, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭

১২. FCO 37/876, Telegram from Islamabad to FCO, no. 236, 6 March, 1971.

১৩. J.N. Dixit, *Liberation and Beyond: Indo-Bangladesh Relation*, UPL, 1999, Dhaka, pp. 38-40

১৪. *The Guardian*, 5 March, 1971, p.12; *The Daily Telegraph*, 6 March 1975, p.1; *The Sunday Times*, 7 March, 1971, p. 9

১৫. FCO 37/876, Telegram from Washington to FCO, no.802, 6 March 1971.

১৬. Kamal Hossain, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯০

১৭. Craig Baxter (eds), *Diaries of Field Marshal Mohammad Aiyub Khan (1966-72)*, Oxford University Press, 2007, p. 462

১৮. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪, খণ্ড-২, পৃ.৭৩১-৭৩৩

১৯. J.N. Dixit; *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮-৪০

২০. *দৈনিক আজাদী* (চট্টগ্রাম), ১৪ই মার্চ, ১৯৭১, ১১শ বর্ষ, ১৬২শ সংখ্যা, পৃ. ১

২১. FCO 37/877, Telegram from Dacca to FCO, no.89, 10 March, 1971.

২২. *Evening Standared*, 12 March, 1971, P. 10

২৩. FCO 37/876, 'Situation in East Pakistan', Telegram from Islamabad to FCO. no. 239, 6 March, 1971.

২৪. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ : প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪৩

২৫. দৈনিক *প্রথম আলো*, *মার্কিন রেড টেপ ফাইলে অহিংস বঙ্গবন্ধু*, মিজানুর রহমান খান, ৬ মার্চ, ২০১৬, বর্ষ ১৮, সংখ্যা ১২২, পৃ. ৫

২৬. *দৈনিক আজাদী (চট্টগ্রাম)*, ১৬ মার্চ, ১৯৭১, ১১শ বর্ষ, ১৬৪শ সংখ্যা, পৃ. ১

২৭. FRUS (Foreign Relation of United States), Vol. IX, March 4, 1971

২৮. PREM (Prime Minister Office Report) 15/568, 'Pakistan situation report from Pakistan emergency unit to 10 Downing street, FCO 37/884, PIA flights to Dacca, Telegram from Karachi to Islamabad, no.102, 19 April, 1971

২৯. অ্যান্থনি মাসকারেনহাস, *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ* (রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী অনূদিত), পপুলার পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৮৭

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

৩১. Rehman Sobhan, 'Negotiation Overtaken by War' *South Asian Review*, July 1971. উদ্ধৃত, ত্রিবেদী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫৪

৩২. মোহাম্মদ হাননান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪৯; *The Morning News*, 11 March 1971, Vol XXIX, No.236, p.4; *The Morning News*, 16 March, 1971, Vol XXIX, No. 241, p. 4

৩৩. Kamal Hossain, *পূর্বোক্ত*, p. 100

৩৪. *টরমেন্টিং সেভেন্টি ওয়ান : অ্যান অ্যাকাউন্ট অব পাকিস্তান আর্মিস অ্যাট্রোসিটিজ ডিউরিং বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার অব ১৯৭১*, সম্পাদক : শাহরিয়ার কবির, *আই ওয়াজ পুট ইন আ গানি ব্যাগ এণ্ড কেপ্ট ইন দ্যা স্কর্চিং সান*, ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদার (অব.) নির্মূল কমিটি (কমিটি ফর রেজিস্টিং কিলার্স এ্যান্ড কোলাবেরেটরস অব বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার অব ১৯৭১), ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯৯

৩৫. FCO 37/880, Telegram from Dacca to Islamabad, No. 199, 31 March, 1971.

৩৬. অ্যান্থনি মাসকারেনহাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ছত্রিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/জুন ২০১৮

বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের প্রয়োগ : একটি বিশ্লেষণ

মোঃ ওমর ফারুক*

সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন, দক্ষ জনসম্পদ তৈরি, শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত বিষয়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কাম্য। সুষ্ঠু এবং সুসংহত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন গতিশীলতার সঞ্চার করে ঠিক তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে। তাই বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার অধিকতর উন্নয়ন সময়ের দাবি। আর এ লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের প্রয়োগ ও এর ব্যবহার শিক্ষাক্ষেত্রে নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব (Scientific Management Theory) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কর্মীদের দক্ষতা ও শ্রম উৎপাদনশীলতা উন্নত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার অধিকতর উন্নয়ন এবং শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে বিষয়গুলোকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন তাহলো– পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্ব। বিদ্যালয়কে কাঙ্খিত লক্ষ্যে উন্নীত করতে হলে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। সুতরাং বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে বিজ্ঞানভিত্তিক এবং গণমানুষের কল্যাণভিত্তিক করার লক্ষ্যে খুব সতর্কতার সাথে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের প্রয়োগ কীভাবে করা যেতে পারে সে সম্পর্কিত একটি বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের ন্যায় বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে। শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে বিজ্ঞানভিত্তিক এবং গণমানুষের কল্যাণভিত্তিক করার লক্ষ্যে সচেষ্ট।[১] বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে উন্নয়ন ও পরিবর্তনের ধারা সুচিত হয়েছে, তাতে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষাব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে ফলপ্রসূ, আধুনিক এবং যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয়েছে।[২]

বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা মূলত একটি দলীয় সাংগঠনিক প্রক্রিয়া। দলীয় কার্যাবলি এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যেমন সুন্দর প্রশাসনের প্রয়োজন তেমনি শিক্ষার সাধারণ

---

* এম. ফিল গবেষক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এবং শিক্ষা কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্যও বিদ্যালয় প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিক্ষার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নের সব কর্মপ্রবাহ পরিচালিত হয় শিক্ষা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায়। কাজেই শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যতীত শিক্ষা ব্যবস্থাকে কাণ্ডারীবিহীন নৌকার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।[৩]

বিদ্যালয় হলো দলীয় কার্যাবলির সমষ্টি। সুতরাং এখানে কোন কাজই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন হয় না। কাজ সম্পাদন করার জন্য শ্রমদান এবং উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। একটি কারখানায় উৎপাদন করার জন্য লোকবল, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। কিন্তু একদল অসংগঠিত লোক, অবিন্যস্তভাবে পড়ে থাকা কিছু যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল আপনা আপনি উৎপাদন করতে পারে না। উৎপাদন করতে হলে অসংগঠিত লোকদের সংগঠিত করতে হয় এবং আনুষঙ্গিক অন্য কার্যাদি সম্পাদন করতে হয়।[৪] ঠিক তেমনি বিদ্যালয়ের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুসংগঠিত হতে হয়। আর এই সংগঠিত করার কাজটি বিদ্যালয় প্রশাসনকে একটি সুনির্দিষ্ট পন্থায়, নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন করতে হয়। ফলে উন্নত দেশগুলো প্রশাসন তত্ত্বকে বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে।

প্রশাসন তত্ত্বের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ফলে শিক্ষা প্রশাসনেও এই তত্ত্বের প্রয়োগ শুরু হয়।[৫] একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশাসন তত্ত্বের সঠিক প্রয়োগ করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য খুব সহজে ও কার্যকরভাবে অর্জন করা যায়। শিক্ষা প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন এবং পরিচালনা করতে বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন– বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব, প্রশাসনিক তত্ত্ব, মানবিক সম্পর্ক তত্ত্ব, উন্মুক্ত সংগঠন তত্ত্ব ইত্যাদি। এখানে প্রশাসন পরিচালনার 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন এবং নাগরিকগণের জন্য শিক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যথাযথ কর্মসূচি এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা প্রশাসনকে আধুনিকায়ন করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, গতিশীল, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ এবং ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের উপরও জোর দেয়া হয়।[৬] ফলে বাংলাদেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কিত পর্যালোচনা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

২. পর্যালোচনার উদ্দেশ্য ও অনুসৃত পদ্ধতি

নানা কারণে দেশের বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় অব্যবস্থাপনা থাকায় বিদ্যালয় পরিচালনায় কর্তৃপক্ষকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[৭] এর ধারাবাহিকতায় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ ও কার্যকরভাবে পরিচালনার নিমিত্তে এ প্রবন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এজন্য নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলিকে সামনে রাখা হয়েছে:

১. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও বাস্তবসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয় প্রশাসনকে গতিশীল করা;

২. মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশ সাধনে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনাকে বস্তবতার নিরিখে ফলপ্রসূ করে তোলা এবং

৩. শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মানসম্মত ও আধুনিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের যথাযথ প্রয়োগ অনুসন্ধান।

এ প্রবন্ধে বিদ্যালয় বলতে বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহকে বোঝানো হয়েছে। প্রবন্ধে বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।[৮] বিষয়বস্তুর গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি পূর্বেও অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে।[৯] সুতরাং বাংলাদেশের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব প্রয়োগের লক্ষ্যে এর সামগ্রিক বিষয়বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব পর্যালোচনা

অধ্যাপক শহীদ উদ্দীন আহমেদ-এর মতে, প্রশাসন তত্ত্বে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা টেইলরবাদ হিসেবে পরিচিত। সংগঠনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিধিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চর্চার এটাই প্রথম প্রয়াস।[১০] মূলত এফ. ডব্লিউ. টেইলর-কে (১৯১১) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের জনক বলা হয়। আর হেনরি ফেয়ল (১৯৪৪) এই তত্ত্বকে সম্পূর্ণ করে এক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চার করেন।

এফ. ডব্লিউ. টেইলর একজন যন্ত্রবিদ হিসেবে একটি ইস্পাত কারখানায় সাধারণ কর্মচারী রূপে যোগদান করে পরবর্তীকালে পদোন্নতি পেয়ে প্রধান প্রকৌশলী হন। দীর্ঘ সময় তিনি কাজের প্রতি শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গি অবলোকন ও উপলব্ধি করার সুযোগ পান।[১১] তিনি দেখেন

যে, শ্রমিকরা উৎপাদনে অযথা সময় নষ্ট করছে। সময়ের অপচয় তাকে বিচলিত করে। সময়ের অপচয় রোধকল্পে তিনি অনেক চিন্তা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

টেইলর সময় অপচয়ের দুটি প্রধান কারণ লক্ষ করেন। প্রথমত, শ্রমিকেরা তাদের কার্যসম্পাদনে অলস সময় অতিবাহিত করে। দ্বিতীয়ত, সময়ভিত্তিক মজুরি প্রদান কঠোর পরিশ্রমের প্রতি তেমন সহায়ক ছিল না। তিনি আরও লক্ষ করেন, সংগঠন থেকে শ্রমিক অপসারণ শ্রমিকদের অলসতার অন্যতম কারণ। কেননা অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা অধিক পরিমাণ কাজ সম্পাদন করা হত। আর শ্রমিকরাও বুঝতে পারলেন যে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে মূলত মালিকের কল্যাণ সাধনের জন্য।[১২] টেইলর আরো প্রত্যক্ষ করলেন যে, শ্রমিকরা উৎপাদনের দিকে ঠিকমত সময় ব্যয় করছে না, যার ফলে কারখানা/শিল্পে দিন দিন উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

টেইলর মনে করেন, এই উৎপাদন হ্রাস শ্রমিকদের জন্য চুরির সমতুল্য। তিনি এটা দেখে আরও বিস্মিত হলেন যে, এই ক্ষয়ক্ষতির দিকে মালিক শ্রেণির কোনো লক্ষ নেই।[১৩] এখানে লক্ষণীয় যে, উৎপাদনের জন্য কার্য-সম্পাদনের পদ্ধতিসমূহ অপরিপক্ব, শ্রমিকরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ক্ষমতা অনুপাতে অধিক মাত্রায় উৎপাদন করত না, আর যে সমস্ত যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হত তা খামখেয়ালি মত ব্যবহার করা হত। আর ব্যবস্থাপকগণও তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। এ জন্যই কাজের গতি শ্লথ ও কাজের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে বলে টেইলর মনে করেন।

পরবর্তীকালে টেইলর সংগঠনের কাজের গতিবৃদ্ধি ও বিধিবদ্ধ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজ পরিচালনার জন্য একটি তত্ত্ব দেন, যা 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[১৪] ১৯০৩ সালে টেইলর 'Shop Management'-এর উপর রচিত তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার মূল তত্ত্ব *American Society for Mechanical Engineers* এর কাছে পেশ করেন।[১৫] ১৯১১ সালে *The Principles of Scientific Management* পুস্তকে তাঁর উল্লিখিত মতবাদ প্রকাশিত হয়।

টেইলর প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা নীতিগুলির সারমর্ম ছিল নিম্নরূপ-

- প্রত্যেক উৎপাদন প্রয়াস একটি নির্দিষ্ট সময় ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে।
- সময় সমীক্ষার ভিত্তিতে উৎপাদিত দ্রব্যের আনুপাতিক হারে শ্রমিকের মজুরি প্রদান করা।
- ব্যবস্থাপনার কাজ হবে পরিকল্পনা করা, সময় ও গতি সমীক্ষা এবং অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে একটি আদর্শ পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যা অবশ্য করণীয়।
- ব্যবস্থাপক শুধু পরিকল্পনা করবেন না বরং শ্রমিকদের জন্য উত্তম কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ এবং তাদের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থাও করবেন।

- এ প্রশিক্ষণ অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে এবং দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমিকদের মাঝে পার্থক্যমূলক মজুরি প্রথার প্রবর্তন করতে হবে।
- সর্বশেষ তিনি বিশেষভাবে শ্রমিকদের সাথে সুসমন্বয়ের ব্যবস্থা করার কথা বলেন। এছাড়া তিনি কাজ করার ও ক্লান্তি নিরীক্ষণের ওপরও জোর দেন।[১৬]

পরবর্তী পর্যায়ে হেনরি ফেয়ল (১৯১৬) তাঁর বিখ্যাত *General and Industrial Administration* নামক পুস্তকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বকে আরো যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপন করেন। মূলত ফেয়ল একাধারে একজন শিল্প ব্যবস্থাপক ও একজন স্বনামধন্য খনি প্রকৌশলী হিসেবে প্রশাসনকে শীর্ষস্থানীয় ব্যবস্থাপকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন।[১৭] যদিও তিনি টেইলরের যান্ত্রিক পদ্ধতির সাথে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন না তথাপি বলতে হয়, তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা আন্দোলনের সাথে শরিক ছিলেন। প্রথমদিকে ফেয়লকে টেইলরের প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরুদ্ধবাদী বলে মনে করা হলেও পরবর্তীকালে তিনি এই যুক্তি খণ্ডন করেন এবং নিজেকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে উপস্থাপন করেন।[১৮]

হেনরি ফেয়ল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে পাঁচটি মৌলিক সূত্র প্রবর্তন করেন তা হলো : পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ। ফেয়ল মনে করতেন, ব্যবস্থাপনার সাধারণ নীতিগুলি সব ধরনের প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। এছাড়া তিনি ১৪টি নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থাকে উন্নীত করার কথা বলেন।[১৯] যদিও ফেয়ল সংগঠনের কাঠামোগত বিন্যাসকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, যেখানে মানবিক দিকগুলো উপেক্ষা করা হয়েছে, তথাপি বলা যায়, ফেয়ল প্রশাসনের একটি সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। ফেয়ল মূলত প্রশাসনিক কাজকে প্রধানত দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা– কার্যসম্বন্ধীয় ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয়।

টেইলর ও ফেয়ল উভয়ে বিশ্বাস করতেন যে, উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যালোচনা করা সম্ভব। মূলত টেইলর গুরুত্ব দিয়েছেন শ্রমিকের উপর আর ফেয়ল জোর দিয়েছেন ব্যবস্থাপনার উপর।[২০] কিন্তু দু'জনের উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন অর্থাৎ উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিল্পোৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি। ফেয়ল জীবনের শেষ দিকে এসে তাঁর প্রশাসনিক নীতিমালাগুলি শিল্প ও রাষ্ট্রীয় উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা বলেছেন।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের সমালোচনা

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের নানাবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও এটা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। বিভিন্ন মহল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই তত্ত্বের সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছেন। শিল্প-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন আধুনিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির প্রবর্তন মালিকদের অধিক মুনাফা অর্জনের পথ সুগম করলেও তাঁদের পক্ষ থেকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রতি যথেষ্ট উদাসীনতা

লক্ষ করা যায়। তদ্রূপ শ্রমিক সমাজও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিরোধিতা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। মনোবিজ্ঞানীরাও তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছেন। নিম্নে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের সমালোচনা তুলে ধরা হলো–

প্রথমত, এ ব্যবস্থা খুবই ব্যয়বহুল। সময়, গতি-নিরীক্ষণ এবং শ্রমিকদের সম্পাদিত কাজের মান-নির্ধারণ, উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। অনেক সময় ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে ক্ষুদ্র বিদ্যালয়গুলোতে লাভের তুলনায় খরচের পরিমাণ অধিক হয়।[২১] আর শিক্ষা ব্যবস্থা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হওয়ায় বিদ্যালয়ের সকল ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব প্রয়োগ কিছুটা অসুবিধাজনক।

দ্বিতীয়ত, হঠাৎ করে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গেলে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রচলিত ব্যবস্থাও অচল হয়ে পড়ে, ফলে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য অর্জন ব্যর্থ হতে পারে।

তৃতীয়ত, মালিকদের মতে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বিভাগ উৎপাদনের সাথে জড়িত নয়, ফলে এমন ধরনের উচ্চ বেতনে নিযুক্ত শ্রমিকদের বেতন ব্যয় বৃদ্ধির দরুন উৎপাদনের সার্বিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়।[২২] সুতরাং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পনা অনেকটা জটিলতার সৃষ্টি করে। ফলে মূল লক্ষ্য অর্জিত নাও হতে পারে।

চতুর্থত, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় কাজের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে নতুনত্বের অভাবহেতু শ্রমিকদের মধ্যে একঘেয়েমি এসে যায়। ফলে কাজের প্রতি শ্রমিকদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উদ্যোগের অভাব দেখা দেয়।[২৩] ঠিক একইভাবে বিরতিহীনভাবে পাঠদানের ফলে শিক্ষকদের মাঝে একঘেয়েমি আসতে পারে। ফলে পাঠদানের প্রতি তাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উদ্যোগের অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে।

পঞ্চমত, এ ব্যবস্থাপনা শ্রমিকদের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাথে তুলনা করে। ফলে তাদের স্বীয় সত্তা ও ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যেতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

ষষ্ঠত, শ্রমিকদের মতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রয়োগের ফলে অর্জিত অধিক মুনাফার সিংহভাগ মালিকেরাই ভোগ করে থাকেন। কারণ কোনো কোনো শ্রমিক যদিও বিভিন্ন ধরনের বোনাস এবং প্রিমিয়ামের মাধ্যমে কিছু বেশি পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে, কিন্তু অন্যভাবে তাদের ন্যায্য পাওনা হতে বঞ্চিত করা হয়। ঠিক একইভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিম্ন বেতন কাঠামোর ফলে যথাযথভাবে তাদের মূল্যায়ন করা হয় না।

সপ্তমত, শ্রমিক নেতারা এই ব্যবস্থাপনাকে অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করেন। কারণ, নিয়োগ ও অপসারণ, মজুরি হার নির্ধারণ এবং চাকুরির শর্ত ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের কোনো বক্তব্য বিবেচনা করার অবকাশ নেই।[২৪]

অষ্টমত, এ ব্যবস্থাপনার প্রতি আরেকটি অভিযোগ হল, শ্রম সংক্ষেপ কৌশল প্রয়োগের ফলে শ্রমিকদের বেকার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বেশি। অর্থাৎ উপযুক্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার অভাবে যে কোনো সময় যে কাউকে বাদ দেওয়ার সুযোগ থাকে।

নবমত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে কাজের গতি বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের কাজের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। ফলে শ্রমিকদের শরীর ও মনের উপর বেশ চাপ পড়ে।[২৫]

দশমত, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পার্থক্যমূলক কার্য-হারের (বেতন কাঠামো) ফলে বিভিন্ন শ্রমিক বিভিন্ন ধরনের মজুরি পেয়ে থাকে। ফলে অনেক সময় শ্রমিকদের মধ্যে হিংসা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়ে তাদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক দুর্বল এবং কাজের পরিবেশ নষ্ট হয়।

একাদশতম, শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ করে শ্রমিক নেতাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রতি বিরূপ মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এর প্রকৃত কারণ হলো– কিছু শ্রমিক অধিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ফলে তাদের উপর শ্রমিক নেতাদের প্রভাব নষ্ট হয় এবং শ্রমিক আন্দোলন ক্রমে দুর্বল হয়ে যায়।[২৬] ফলে শ্রমিক সংগঠনগুলোর কার্যকারিতা বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

অনেকের মতে, টেইলর তাঁর মতবাদে দলগত প্রক্রিয়ায় কাজে প্রেষণা, আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্ক, শ্রমিকের আবেগিক ও পরিবেশগত দিকগুলি উপেক্ষা করেছেন। বর্তমান দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায়, টেইলর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি সংকীর্ণ মনোভাব গ্রহণ করেন। তাছাড়া তিনি শ্রমিকের মনস্তাত্ত্বিক ও ব্যক্তিগত দিকগুলির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেননি।[২৭]

প্রফেসর সার্জেন্ট ফ্লোরেন্স (১৯৮৩)-এর মতে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় মানবিক উপাদান আদৌ বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা হয়নি। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেন। যেমন–

১. সময়-সমীক্ষা অনেক সময় গতি-সমীক্ষার সহ-অবস্থান ছাড়াই করা হয়ে থাকে।

২. প্রসন্ন অবস্থায় একজন দ্রুত গতির লোকের দ্রুত রেকর্ডের উপর একদল কর্মীর কাজের ভিত্তি করার অদ্ভুত কৌশলের দ্বারা গতি উর্ধ্বমুখী করার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

৩. টেইলরের মূল বক্তব্য অনুসারে নির্বাচন, প্রশিক্ষণ এবং সঞ্জীব পদ্ধতির প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রদান করা হয় না।[২৮]

বাস্তবে দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের মানবিক উপকরণের দক্ষতার প্রতি নজর দেয় না, বরং বস্তুগত উপকরণের দক্ষতার দিকেই অধিক নজর দিয়ে থাকে। যা প্রতিষ্ঠানের স্বৈরাচারী মনোভব পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।[২৯] সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রশাসনের কাজে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং বলতে পারি, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রশাসন ব্যবস্থাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রথম প্রয়াস হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

৪. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের প্রয়োগ

যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে সমন্বিত এবং সুসংগঠিত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ওপর। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা হচ্ছে শিক্ষা কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মানবীয় উপাদান এবং বস্তুগত সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের একটি প্রক্রিয়া।[৩০] শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণসহ প্রয়োগ করতে পারলে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন সহজতর হবে।

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। ১৯১৩ সালে এফ. ববিট প্রথম বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার এ তত্ত্ব প্রয়োগ করার প্রস্তাব করেন। তিনি তাঁর *The Supervision of City Schools* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয় সবিস্তার ব্যাখা করেন। তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আলোকে বিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রয়োগ করার কথা বলেছেন–

- বিদ্যালয়ের উৎপাদনের ক্ষেত্র (শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তু) নির্ধারণ।
- উৎপাদনের পন্থা (শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি) নির্ণয়।
- উৎপাদকগণের (শিক্ষকদের) যোগ্যতার সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- উৎপাদন মান সংরক্ষণের জন্য শিক্ষকদের যথোপযুক্ত নির্দেশ প্রদান।[৩১]

এফ. ববিট বিদ্যালয়ের উৎপাদনের মান ও সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে এ পদ্ধতি প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

পরবর্তী পর্যায়ে E. P. Cubberly (1916) তাঁর নিজ ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে টেইলরের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিমালা প্রয়োগ করেন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবর্তন করেন 'Cult of Efficiency', যেখানে তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যাবলি, বিশেষ করে শিক্ষামূলক কার্যাবলি গঠন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং যথাযথ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করাই হলো 'Cult of Efficiency'। তিনি বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজের সংগঠন, পরিকল্পনা গ্রহণ, ক্ষমতা প্রয়োগ ও বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধানের সামগ্রিক দিক প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করেছেন।[৩২] উল্লেখ্য যে, উত্তর আমেরিকায় শিল্প ও ব্যবসার মতো বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বকেও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় এবং শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় তা গভীর প্রভাবও বিস্তার করে।

পরবর্তীকালে E. Mark Hanson (1979) তাঁর *Educational Administration and Organizational Behaviour* নামক গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পন্থা বের করেন। তিনি নিম্নোক্তভাবে বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বকে প্রয়োগ করার কথা উল্লেখ করেন–

- সুনির্দিষ্ট পদবিন্যাসের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মাঝে শ্রেণিবিন্যাস করা অর্থাৎ প্রিন্সিপাল, ভাইস-প্রিন্সিপাল ও সিনিয়র শিক্ষক ইত্যাদি ক্রমানুসারে শিক্ষকদের মাঝে শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে। এরপরে শিক্ষকদের মাঝে জ্ঞানের গভীরতা অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করা।
- এ পর্যায়ে ছাত্র-শিক্ষকের হার স্থির করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের গমন নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষকদের কাজের জন্য নির্দিষ্ট ম্যানুয়াল তৈরিকরণ।
- কাজের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি (শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি) বের করার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বত্র উৎকর্ষ সাধনের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী যাতে বিদ্যালয়ে নিয়ম-কানুন পালন করে সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।
- বিষয়বস্তুগত প্রবণতা ও সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ও শিক্ষার্থীর উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষক ও প্রশাসকগণ একত্রে কাজ করবেন।[৩৩]

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে পারলে বিদ্যালয় লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে বলে হ্যানসন (১৯৭৯) মনে করেন। অপরদিকে W. G. Reeder (1958) মনে করেন, শিক্ষক নিয়োগ, বাজেট প্রস্তুত, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করার বিষয়টি প্রশাসকদের উপর নির্ভর করে। এছাড়াও এ তত্ত্বের অনুসরণে শিক্ষকদের চাকুরি প্রদান ও চাকুরিচ্যুত করা, শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম, বিদ্যালয়ের নীতিমালা ও রুটিন প্রণয়নের ওপর কড়া নজর রাখতে প্রশাসকদের তিনি উদ্বুদ্ধ করেন।[৩৪]

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। শিক্ষাক্ষেত্রে সাধ্যমত বিনিয়োগ সম্ভব না হলেও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিস্তারে সরকার ও জনগণ একযোগে কাজ করছে। আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলোতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। এখানে দুটি দিক বিবেচনায় রাখতে হবে। মানবিক ও অমানবিক দিক। যা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য বলে অনেকে মনে করেন। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের প্রধান দুটি দিকের আলোকে বিদ্যালয়ে যেভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায় তা নিম্নরূপ :

শ্রমিক নিয়োগ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান কাজ। উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কার্যানুসারে উপযুক্ত শ্রমিক নির্বাচন ও নিয়োগ বিশেষ প্রয়োজন। সঠিক উৎপাদনের জন্য শ্রমিকদের মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা গুরুত্বপূর্ণ।[৩৫] ঠিক তেমনি বিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যোগ্যতা ও দক্ষতার কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে সবক্ষেত্রে এখনও তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। রাজনীতিবিদদের হস্তক্ষেপ, আত্মীয়করণ, টাকার বিনিময়ে নিয়োগ ইত্যাদি কারণে অনেক সময় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হয় না। তারপরও অনেক বিদ্যালয়ে এর ব্যবহার স্বল্প পরিসরে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে মাধ্যমিক

বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিশন করে থাকেন। কিন্তু দেখা যায় যে, এ কমিশন বিদ্যালয়গুলোর চাহিদা মোতাবেক সঠিক সময়ে যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারছে না।

শুধু কাজের চাহিদা অনুযায়ী শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করলেই হবে না। এ কারণে শিক্ষকদের জন্য কার্যোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করার কথাও বলা হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া পরিবর্তনশীল, এ পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজনে শিক্ষকদের নব-পদ্ধতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।[৩৬] বর্তমানে দেশে যদিও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই স্বল্প পরিসরে।

সময় সমীক্ষা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সময়ের অপচয় রোধ করার জন্য সময় সমীক্ষা প্রয়োজন। সময়-সমীক্ষা দ্বারা একজন শ্রমিকের একটি কাজ সু-সম্পন্ন করতে কী পরিমাণ সময় লাগে তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।[৩৭] ঠিক একইভাবে বিদ্যালয়ে সুনির্দিষ্ট পাঠ দানে কী পরিমাণ সময় লাগে, নির্দিষ্ট সময়ে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কতটুকু পাঠদান করেছেন এগুলো দেখা হয়। মূলত এর ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সময় পর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে দেখা হয় নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষক কতটুকু পাঠদানে সক্ষম হয়েছেন এবং শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে তা শিখতে বা বুঝতে পেরেছে কিনা।

সাধারণত মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকেই গতির সঞ্চার হয়। সময় ও শ্রমের অপচয় দূর করার জন্য তাই গতি-সমীক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়।[৩৮] ঠিক একইভাবে শিক্ষকদের সময় ও শ্রমের অপচয় রোধ করার জন্য বিদ্যালয় যথাযথ পন্থা অনুসরণ করে। এখানে সময় ও শ্রমের বিষয়টি নির্দিষ্ট ও সঠিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারণ করে নিতে হয়। যা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা সীমিত। ক্ষমতার বাইরে কাজ করলে কার্যসম্পাদনের দক্ষতার অভাব দেখা দেয়। পরিশ্রান্তভাবে অধিক সময় কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে অনেক সময় ব্যক্তি শারীরিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে মনে ও দেহে শ্রান্তি অথবা অবসাদ দেখা দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে এর জন্য পুনঃ কাজে যোগদানের হার, অনুসমাপ্তির সীমা, ক্ষতি হওয়া কাজের বিবরণ, শ্রমিকগণ কর্তৃক নেওয়া স্বেচ্ছায় বিশ্রামের সময় ইত্যাদির প্রতি ব্যবস্থাপকের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হতে শ্রান্তির পরিমাপ করা হয়।[৩৯] ঠিক তেমনি বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ অনেক সময় বিরতিহীনভাবে পাঠদানের কারণে পরিশ্রান্ত হতে পারেন, সে কারণে পাঠদানে ব্যাঘাত হয়। যা পরবর্তীকালে পুনঃ পাঠদানের মাধ্যমে পূর্ণ করে দেওয়া হয়। আর প্রধান শিক্ষক এ বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, প্রেরণা দান করে শ্রমিকদের কাছ থেকে অল্প সময়ে অধিক কাজ আদায় করা। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করতে হলে প্রণোদনামূলক মজুরি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা আবশ্যক। কাজের প্রতি শ্রমিকদের আত্মনিয়োগে উৎসাহ ও আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত বেতন কাঠামোর বাইরে যে অতিরিক্ত মজুরি প্রদান এবং অন্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তাই প্রণোদনামূলক মজুরি। এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শ্রমিকদের যোগ্যতার সাথে কাজ করার স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং স্বীকৃতিস্বরূপ অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য ধরনের সুবিধাদি দেওয়া হয়।[৪০] ঠিক একইভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনেক সময় প্রেরণা প্রদান করার জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়। উদ্দেশ্য একটাই, শিক্ষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। বাংলাদেশের অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এ প্রণোদনামূলক কাজটি করতে দেখা যায়। আবার অনেক সময় কাজ করার ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রেরণামূলক মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়, যে ব্যবস্থাকে টেইলর পার্থক্যমূলক মজুরি ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেছেন। শ্রমিকদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও নির্দিষ্ট কাজের ভিত্তিতে যে বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা হয় তাই পার্থক্যমূলক মজুরি ব্যবস্থা।

শ্রমিক, ব্যবস্থাপক ও পরিচালকের সম্পর্ক উৎপাদনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে সহযোগিতা, সদ্ভাব ও মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।[৪১] ঠিক একইভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সাথে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যদি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সাথে প্রধান শিক্ষকের সুসম্পর্ক বজায় থাকে তাহলে বিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম খুব ভালোভাবে পরিচালিত হবে। শিক্ষকদের সাথে এ উন্নত সম্পর্ক ও সহযোগিতার ফলে বিদ্যালয়ে সামগ্রিক কার্যক্রমে দক্ষতা অর্জন, ব্যয় সংকোচন ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব।

উপরের মানবিক দিকগুলো ছাড়াও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের অমানবীয় দিকসমূহও গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে সংগঠনের শ্রমিকদের সরাসরি অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায় না। এখানে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা জড়িত থাকেন।

আধুনিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরিকল্পনা। কাজ শুরু করার আগে কী কাজ করা হবে, কীভাবে করা হবে তা স্থির করাকে পরিকল্পনা হিসেবে গণ্য করা হয়। টেইলর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ হিসেবে পরিকল্পিত উপায়ে কর্ম সম্পাদন করার উপর বেশ জোর দিয়েছেন। টেইলরের মতানুসারে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বিভাগ থাকবে।[৪২] অন্যদিকে হেনরি ফেয়ল সংগঠনের মূলনীতিতে পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ঠিক তেমনি প্রত্যেকটি বিদ্যালয় বছরের শুরুতে, বার্ষিক, ষান্মাষিক ও মাসিক পরিকল্পনা করে থাকে। আর এ কাজটি প্রত্যেক বিদ্যালয়কে করতে হয়। যদিও বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিকল্পনার কাজটি ভিন্ন ভিন্নভাবে করে থাকে।

কাজের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ এবং শাখা সৃষ্টি করে প্রত্যেক বিভাগ বা শাখার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্থির করা এবং তাদের উপর সেই দায়িত্ব ন্যস্ত করার অর্থ হল কার্যভিত্তিক কর্তব্য/কর্ম বণ্টন। এই নিয়মানুসারে ভারার্পণ পদ্ধতির মাধ্যমে উচ্চতম পর্যায় হতে নিম্নতম পর্যায়সমূহ পর্যন্ত ধাপে ধাপে ক্ষমতা এবং কর্তব্য অর্পণ করা হয়।[৪৩] ঠিক তেমনিভাবে বিদ্যালয়ে উচ্চ পর্যায় থেকে একেবারে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে কর্তব্য/কর্ম বণ্টন করা হয়ে থাকে। আর এ কাজটি প্রধান শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষক ও অন্যদের মাঝে শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

যন্ত্রপাতি যত আধুনিকই হোক না কেন, কাঁচামাল যদি উৎকৃষ্ট মানের না হয় তাহলে কোনো অবস্থাতেই উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্য উৎপাদন, দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধন, অপচয় রোধ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির আশা করা যায় না। অতএব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নিয়মানুসারে যন্ত্রপাতির ন্যায় উপযুক্ত কাঁচামাল সংগ্রহ করার দিকেও লক্ষ রাখতে হয়।[৪৪] ঠিক তেমনি বিদ্যালয়ে শিক্ষক যদি উন্নত মানের হয় কিন্তু শিক্ষার্থী ও শিক্ষা উপকরণ যদি সেই তুলনায় উপযুক্ত না হয় তাহলে যথাযথ উৎপাদন আশা করা যায় না। শিক্ষার্থী ও শিক্ষা উপকরণ এখানে কাঁচামাল। এ কারণে দেখা যায়, বিদ্যালয়গুলো তুলনামূলকভাবে ভালো শিক্ষার্থী অনুসন্ধান করে থাকে। অন্যদিকে দেশের গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোতে ভালো শিক্ষার্থী থাকলেও এখনো সেখানে পর্যন্ত যথাযথ ও উন্নত শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে।

শ্রমিকদের কাজের মানোন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা খুবই প্রয়োজন। কার্যস্থলের পরিবেশ শ্রমিকদের মন ও শরীরের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শ্রমিকদের মানসিক ও শারীরিক শান্তি যদি বিনষ্ট হয় তাহলে কোনো কাজ মনোযোগসহকারে সম্পাদন করতে পারে না। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়, উৎপাদনের মান নিম্নমুখী হয় এবং উৎপাদনের হারও হ্রাস পায়।[৪৫] ঠিক একইভাবে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ভালো থাকার উপর নির্ভর করে শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ ও শিক্ষাদানের মান। বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ ভালো হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই পাঠ দানে অংশগ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। এজন্যই বিদ্যালয়ে সর্বোত্তম পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ও অন্যান্য কক্ষে উপযুক্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা, বিশ্রামাগার, বিশুদ্ধ পানি, শৌচাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা এখন সময় এবং যুগের দাবি।

সর্বোপরি শিক্ষাদান ও উপকরণের যথাযথ মান নিশ্চিত করতে হবে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বে যন্ত্রপাতি উচ্চমান সম্পন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেখানে বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের উচ্চমান নির্ণয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা সেখানে বাংলাদেশের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না।

ব্যবস্থাপনার চিরাচরিত নিয়মাবলির পরিবর্তে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়াদি প্রয়োগের মাধ্যমে অপচয় ও ক্ষতিরোধ করে স্বল্প ব্যয়ে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করার নিমিত্তে এফ. ডব্লিউ.

টেইলরের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বকে হেনরি ফেয়ল আরো বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিন্যস্ত করেছেন। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অনুসৃত নীতির ফলে যেসব সুবিধা লাভ করা যায় তা হলো :

- এ ধরনের ব্যবস্থার ফলে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ফলে সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় লাভবান হয় ও বিদ্যালয়ের প্রত্যাশিত ফলাফলও সন্তোষজনকভাবে লাভ করা যায়।
- দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়।
- দক্ষতা অনুযায়ী বিষয় নির্ধারণ করা হয় বলে শিক্ষকগণ পাঠদানে উৎসাহিত হন।
- সময়, গতি ও শ্রান্তি সমীক্ষার মাধ্যমে স্থিরীকৃত সঠিক সময় ও গতি অনুযায়ী পাঠদান কার্যক্রম সম্পাদন করার ফলে শিক্ষকদের দৈহিক ও মানসিক শক্তি এবং সময়ের অপচয়ও রোধ হয়।[৪৬]
- উৎপাদন এবং তদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজের মান নির্ধারণ ও উন্নয়ন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার একটি প্রতিনিয়ত কাজ হওয়ায় উৎপাদনে উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর হয়।[৪৭] অর্থাৎ শিক্ষকদের শিখন পদ্ধতি নিয়মিত তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে এই উৎকর্ষ সাধিত হয়।
- গবেষণা ও নিরীক্ষণের ফলে উৎপাদনে ব্যয় সংকোচ হওয়ার মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়।[৪৮] অর্থাৎ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষার্থীরা যথাযথ ফল অর্জন করতে পারে।

টেইলরের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বে মানুষকে দক্ষ এবং উৎপাদনশীল সম্পদ হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কাজের প্রকৃতি (শিক্ষার ধরন) বিশ্লেষণ, কার্য সম্পাদনের প্রমিত (শিক্ষণ কার্যাবলি পরিচালনা) সময়সীমা নির্ধারণ, উৎকৃষ্ট কর্মপদ্ধতি (শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি) নির্ধারণ, কর্মী (শিক্ষক) প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে মনে করা হয়।[৪৯] এ পদ্ধতিতে উচ্চ উৎপাদনশীলতা কর্মীদের উচ্চ পারিশ্রমিক অর্জনের এবং দক্ষতা বিকাশের পথকে সুগম করে। বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রবর্তনের পাশাপাশি ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের (প্রধান শিক্ষক ও অন্য শিক্ষকদের) মধ্যে দায়িত্বের সুষম বণ্টন অর্থাৎ পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব ব্যবস্থাপকের (প্রধান শিক্ষকের) উপর অর্পণ, কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব কর্মীদের (শিক্ষকদের) উপর অর্পণ করার ফলে সম্পদের অপচয় ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং কর্মী, উদ্যোক্তা ও সমাজ লাভবান হয়।[৫০]

৫. উপসংহার

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের সমর্থকরা বিশ্বাস করেন যে, ভৌত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম বা সূত্র আছে তেমনি কাজের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক নিয়ম বা সূত্র রয়েছে। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো কাজের প্রকৃতি পর্যালোচনা করে এ কাজ সম্পাদনের একটি

সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি নির্ণয় করা সম্ভব। টেইলর দেখলেন যে, আগে কর্মীরাই নির্ধারণ করত একটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য কত সময় লাগবে এবং কী পদ্ধতিতে তা সম্পন্ন করা হবে। তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে জানতে উৎসাহী হন যে, একজন কর্মীর কতটুকু কাজ করা উচিত। তাঁর মতে, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হচ্ছে কর্মীদের কাছে কী প্রত্যাশা করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের উপদেশ দেওয়া এবং কীভাবে তারা কাজ সম্পাদন করবে তা নির্দিষ্ট করা। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একথা বলা যায় যে, বিদ্যালয়ই ঠিক করে দেবে শিক্ষকের কাছে প্রত্যাশা কী এবং শিক্ষক কীভাবে তাঁর কাজ (শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া) সম্পাদন করবেন।

টেইলরের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে মানুষকে দক্ষ এবং উৎপাদনশীল সম্পদ হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ, কার্য সম্পাদনের প্রমিত সময়সীমা নির্ধারণ, উৎকৃষ্ট কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ, কর্মী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে মনে করা হয়। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় টেইলর প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের সুপরিকল্পিত প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ এ জাতীয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনাকে যেমন সুসংগঠিত করা যাবে ঠিক তেমনি শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাফল্যের অনেকটাই নির্ভর করে ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের উপর।

তথ্যনির্দেশ

---

১ রাশিদা বেগম ও মো. তবারক উল ইসলাম, *শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মূলনীতি*, গাজীপুর : বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪, পৃ. ৬-৭

২ কামরুন্নেসা বেগম ও সালমা আখতার, *প্রাথমিক শিক্ষা : বাংলাদেশ*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৭

৩ মো. শিবলী আল ফারুক, *শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা : স্মৃতি বইঘর, ২০০৫, পৃ. ১৬-২২

৪ শহীদ উদ্দীন আহমেদ, *ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃ. ৬৫

৫ এ. এস. এম. মুজাম্মিল হক ও মিসেস সালমা আখতার, *শিক্ষা প্রশাসন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিস্ট্যান্স এডুকেশন, ১৯৮৬, পৃ. ১৮

৬ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১০, পৃ. ৬২

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৮ মোঃ খাইরুল ইসলাম ও উম্মে মুসতারী তিথি, 'বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের কর্তব্যবোধ ও মানবাধিকার সচেতনতা বিকাশের সুযোগ', ঢাকা : *বাংলাদেশ শিক্ষা সাময়িকী*, একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৪, পৃ. ৪৩

৯ M. D. C. Collado & R. L. Atxurra, `Democratic Citizenship in Textbooks in Spanish Primary Curriculum', *Journal of Curriculum Studies*, 38(2), 2006, p. 209-210

[১০] শহীদ উদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

[১১] রওশন আরা চৌধুরী, *শিক্ষা প্রশাসনের মূলনীতি*, ঢাকা : ১৯৯৭, পৃ. ৪০-৪১

[১২] শহীদ উদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

[১৪] Frederick W.Taylor, *The Principles of Scientific Management*, New York : Harper Bros, 1911, pp. 5-27.

[১৫] Frederick W. Taylor, *Shop Management*, New York : Harper & Row, 1919, pp. 97-101

[১৬] রওশন আরা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

[১৭] H. Fayol, *General and Industrial Management*, Ran Constance Storrs, London : Sir Isaac Pitman and Sons, 1944, pp. 15-36

[১৮] রওশন আরা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

[১৯] শহীদ উদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

[২০] রওশন আরা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

[২১] শহীদ উদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

[২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

[২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০

[২৭] রওশন আরা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

[২৮] Florence Heffron and Neil McFeeley, *The Administrative Regulatory Process*, New York : Longman, 1983, pp. 133-135

[২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩-১৩৫

[৩০] এম এ ওহাব, সেলিনা আক্তার ও সুনীল কান্তি দে, *বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা*, গাজীপুর : বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ. ৬৯-৭০

[৩১] F. Bobbitt, 'The Supervision of City Schools', In *Yearbook of the National Sodety for the Study of Education* (NSSE), Chicago, 1913, pp. 43-49.

[৩২] E. P. Cubberley, *Public School Administration; A Statement of the Fundamental Principles Underlying the Organization and Administration of Public Education*, New York, Houghton Mifflin Co., 1916

[৩৩] E. Mark Hanson, *Educational Administration and Organizational Behavior*, Boston : Allyn & Bacon, 1979, pp. 45-53

[৩৪] W. G. Reeder, *Fundamentals of School Administration*, Macmillan, 1958, pp. 125-139

[৩৫] শহীদ উদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

[৩৬] রাশিদা বেগম ও মো. তবারক উল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

[৩৭] E. Mark Hanson, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৫৩

[৩৮] শহীদ উদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

[৪১] F. Bobbitt, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[৪২] শহীদ উদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

[৪৩] F. Bobbitt, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১

[৪৪] শহীদ উদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

[৪৫] রওশন আরা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

[৪৬] Frederick W.Taylor, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯

[৪৭] শহীদ উদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

[৪৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮

[৪৯] রওশন আরা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬

[৫০] রাশিদা বেগম ও মো. তবারক উল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬